আরব দুহিতা

সাদেক হুসাইন

আগে পড়ুন

দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনকাল। অগ্নিপুজারি ইরানিদের একের-পর-এক পরাজয় ঘটছে মুসলমানদের হাতে। যুদ্ধে অংশ নিতে মদীনাগামী পথ ধরে ছুটে চলছে তরুণ মুজাহিদ সাফওয়ান আয্‌রি। হঠাৎ মুখোমুখি হলো এক রূপসী নারীর। দেখা মিলল এক জ্যোতিষিণীর। জ্যোতিষিণী বলল, শোনো আফীরা, আমার বিদ্যা বলছে, তুমি কঠিন এক বিপদে আপতিত হবে। তোমার উপর দিয়ে প্রবল এক ঝড় বয়ে যাবে। এক যুবক জীবনের বাজি লাগিয়ে তোমাকে উদ্ধার করবে।

আফীরা জানাল, বছর চারেক আগে আমাদের বাড়িতে এক জ্যোতিষী এসেছিল। সে আমার হাত দেখে বলেছিল, তুমি পাহাড়ি দেশে যাবে। ওখানে কেউ তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। অবশেষে এক যুবক...।

এক রাতে পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে সাফওয়ান-আফীরার দেখা মিলল এক বনমানুষের। এক যুদ্ধের শেষে সাফওয়ান দেখল, রণাঙ্গনের এক স্থানে এক লোক মৃতের ভান ধরে পড়ে আছে। সাফওয়ান কাছে গেলে চোখ খুলে বলল, আমি জ্যোতিষী। আমি যুদ্ধ করতে আসিনি। আপনি আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমি আপনার উপকার করব। আমার নাম জামাসপ।

অবশেষে কী হলো? কী পরিণতি ঘটল রূপসী কন্যা আফীরার? কে ছিল বনমানুষটি? জামাসপ কী উপকার করল সাফওয়ানের? কোথায় গিয়ে ঠেকল সাফওয়ান-আফীরার ভালবাসা? কী ফল ফলাল মুসলমানদের ইরান অভিযান?

পড়ুন–

আরব দুহিতা

পরশমণি'র আরও বই

- সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানী
- ঈমানদীপ্ত দাস্তান (৮ খণ্ডের সিরিজ উপন্যাস)
- আল্লাহ'র সৈনিক (ঐতিহাসিক উপন্যাস)
- পতনের ডাক (ঐতিহাসিক উপন্যাস)
- আফ্রিকার দুলহান (ঐতিহাসিক উপন্যাস)
- কুরআন অধ্যয়নের মূলনীতি
- ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর জীবনের পাতা থেকে
- আধুনিক ফ্যাশন ও ইসলাম
- কী করে ছেলেমেয়েকে মানুষ বানাবেন
- মূল্যবান বয়ান
- হৃদয়ছোঁয়া কাহিনী
- তাবলীগ জামাতের কারগুজারি
- জান্নাতের রাজপথ
- উসওয়ায়ে আসহাবে রাসূল
- আখেরাতই-জীবন

আরব দুহিতা

রচনা
....
সাদেক হুসাইন
প্রখ্যাত উর্দু ঔপন্যাসিক, ভারত

অনুবাদ
....
মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন
দাওরায়ে হাদীস (১৯৯০)
মাদরাসা-ই-নূরিয়া, আশরাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা
সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া, ঢাকা
প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত

১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল : ০১৫৫৬৭২২১, ০১৭১৭১৭৮৮১৯

পৃষ্ঠা	২৫৬, ফর্মা ১৬
পরশমণি প্রকাশনা	২২
©	সংরক্ষিত
প্রকাশক	মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন স্বত্বাধিকারী, পরশমণি প্রকাশন
প্রথম প্রকাশ	জানুয়ারি ২০১১
বর্ণ বিন্যাস	মুজাহিদ বিন গওহার জি গ্রাফ কম্পিউটার, মালিটোলা, ঢাকা
মুদ্রণ	জাহানারা প্রিন্টিং প্রেস সেকশন, হাজারীবাগ, ঢাকা
ডিজাইন	নাজমুল হায়দার সাজ ক্রিয়েশন, ৮৬, পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা

ISBN-984-70063-0013-7

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা মাত্র / US $ 5

আরব দুহিতা

এক.

জাশজাশা থেকে মদীনাগামী সড়কের পথ ধরে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলছে এক বেদুঈন যুবক। যুবকের সুঠাম শরীর, চওড়া বুক ও শক্ত বাহু। পরিধানে বিশেষ ছাঁটের আরবীয় পোশাক।

যুবক যে-রাস্তাটি ধরে পথ চলছে, সেটি বালুকাময়। তার দু-ধারে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত মরুপ্রান্তর। তাতে স্থানে-স্থানে উঁচু-উঁচু অসংখ্য বালির টিলা।

বেলা এখনও দুপুর হয়নি। তথাপি সূর্যের উত্তাপ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেতে শুরু করেছে। বাতাস গরম হয়ে গেছে। প্রখর রোদ বালির কণাগুলোকে এমনভাবে ঝকমকিয়ে দিয়েছে যে, মাঠের দিকে চোখ তুলে তাকানো অসম্ভব হয়ে ওঠেছে। চোখ ঝলসে যাচ্ছে।

যুবক দ্রুতগতিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে এই প্রান্তর পেরিয়ে যেতে চাচ্ছে। তার জানা আছে, বেলা দুপুর হয়ে গেলে এখানে বাতাস এত তীব্র হয়ে যায় যে, পাহাড়সম বালির টিলাগুলোকে গোড়াসুদ্ধ উপড়ে ফেলে এবং তার বালিগুলোকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ছুঁড়ে ফেলে। অনেক পথচারী সেই বালিতে চাপা পড়ে বেঘোরে প্রাণ হারায়। বালির তলেই তাদের সমাধি রচিত হয়।

যুবক তীব্রগতিতে এগিয়ে চলছিল। হঠাৎ দেখতে পেল, সম্মুখ দিক থেকে এক উষ্ট্রারোহী এগিয়ে আসছে। লোকটি তার উটটিকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসছে। কাছাকাছি এসে সে ইসলামি তরিকায় সালাম দিল। বেদুঈন যুবক সালামের উত্তর দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কোথা থেকে আসছ?

লোকটি উত্তর দিল, মদীনা থেকে।

ওখানকার খবরাখবর কী?

খবর ভালো। ইরানে মুসলমানদের একের-পর-এক বিজয় অর্জিত হচ্ছে। আমীরুল মুমিনীন পরিকল্পনা নিয়েছেন, চূড়ান্ত আক্রমণ চালিয়ে ইরানিদের শেষ শক্তিটুকুও নিঃশেষ করে দেবেন।

শুনেছি, ইরানিরা নাকি বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ করছে?

আপনি ঠিকই শুনেছেন। ইরানের যে-প্রদেশগুলোতে মুসলমানদের কব্জা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার অধিকাংশগুলোতেই বিদ্রোহ হচ্ছে।

তার কারণ কী? ইরানিরা ইসলামি শাসনের প্রতি সন্তুষ্ট নয় কি?

ব্যাপার তা নয়। তথ্য যা পেয়েছি, তা হলো, কৃষক শ্রেণীর মানুষ ইসলামি শাসনের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট। তারা চেষ্টাও করছে এবং দু'আও করছে, যেন মুসলমানদের শাসন বহাল থাকে। কিন্তু রাজা ইয়ায্‌দাজার্‌দ নেতৃস্থানীয় ও ধনিক শ্রেণীর লোকদেরকে উত্তেজিত করছেন এবং নানা রকম প্রলোভন দেখাচ্ছেন। আর তারা জনসাধারণকে ভুল তথ্য দিয়ে ক্ষেপিয়ে তুলছে।

এর অর্থ হলো, ইরানের রাজা ইয়ায্‌দাজার্‌দ যতক্ষণ পর্যন্ত ইরানি অঞ্চলে উপস্থিত আছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ইরানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না।

আপনি ঠিকই বুঝেছেন। আর সে-কারণেই আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিনি ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর উপর কার্যকর আঘাত হানবেন। হয় তাকে গ্রেফতার করবেন কিংবা ইরান থেকে তাড়িয়ে দেবেন। নতুবা যদি তিনি যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হন, তা হলে হত্যা করে ফেলবেন।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ বর্তমানে কোথায় আছেন?

খোরাসানে। উক্ত অঞ্চলের লোকদেরকে উত্তেজিত করে এবং প্রলোভন দেখিয়ে বাহিনীতে ভর্তি করছেন। তার কাছে দুঃসাহসী বহুসংখ্যক সৈন্য সমবেত হয়ে গেছে। তারও পরিকল্পনা চূড়ান্ত আঘাত হানা।

এর কারণ এই হতে পারে যে, লোকটি ভবঘুরে জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেছে।

একটি কারণ এ-ও যে, মুসলমানরা ইরানের বড়-বড় কয়েকটি প্রদেশ দখল করে নেওয়ার পর তিনি সেগুলোতে বিদ্রোহ করিয়েছেন। কিন্তু সেই বিদ্রোহগুলোতে ইরানিরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইরানি জনসাধারণ ও কৃষক শ্রেণী পরস্পর সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে। কৃষকরা মুসলমানদের হিতাকাঙ্খী ও সমর্থক। আর জনসাধারণ সমর্থন করে নেতাদের। কৃষকরা ইসলামি শাসনব্যবস্থায় খুবই স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করছে। তাদের দারিদ্র্য ও অনটন দূর হয়ে গেছে। এখন তারা আগের তুলনায় অনেক স্বচ্ছল। ফলে ইয়ায্‌দাজার্‌দ এই ভয়ে তটস্থ যে, পাছে সেসব অঞ্চলের কৃষকরাও বিদ্রোহ করে বসে কিনা, যেগুলো এখনও তার করায়ত্বে আছে। সেজন্যই তিনি শেষবারের মতো ভাগ্যের পরীক্ষা নিতে চাচ্ছেন।

ইরান সরকার বোধ হয় কৃষকদের উপর কঠোরতা করে থাকে?

ভীষণ। ইরানে ছোট-বড় অনেক জমিদার আছে। তাদেরকে 'মারযুবান' বলা হয়। তারা কৃষকদের উৎপাদিত শস্যের অর্ধেকেরও বেশি অংশ নিয়ে নেয়। জমির এত বেশি লগ্নি নির্ধারণ করে রেখেছে, যা কৃষকরা আদায় করতে ব্যর্থ হচ্ছে। বকেয়া উসুলের বাহানায় তারা কৃষকদের গবাদিপশু, চাষের সরঞ্জাম, গৃহস্থলির জিনিসপত্র ও বউ-ঝিদের স্বর্ণালংকার ক্রোক করে নিয়ে যায়। অনেক সময় কৃষকদের সুন্দরী বউ-ঝিদেরও ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ইরানি শাসনব্যবস্থায় কৃষকদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। তার বিপরীতে ইসলামি সরকার তাদেরকে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে। ইসলামি সরকার সাধারণভাবে উৎপাদিত শস্যের দশ-ভাগের-এক-ভাগ নেয়, কৃষকরা যা খুশিমনে আদায় করে থাকে। ইসলামি সরকার আসার পর তাদের অবস্থা অনেক ভালো হয়ে গেছে।

আচ্ছা, তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ?

আমি বাড়ি যাচ্ছি। আর্‌জ অঞ্চলে আমার বাড়ি।

বোধ হয় তুমি আসলাম গোত্রের লোক।

হ্যাঁ, আমি আসলামি। শাম রাজ্যে (সিরিয়ায়) জিহাদ করতে গিয়েছিলাম। এখন এক মাসের ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি। তবে আমার ইচ্ছা হলো, তাড়াতাড়ি ফিরে আসব এবং ইরান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব।

আর্‌জ অঞ্চলটিতে আসলাম গোত্রের অধিবাস। হিজরতের সময় আল্লাহর রাসূল (সা.) এই অঞ্চলে আগমন করেছিলেন। ওখানে তাঁর উট ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছিল। নবীজি (সা.) আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে একটি উট ক্রয় করেছিলেন। তার নাম আউস ইবনে হুজ্‌র। আউস তার এক গোলামকেও নবীজির সঙ্গী বানিয়ে দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে আসলাম গোত্র এই বলে গর্ব করত যে, আমাদের এক লোক হিজরতের সময় আল্লাহর রাসূলের (সা.) সেবা করেছিল।

আরোহী বলল, তুমিও সম্ভবত জিহাদেরই উদ্দেশ্যে যাচ্ছ?

আপনি ঠিকই ধরেছেন।

তুমি কোথা থেকে এসেছ?

রাবেগ থেকে।

রাবেগ পবিত্র মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি স্থানে আবওয়ার সন্নিকটে অবস্থিত একটি অঞ্চল। সে-যুগে উক্ত অঞ্চলে আয্‌রা গোত্র বাস করত।

আরোহী জিজ্ঞেস করল, তুমি কোন গোত্রের লোক?

আমি আয্‌রি।

আরোহী অর্থপূর্ণ মুচকি হেসে বলল, আয্‌রি? আল্লাহ তোমাকে দয়া করুন।

বেদুঈন বলল, হ্যাঁ, আমি সেই গোত্রেরই লোক, যার সদস্যদের প্রেম-ভালবাসার নানা গল্প-কাহিনী সকল স্তরের মানুষের মুখে-মুখে উচ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু এসব উপাখ্যান জাহেলি যুগের। ইসলাম গ্রহণের পর আয্‌রিরা এই অনর্থক কর্মটি থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে।

সত্যিই এটি ফালতু এক ব্যস্ততা ছিল। আয্‌রিদের সম্পর্কে তো প্রসিদ্ধি ছিল যে, যখন তারা প্রেমে পাগল হয়, তখন মরে যায়।

এই ধারণা বিলকুল সঠিক ও বাস্তব ছিল। আমার এক চাচা তার গোত্রের এক সুন্দরী মেয়ের প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। তাঁর সেই প্রেম এতই উথ্‌লে উঠেছিল যে, তিনি পাগলই হয়ে গেলেন এবং মাতাল অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করলেন।

আচ্ছা ভাই, এবার বিদায় নিই।

আল্লাহ হাফেজ।

বিদায়কালে আমি তোমাকে একটি বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে যেতে চাই।

বলুন।

তুমি আয্‌রি। আর প্রেম-ভালবাসা আয্‌রিদের সৃষ্টিগত উপকরণের অংশ। যদিও ইসলাম তোমাদের গোত্রের অনেক দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে দিয়েছে, তারপরও প্রেম-ভালবাসা এমন একটি বিষয়, যা হঠাৎই উথ্‌লে ওঠে। বিশেষ করে যদি চাঁদ-সুন্দর কোনো রূপসী নারী চোখে পড়ে যায়। তোমার গমনপথে একটি গোত্র অবস্থান গ্রহণ করেছে। তাদের মাঝে আমি এক দুহিতাকে দেখেছি। মেয়েটির রূপ-যৌবন তোমার মতো যুবকদের হৃদয়সাগরে ভালবাসার জোয়ার সৃষ্টি এবং ঈমান লুট করার ক্ষমতা রাখে। তার থেকে নিজেকে রক্ষা করো যেন।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কোনো নারীরই রূপজাদু আমাকে ঘায়েল করতে সক্ষম হবে না। আমি মুজাহিদ– আল্লাহর সৈনিক।

তা অবশ্য ঠিক বলেছ। তবে সাবধান থাকা ভালো।

আচ্ছা তাহলে চলি। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

ওয়া আলাইকুমুস সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আগন্তুক আরোহী চলে গেল। বেদুঈন যুবক ঘোড়া হাঁকিয়ে সামনের দিকে এগোতে শুরু করল।

রোদের তাপ আরও প্রখর হয়ে ওঠেছে। থেমে-থেমে বাতাসের তীব্র ঝাপটা প্রবাহিত হয়ে বালির ঝড় সৃষ্টি করছে। বেদুঈন যুবক দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। কোনো একটি নিরাপদ জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিতে চাচ্ছে সে।

এখনও সে বেশিদূর এগোয়নি। হঠাৎ দেখল, সামনের দিক থেকে একটি ঘোড়া ছুটে আসছে এবং তার আরোহী একজন নারী। যুবক বিস্ময়ের সঙ্গে সেদিকে তাকিয়ে থাকল। তার বুঝে আসছে না, একাকি একটি মেয়ে কেন আসছে এবং কোথায়ই-বা যাচ্ছে! তার কৌতূহলের সীমা থাকল না।

যুবক নিবিড় চোখে তাকিয়ে থাকল। সে অনুমান করল, ঘোড়া মেয়েটির নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। সে নিজের ঘোড়াটাকে রাস্তার মধ্যখানে এনে ধীরে-ধীরে এগোতে শুরু করল।

এখনও দুই ঘোড়ার মাঝে অনেক ফারাক। এমন সময় মেয়েটির ঘোড়ার রেকাব ভেঙে গেল। মেয়েটি ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলল। ঘোড়াটি বেদুঈন যুবকের নিকটে এসে পড়ল। মেয়েটি 'বাঁচাও-বাঁচাও' বলে চিৎকার জুড়ে দিল।

বেদুঈন যুবক দ্রুত তার ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে গেল এবং ঝট করে অপর ঘোড়ার বাগ ধরে ফেলল। মেয়েটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেছনে পড়ে গেল। ঘোড়া দাঁড়িয়ে গেল।

দুই.

মেয়েটি নির্জীবের মতো পড়ে আছে। তার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেছে। যুবক চট্‌জলদি তার প্রতি তাকাল। তার মনে আশঙ্কা জাগল, মেয়েটি গুরুতর চোট পেল কি-না কিংবা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল কি-না।

যুবক মেয়েটির প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু তাকে ওর ঘোড়াটি সামলাতে হচ্ছে। ঘোড়াটি বেয়াড়াপনা করছে এবং হাঁপাচ্ছে। যদি ছাড়া পেয়ে পালিয়ে যায় বা ছুটতে গিয়ে মেয়েটিকে দলিত করে, তা হলে তো বিপদের সীমা থাকবে না।

যুবক ঘোড়াটির ঘাড়ে চাপড় মেরে তার ভীতি দূর করার চেষ্টা করল। তাতে ঘোড়া কিছুটা শান্ত ও অনুগত হলো।

এবার মেয়েটির প্রতি ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করল, মানুষটি চৈতন্য হারিয়ে ফেলেছে, নাকি ভয়ে নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে।

মেয়েটি এ-যাবত চোখ বুজে পড়ে ছিল। বেদুঈন যুবক তার কাছে গিয়ে মাথার কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ কণ্ঠে বলল, কী, আঘাত খুব বেশি পেয়েছ নাকি?

মেয়েটি চোখ খুলে তাকাল। মুখটা সাদা হয়ে গেছে। চোখ খুলে খানিক সময় নিয়ে গভীর শ্বাস নিল এবং ধীরে-ধীরে উঠতে শুরু করল।

বেদুঈন যুবক বলল, ধরতে হবে?

না। শোকরিয়া।

মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে গেল। অত্যন্ত রূপসী এক মেয়ে। যুবতী। রূপ বসন্তের সতেজ কলি। কাজলকালো ডাগর চোখ দুটো এতই মনোহারী, যা আয্‌রি যুবকের হৃদয়সাগরে ভালবাসার উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে।

যুবক জিজ্ঞেস করল, কোথাও আঘাত পাওনি তো?

না।

তোমার ঘোড়াটা বোধহয় খুব বেয়াড়া।

না। কী একটা মরুজন্তু দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

তুমি কি একাকি সফর করছ?

না। আমাদের কাফেলা এখান থেকে খানিক দূরে অবস্থান করছে।

তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

মদীনা।

বেদুঈন যুবক মুচকি হেসে বলল, কিন্তু এই পথ তো মক্কার।

জানি। আমরা এ–পথেই গিয়েছি।

আশ্চর্য, আবার এদিকে এলে কেন?

ঘটনা হলো, আজ আমাদের কাফেলা যাত্রাবিরতি দিয়েছে। দীর্ঘ সময় বসে থাকতে-থাকতে আমার বিরক্তি ধরে গেছে। খানিক বিনোদনের জন্য ঘোড়ায় চড়ে বসলাম এবং কাফেলা থেকে বেশ দূরে চলে এলাম। কিন্তু হঠাৎ ঘোড়া বেয়াড়াপনা শুরু করল এবং আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। আমি তাকে থামানোর চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু এর মধ্যে রেকাব ভেঙে গেল। আল্লাহ তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন আর তুমি ঘোড়াটাকে ধরে ফেলেছ। অন্যথায় না জানি আজ আমার পরিণতি কী হতো। আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।

মেয়েটি অবনত মুখে কথা বলছিল। এতটুকু বলে সে মাথাটা তুলে বেদুঈন যুবকের মুখের দিকে তাকাল। যুবক সহসা কেঁপে ওঠল। মেয়েটির মত্ত যৌবনের রূপের মাদকতা তাকে মাতাল করে তোলার উপক্রম হলো।

কিন্তু যুবক নিজেকে পরিস্থিতির হাতে সঁপে না দিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে বলল, আল্লাহ অনেক দয়া করেছেন। ঘটনাটি কত ভয়াবহ ছিল! তা ছাড়া বিষয়টি আমার কাছে খুব বিস্ময়কর ঠেকছে...।

যুবক মেয়েটির প্রতি একনজর তাকিয়ে চুপ হয়ে গেল।

মেয়েটি বলল, এখানে বিস্ময়ের কী দেখছেন?

এক উষ্ট্রারোহী এদিক দিয়ে অতিক্রম করেছিল...।

মেয়েটি কথা কেটে বলল, হ্যাঁ, সেই উষ্ট্রারোহীর সঙ্গে কাফেলার কাছেই আমার দেখা হয়েছিল। তা সে কী বলল?

সে যা বলেছে, আমি তা ব্যক্ত করতে চাই না।

মেয়েটি তার চিত্তহারী চোখ দুটো দ্বারা যুবকের প্রতি তাকিয়ে বলল, কেন বলবেন না?

তুমি মন্দ ভাবতে পার, তাই।

আমি মন্দ ভাবব কেন? বলুন।

বলল, 'পথে একটি কাফেলা অবস্থান নিয়েছে। আমি সেখানে একটি রূপসী যুবতীকে দেখেছি। মেয়েটি রূপ-যৌবনের প্রতিমা আর ঈমান হরণে ক্ষমতাবান। তার থেকে বেঁচে থেকো।'

মেয়েটি হৃদয়কাড়া চাহনিতে বেদুঈন যুবকের প্রতি তাকাল। খানিক নীরব থেকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কোন গোত্রের লোক?

আমি আয্‌রি।

আয্‌রি যুবক! আচ্ছা, সত্যিই সে একথা বলেছে?

বেদুঈন যুবক খানিক অপ্রস্তুত হয়ে গেল। কারণ, প্রেম-ভালবাসায় আয্‌রা গোত্রের অনেক দুর্নাম আছে। সমগ্র আরব জানে, এই গোত্রের যুবকরা নারীপাগল। যখন তাদের অন্তরে কোনো নারীর ভালবাসা জন্মে যায়, তখন তার বিরহে তিলে-তিলে নিঃশেষ হয়ে প্রাণ দিয়ে দেয়।

মেয়েটি বিব্রত বেদুঈন যুবকের প্রতি তাকিয়ে থাকল। জিজ্ঞেস করল, নাম কী আপনার?

আমার নাম সাফওয়ান আয্‌রি।

দয়া করে আমার ঘোড়ার রেকাবটা খুঁজে দেবেন কি?

দেব না কেন। তুমি তোমার ঘোড়াটা ধরে রাখো, পারবে?

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার ঘোড়া এখন আর কোথাও যাবে না। লাগামটা আমার হাতে দিন।

সাফওয়ান মেয়েটির ঘোড়ার লাগাম তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজের ঘোড়া নিয়ে রেকাব খুঁজে আনতে চলে গেল। সামান্য দূরে যেতেই রেকাবটি পেয়ে গেল। সেটি তুলে ফিরে এসে মেয়েটিকে বলল, তোমার রেকাব পেয়েছি বটে; কিন্তু এটি কোনো কাজে আসবে না।

ঠিক আছে, কাফেলায় ফিরে গিয়ে আমি ঠিক করে নেব।

আচ্ছা, এস, তুমি আমার ঘোড়ায় চড়ে বসো।

আর আপনি...।

আমি দুটি ঘোড়ারই লাগাম ধরে হেঁটে যাব।

হাঁটবেন কেন? রেকাব ছাড়া যিনে বসার যদি অভিজ্ঞতা থাকে, তা হলে আমার ঘোড়া তো আছে।

আমি যিন ছাড়াও সাওয়ার হতে পারি। আমাদের গোত্রের লোকেরা দক্ষ অশ্বারোহী হয়ে থাকে। ঘোড়ার নগ্ন পিঠেও এমনভাবে স্থির হয়ে বসতে পারে, যেন তার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে আছে। আমাদের গোত্রের মেয়েরা সাধারণত খুবই কোমলমতি হয়ে থাকে; কিন্তু অশ্বারোহণে তাদের জুড়ি মেলা ভার।

মেয়েটি সাফওয়ানের মুখপানে তাকিয়ে বলল, আমি নাহ্‌ম গোত্রের মেয়ে। অশ্বারোহণে আমাদের গোত্রের মেয়েদের সঙ্গে পেরে উঠা অন্য কোনো মেয়ের পক্ষে অসম্ভব।

সাফওয়ান মুখ টিপে হেসে বলল, তা তো আমি নিজ চোখেই দেখলাম। আমি যদি ঘোড়াটাকে না আটকাতাম, তা হলে তো...।

এ ছিল একটি দুর্ঘটনা যে, রেকাবটা ভেঙে গেল আর আমি ভারসাম্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হলাম।

কিন্তু তুমি রেকাবটার উপর এত চাপ দিলেই-বা কেন?

এটি আমার ভুল হয়ে গেছে।

আচ্ছা, ঘোড়ায় চড়ে বসো।

মেয়েটি অবলীলায় সাফওয়ানের ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল। সাফওয়ান তার ঘোড়ায় চড়তে গেলে মুচকি হেসে বলল, সাবধান কিন্তু। আমার মতো পড়ে যেয়ো না আবার শাহসাওয়ার সাহেব।

সাফওয়ান গোড়ার পিঠে বসে বলল, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো; আমি ঘোড়সাওয়ারি জানি।

উভয়ে এগোতে শুরু করল। সাফওয়ান বলল, অনেক মেয়ের ঘোড়সাওয়ারির সখ আছে বটে; কিন্তু জানে না ছাইও।

মেয়েটি মুখ বেঁকিয়ে বলল, অনেক ছেলের ঘোড়সাওয়ারিতে বেজায় দম্ভ; কিন্তু জানে না মাটিও।

যদি এই অধম সম্পর্কে এ-ধারণা হয়ে থাকে, তা হলে আমি তোমাকে শাহসাওয়ারি শিখিয়ে দিতে পারি।

আগে নিজে তো শিখে নেবেন।

আচ্ছা, তোমার নামটা জানা হলো না।

আমার নাম দিয়ে আপনার কাম কী?

না বললে কী আর করা।

দুজন এগোতে থাকল। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর এক বেদুঈন মহিলার সঙ্গে তাদের দেখা হলো। মহিলা খেজুরবীচির পোটলা মাথায় করে পথ চলছে। এরা দুজন তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় মহিলা চোখ তুলে এদের প্রতি তাকাল এবং উচ্চ আওয়াজে বলল, মাশাআল্লাহ কী চমৎকার জুটি!

ঠিক সে-সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে দুজনের চোখাচুখি হয়ে গেল। মেয়েটি খানিক বিব্রত বোধ করে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মাথাটা নিচু করে ফেলল।

সাফওয়ান নিম্নস্বরে বলল, অনুমতি হলে আমি মহিলার ভুলটা ভেঙে দিই।

মহিলা মেয়েটিকে গভীর চোখে তাকাচ্ছিল। হঠাৎ বলে উঠল, আরবকন্যা, দাঁড়াও তো একটু, কথা বলি।

মেয়েটি ঘোড়া থামিয়ে ফেলল। মহিলা পোটলাটা মাথা থেকে নামিয়ে রেখে মেয়েটির প্রতি এগোতে-এগোতে বলল, আমি এই অঞ্চলের জ্যোতিষিণী। যদিও মুসলমান হওয়ার পর এই বিদ্যা পরিত্যাগ করেছি, কিন্তু তোমাদেরকে দেখার পর এখন কিছু কথা না বলে পারছি না। তোমার নাম কী বেটী?

আমার নাম আফীরা।

আফীরা...। নামটা উচ্চারণ করে মহিলা কী যেন ভাবতে লাগল। খানিক পর বলল, শোনো আফীরা, আমার বিদ্যা বলছে, তুমি কঠিন এক বিপদে নিপতিত হবে। তোমার মাথার উপর দিয়ে প্রবল এক ঝড় বয়ে যাবে। এক যুবক জীবনের বাজি লাগিয়ে তোমাকে সাহায্য করবে। তোমার আপদ কেটে যাবে। তুমি সুখের জীবন ফিরে পাবে। যখন পরীক্ষায় নিপতিত হবে, তখন তোমাকে ভীত হওয়া চলবে না।

মহিলা খেজুরবীচির বোচকাটা মাথায় তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

আফীরার মুখে কথা নেই। কেমন যেন ভীত-হয়ে উঠেছে মেয়েটি। সাফওয়ান বলল, জ্যোতিষীদের কথার কোনো ভ্যালু নেই।

আফীরা মুখ খুলল। বলল, আমি জানি।

দুজনে ঘোড়া হাঁকাল এবং এগোতে শুরু করল।

তিন.

আফীরার মনট ভেঙে গেছে। সাফওয়ান বুঝতে পেরেছে, জ্যোতিষী মহিলার কথা তার হৃদয়ের উপর ক্রিয়া করেছে। সাফওয়ান মুখ ঘুরিয়ে বলল, জ্যোতিষীর কথায় প্রভাবিত হয়ে পড়েছ আফীরা।

না, আমার একটি বিষয় মনে পড়েছে।

এমন কী বিষয় মনে পড়ল, যার জন্য তোমার মনটা খারাপ হয়ে গেল?

বছর চারেক আগের কথা। আমাদের বাড়িতে এক জ্যোতিষী এসেছিল। সে আমার হাত দেখল। তারপর কী যেন পাঠ করে বলল, তুমি পাহাড়ি দেশে যাবে। ওখানে কেউ তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। তোমার উপর দিয়ে অনেক বিপদ বয়ে যাবে। তুমি মৃত্যু কামনা করবে। শেষে এক যুবক, যার...।

আফীরা থেমে গেল। কথা শেষ করতে পারল না। সাফওয়ান বলল, যার কী?

মোটামুটি এমনই বলেছিল জ্যোতিষী।

অর্থাৎ– যার আকার-গঠন এমন হবে। সাফওয়ান একটা গঠনচিত্র উপস্থাপন করল।

আফীরা বলল, না, তা নয়।

বোধহয় বলেছিল, যার সঙ্গে আকস্মিকভাবে সাক্ষাত ঘটবে।

না, তাও নয়।

তা হলে বলেছিল, যার তুমি দাসী হবে।

আল্লাহ না করুন, আমি কারও দাসী হতে যাব কেন।

তা হলে কী বলেছিল জ্যোতিষী?

বলব না।

বলো না; আমি বুঝে ফেলেছি।

কিছুই বোঝেননি।

বিলকুল বুঝে ফেলেছি। আমাকেও জ্যোতিষী মনে করো। বলব?

বলো।

...এক যুবক, যার ভালবাসা তোমার হৃদয়ে স্থান করে নেবে।

আফীরা বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে সাফওয়ানের প্রতি তাকাল। সাফওয়ান বলল, কী, আমি ঠিক বলিনি? তোমার জ্যেতিষী একথা বলেনি?

আফীরা তার হৃদয়কাড়া চোখ দুটো সাফওয়ানের মুখপানে মেলে ধরে বলল, হ্যাঁ, মোটামুটি এমনই বলেছিল।

সাফওয়ান জিজ্ঞেস করল, কী করবে সেই যুবক?

আফীরা বলল, সে বলেছিল, সেই যুবক তোমার অসুন্ধানে তার সর্বশক্তি নিয়োজিত করবে এবং বিস্ময়কর এক পন্থা ও কৌশল প্রয়োগ করে তোমাকে উদ্ধার করে আনবে। এখন এই জ্যোতিষীও একই কথা বলল। জানি না, আমার ভাগ্যে কী আছে এবং তকদির আমাকে কোন চক্করে নিক্ষেপ করে!

সাফওয়ান বলল, চিন্তা করো না। মহান আল্লাহ যা কিছু ভাগ্যে রেখেছেন, তা-ই ঘটবে। উভয় জ্যোতিষীই একটি কথা বলেছে যে, কেউ একজন অপহরণকারীদের কবল থেকে তোমাকে উদ্ধার করে আনবে। মনটাকে শক্ত রাখো। ভীত হয়ো না। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করবেন।

আফীরা বলল, মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণ তো আল্লাহরই হাতে। আমি তাঁর কাছে মঙ্গলেরই আশা রাখি।

আফীরার অস্থিরতা বাড়তে থাকল। সাফওয়ান তার অস্থিরতা দূর করে মনের প্রফুল্লতা ফিরিয়ে আনতে বলল, তুমি আমার থেকে অশ্বারোহণ শিখে নিয়ো, কাজে আসবে।

সহসা আফীরার মুখের মলিনতা দূর হয়ে গেল। মুচকি হেসে বলল, তোমার অশ্বারোহণের জন্য বেজায় দম্ভ দেখছি।

আমি ঘোড়ার নাঙা পিঠে আরোহণ করে হরিণের পিছনে ঘোড়া হাঁকাই আর এত দ্রুতগতিতে ছুটে চলি যে, হরিণও অত দ্রত ছুটতে পারে না। তারপর ঘোড়াকে হরিণের গায়ের সঙ্গে ঘেঁষিয়ে লেজ ধরে হরিণ তুলে নিয়ে আসি।

আফীরা অলক্ষ্যে হেসে ওঠল। তার সুদর্শন ঠোঁট দুটো মেলে গিয়ে মুক্তোসদৃশ দাঁতগুলো বিজলির মতো ঝিলিক দিয়ে ওঠল। বলল, এমন না হলে কি আর দম্ভ দেখানো যায়!

সাফওয়ান বলল, হরিণ একটা পেয়ে নিই; এই খেলা আমি তোমাকে দেখাব।

দেখিয়ো, খুবই উপভোগ্য হবে এই খেলা।

এত উপভোগ্য হবে যে, তোমার বারবার দেখতে মন চাবে।

তা বটে, যদি তুমি দেখাতে পার।

তাতে তোমার সন্দেহ আছে নাকি?

এখনই কী বলব? যোগ্যতার প্রমাণ দাও; তারপর মন্তব্য করব।

সাফওয়ান প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, কিছু-কিছু মেয়ে আছে, নাম বলতে লজ্জা পায়।

আফীরা বলল, আচ্ছা, তোমাকে আমার নাম বলব কেন?

যাক গে, তুমি বলনি, তাতে কী। আমার তো জানা হয়ে গেছে।

ধুত্তুরি, হতভাগী জ্যোতিষী মহিলাটা এসেই-না গোলমালটা বাঁধাল। অন্যথায় তোমার বাপেরও সাধ্য ছিল না আমার নাম জানার।

কিন্তু দোষটা তোমার। সোজা-সোজা নামটা বলে দিলে জ্যোতিষী আসতই না।

তার মানে তুমি ওকে ডেকে এনেছ।

এখন যা কিছু বোঝ।

তুমি বোধহয় জাদুকর।

আমি জাদুকর নই। তুমিই বরং সুদর্শন জাদুকর।

আফীরা আড়চোখে সাফওয়ানের প্রতি তাকাল।

সাফওয়ান বলল, কী, অস্বীকার কর নাকি?

আফীরা বলল, অন্য কোনো কথা থাকলে বলো; এই প্যাঁচাল বাদ দাও।

ক্ষমা করো আফীরা, তুমি ক্ষেপে গেছ।

তুমি কোথায় যাচ্ছ?

মদীনা।

কী কাজে?

জিহাদে অংশ নিতে।

আফীরা আবারও হি-হি করে হেসে ওঠল। বলল, জিহাদে অংশ নিতে যাচ্ছ তুমি!

সাফওয়ান আফীরার ফুলসুন্দর মুখখানির প্রতি তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ, আমি জিহাদে অংশ নিতে যাচ্ছি। কিন্তু তুমি হাসলে কেন?

এটা কি হাসির কথা নয় যে, এই বয়সে তুমি জিহাদে যাচ্ছ!

আমার চেয়েও কম বয়সী ছেলেরা জিহাদে যায় না নাকি?

তাদের ব্যাপার আলাদা। তুমি যে আযুরি!

সাফওয়ান বুঝে ফেলেছে, আফীরা খুব দুষ্টু মেয়ে। বলল, তুমি হয়ত দেখবে না, তবে ইনশাআল্লাহ শুনতে পাবে, আমি কী কীর্তি দেখিয়েছি।

আর শোনাবেও তুমিই।

না, শোনাবে মানুষ।

ঠিক আছে, আমি শুনব।

তুমি যদি অশ্বচালনা শিখে নিতে...।

তা হলে কী হতো? আফীরা কথা কেটে জিজ্ঞেস করল।

কোনো সময় হয়ত কাজে আসত।

অশ্বচালনায় আমার মোকাবেলা করা কঠিন আছে।

এই অভিজ্ঞতা তো আমার হয়েই গেছে।

আসলে ব্যাপার হলো, আমি তোমার পরীক্ষা নিয়েছি। আমি দেখেছি, তুমি আমার ঘোড়াটাকে থামাতে পার কি-না।

আর সম্ভবত পড়ে গিয়েছিলে এটা দেখানোর জন্য যে, প্রয়োজনের সময় ঘোড়ার পিঠ থেকে এভাবে পিছলে পড়তে হয়।

আফীরা খানিক বিব্রত হয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেল।

দুজন আপন-আপন ঘোড়া হাঁকিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। হঠাৎ আফীরা তার ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিল এবং ঘোড়া প্রবলবেগে ছুটতে শুরু করল। দেখাদেখি সাফওয়ানও ঘোড়া হাঁকাল এবং ছুটে গিয়ে আফীরা সামনে চলে গেল। সাফওয়ানের ঘোড়া– যার পিঠে আফীরা চড়ে আছে– আপনা থেকে গতি আরও বাড়িয়ে দিল। আফীরা সাধ্যমতো তার বাগ টেনে ধরল; কিন্তু ঘোড়া থামল না। আফীরা শঙ্কিত হয়ে ওঠল, পাছে ঘোড়া তাকে ফেলে দেয় কিনা। সে হাঁক দিল, আয্‌রি মুজাহিদ, এত দ্রুত চলো না; ঘোড়ার গতি কমিয়ে দাও।

সাফওয়ান ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিল। আফীরার পাশাপাশি এসে বলল, এবার তো শিখবে অশ্বচালনা?

অহমিকা দেখিয়ো না। আমি সকাল থেকে ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার– ক্লান্ত হয়ে গেছি।

সাফওয়ান মুচকি একটা হাসি দিয়ে চুপ হয়ে গেল।

দুজন আরও কিছুদূর এগিয়ে গেলে সম্মুখ থেকে একটি আরবীয় ঘোড়া ছুটে আসতে দেখা গেল। আফীরা বলল, আব্বাজান আসছেন।

সাফওয়ান দুষ্টুমতি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, কী বলবে তাকে?

তোমার প্রশংসা করব। আফীরা মুচকি হেসে বলল। তারপর বলল, কাজও তুমি এমনই করেছ।

না, বোলো, ঘোড়া বেয়াড়াপনা শুরু করেছিল। আমি তাকে সামলাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভারসাম্য রক্ষা করতে পারিনি। ফলে পড়ে গিয়েছিলাম।

আফীরা হেসে বলল, কথা তো ঠিকই।

আরব লোকটি তাদের কাছে চলে এল। সাফওয়ান তাকে সালাম দিল। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে আফীরাকে বললেন, বেটী, এতদূরে চলে এসেছ তুমি!

আফীরা বলল, আমি তো অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছি আব্বু!

আরব হঠাৎ চকিত হয়ে ওঠেন, কী হয়েছিল তোমার!

আফীরা পিতাকে পুরো ঘটনা শোনাল। কীভাবে ঘোড়া তাকে নিয়ে পালাল, কীভাবে রেকাব ভেঙে গেল এবং সাফওয়ান কীভাবে তার ঘোড়াটিকে থামাল, কীভাবে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল এবং ঘোড়ার দলন থেকে রক্ষা পেল সব খুলে বলল।

আরব সফওয়ানের কৃতজ্ঞতা আদায় করে বলল, যুবক, তুমি আমার কন্যার জীবন রক্ষা করেছ। আমি তোমার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ।

সাফওয়ান বলল, আপনার মেয়ের জীবন আল্লাহ রক্ষা করেছেন। আমি উসিলা হয়েছি মাত্র। আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। এর জন্য কোনো কৃতজ্ঞতার প্রয়োজন কী।

তিনজন ধীরে-ধীরে চলতে শুরু করল।

চার.

এগোতে-এগোতে আরব আফীরাকে বলল, ঘোড়াটা তো খুবই শান্ত। কিন্তু তুমি দুষ্টুমি করে-করে ওকে ক্ষেপিয়ে তোল। আমি তোমাকে কতবার নিষেধ করেছি; কিন্তু তুমি শুনছ না।

আমি দুষ্টুমি করি, না-কি ঘোড়াটাই দুষ্টু!

ঘোড়া যদি বেয়াড়া হতো, তা হলে সাওয়ারই হতে দিত না। এই যুবক যদি ঘটনাক্রমে না এসে পড়ত, তা হলে আজ তোমার সব দুষ্টুমি আর দুরন্তপনা শেষ হয়ে যেত।

আমি পড়তাম না; কিন্তু রেকাবটা ভেঙে গিয়েছিল।

আল্লাহ অনেক দয়া করেছেন। প্রতিজ্ঞা নাও, এখন থেকে আর দুষ্টুমি করবে না।

এখন আর আমি এই ঘোড়ায় সাওয়ারই হব না।

অপর ঘোড়াটি খুবই বেয়াড়া। ওতে সাওয়ার হলে একদিনেই তোমাকে সোজা করে দেবে।

আমিই ওকে সোজা করে দেব।

কোরো। আমার হাতে তো সোজা হয় না। তোমার হাতে হয়ত হয়ে যাবে।

আমি ধরেই ওকে বশ করে ফেলব।

সাফওয়ান ফিস্‌ফিস্‌ কণ্ঠে– যেন আফীরাই শুধু শুনতে পায়– বলল, তুমি মানুষ বশ করতে পার– পশুদের নয়।

আফীরা মনকাড়া দৃষ্টিতে সাফওয়ানের প্রতি তাকাল। তার বাবা তাকে বলল, এই ভরসায় থেকো না– ঘোড়াটাই বেয়াড়া।

অপর ঘোড়াটির পিঠে আরব সাওয়ার হয়ে আছেন। আফীরা নিশ্চুপ হয়ে গেল। আফীরার পিতা সাফওয়ানকে উদ্দেশ করে বললেন, তোমার নাম কী যুবক?

আমার নাম সাফওয়ান।

কোন গোত্রের লোক?

বনু আয্‌রা গোত্রের।

কার ছেলে?

আমি উসাইদের পুত্র।

উসাইদের পুত্র– আরর আপন স্মৃতিশক্তির উপর খানিক চাঁপ দিলেন। স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়িয়ে দেখলেন উসাইদ নামে কাউকে পাওয়া যায় কি-না। হঠাৎ তার কী যেন মনে পড়ে গেল। বললেন, উসাইদ। আচ্ছা, ইসানতের ছেলে উসাইদ নাকি?

জি, আপনি ঠিকই ধরেছেন।

প্রবীণ আরবের মুখে খুশির আভা ফুটে ওঠল। বললেন, উনি আমার বন্ধু ছিলেন। আমি যখনই ওকাজ বাজারে যেতাম, প্রায়ই তার বাড়িতে মেহমান হতাম। সে-সময় তুমি ছোট ছিলে– এই দশ-বারো বছরের বালক। আমি তার মৃত্যুর খবর শুনেছিলাম। কিন্তু এত ব্যস্ত ছিলাম যে, তোমাদের কাছে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

আপনার নাম বোধহয় আমের নাহ্‌মি, না?

হ্যাঁ, আমি আমের নাহ্‌মি। তুমি দেখছি আমার নামও জান!

আব্বাজান প্রায়ই আপনার নাম আলোচনা করতেন। আর একটি মেয়ের কথাও।

আমের নাহ্‌মি হেসে বললেন, সেই মেয়েটিই এই আফীরা। খুব দুষ্টুমি করত তার সঙ্গে। আর তুমিও খুব বিরক্ত করতে। মনে আছে তোমার?

সাফওয়ান আফীরার লাজুক মুখপানে তাকিয়ে রসিয়ে বলল, তখন ওর খুব নাক ঝরত।

আমের খুব হাসলেন। পরে বললেন, সেকথা ওকেই জিজ্ঞেস করো, ওর নাক ঝরত কি-না।

আফীরা বলল, আমি রাবেগে একটি ছেলেকে দেখতাম। ওর পেটটা ছিল মটকার মতো। হাঁটতে গেলে ধপাস্-ধপাস্ পড়ে যেত। জানি না, ও কে ছিল।

আমের মেয়ের কথায় হেসে ফেললেন। বললেন, ওর কথা সাফওয়ানকে জিজ্ঞেস করো।

আফীরা মিটিমিটি হেসে সাফওয়ানের দিকে তাকাল। সাফওয়ান বলল, আর মেয়েটি ছিল একেবারে হ্যাংলা, যেন একটি শুকনো লাঠিতে কাপড় প্যাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। হাঁটার সময় বাতাসের ঝাপটায় এদিক-ওদিক কাত হয়ে পড়ত। ঠেক দেওয়ার জন্য হাতে লাঠি রাখত।

আমের বললেন, হালকা-পাতলা ছিল বটে; কিন্তু কংকালও ছিল না আর হাতেও লাঠি রাখত না। তোমার পেটও মটকার মতো ছিল না। দুজনে দীর্ঘদিন পরে মিলিত হয়েছ তো।

সাফওয়ান বলল, আর তা-ও ঘটনাক্রমে। আফীরা যদি অশ্বচালনা জানত আর ঘোড়া তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যেত, তা হলে বোধহয় এই সাক্ষাতও ঘটত না।

আমের বললেন, ও অশ্বচালনা ভালোই জানে। কিন্তু মেয়েটার অভ্যাস হলো, ও ঘোড়াকে খুব বিরক্ত করে তোলে। তাতে ঘোড়া প্রায়ই ওকে ফেলে দেয়। কিন্তু তারপরও অভ্যাসটা ছাড়ছে না।

আফীরা বলল, কিন্তু ইনি বিশ্বাসই করছেন না যে, আমি অশ্বচালনা জানি।

সাফওয়ান বলল, শাহসাওয়ার কখনও পড়ে যায় না।

যে শাহসওয়ার সে-ই পড়ে। পড়ে না আনাড়ীরা। যুদ্ধের মাঠে শাহসাওয়ারই পড়ে যায়। যে-শিশুটি হামাগুড়ি দিয়ে চলে, সে কী আর পড়বে।

আমি যদি এসে না পৌঁছুতাম, তা হলে তোমার শাহসাওয়ারির সব পারদর্শিতা আজ বাতাসে মিশে যেত।

আমের বললেন, আল্লাহ তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অন্যথায় আজ ও সকল দুষ্টুমির শাস্তি একসঙ্গে পেয়ে যেত।

আফীরা বলল, রেকাবটা ভেঙে গিয়েছিল। অন্যথায় আমি ঘোড়াটাকে ঠিক করে নিতাম। কোনো সমস্যাই হতো না।

সাফওয়ান বলল, তোমার ঘোড়া খুব শিষ্ট। দেখনি, পড়ে গিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল?

আমের জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ সাফওয়ান?

মদীনা মোনাওয়ারায়।

উনি জিহাদে অংশ নেয়ার ইচ্ছা রাখেন। আফীরা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল।

আমের বললেন, তাই নাকি, জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা আছে নাকি তোমার?

জি। সে-উদ্দেশ্যেই বাড়ি থেকে বের হয়েছি।

খুবই মহৎ লক্ষ্য। আমিও জিহাদে যেতে এসেছি। শুনেছি, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারুক (রা.) ইরানিদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

আমিও শুনেছি।

সিরিয়ার যুদ্ধ জয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। মহামতি হেরাক্লিয়াস সিরিয়া থেকে পালিয়ে গেছেন। এন্তাকিয়ার উপর মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইরানেও গোটাকতক প্রদেশ মুসলমানদের হাতে চলে এসেছে। অনারব রাজা ইয়ায্‌দাজার্‌দ দেউলিয়ার মতো ঘুরে ফিরছে। পরাজয় ও রাজত্ব হারানোর বেদনা তাকে কুরে-কুরে খাচ্ছে। তিনি মুসলমানদের ইরান থেকে তাড়ানোর জন্য কোমর বেঁধে মাঠে নামার চেষ্টা করছেন। তথ্য পেয়েছি, তিনি বিশাল এক বাহিনী প্রস্তুত করে নিয়েছেন। তিনিও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন।

ঘটনা এমনই। এ-কারণেই আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারুক (রা.) চূড়ান্ত আঘাতের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন।

ইনশাআল্লাহ আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে যে, ইরান পদানত হবে এবং সেখানে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশ তো পূর্ণ হয়ে গেছে। ইরানের রাজধানী মাদায়েন জয় হওয়ায় ইরান সরকারের ধনভাণ্ডার মুসলমানদের হাতে চলে এসেছে। বাকি অংশও ইনশাআল্লাহ জয় হয়ে যাবে।

ইনশাআল্লাহ।

তিনজন আফীরাদের তাঁবুর নিকটে চলে এসেছে। এখান থেকে দাঁড়িয়ে-থাকা-তাঁবুগুলো চোখে পড়তে শুরু করেছে। ওখানে কয়েকটি খেজুরঝাড় আছে। তাঁবুগুলো ওগুলোর ছায়াতেই স্থাপিত হয়েছে। আরবের মরু-অঞ্চলে খেজুরের কয়েকটি গাছও আল্লাহ পাকের অনেক বড় নেয়ামত

মনে করা হয়। এসব গাছের শীতল ছায়া পথচারীদের অনেক শান্তি দান করে।

তখন বেলা দ্বি-প্রহর। প্রখর রৌদ্রতাপ। দমকা বাতাস বইতে শুরু করেছে। বায়ু বালু উড়িয়ে-উড়িয়ে চোখে-মুখে ভরে দিচ্ছে।

তার চারদিকে বিস্তীর্ণ মরূদ্যান। স্থানে-স্থানে আকাশছোঁয়া বালির টিলা। সাদা বালিকণাগুলো চিকচিক করছে, যেন জায়গাটা বালির সমুদ্র। তাতে ক্ষণে-ক্ষণে ঢেউ তুলছে যেন বাতাস।

আমের বললেন, আরও দ্রুত এগোতে হবে। দমকা বাতাস বইতে শুরু করেছে। বাতাসের তীব্রতা আরও বেড়ে যাবে। তার আগে কাফেলায় পৌঁছুতে না পারলে বিপদ হবে।

মরুভূমিতে অনেক সময় এমন হয় যে, প্রচণ্ড লু হাওয়া প্রবাহিত হয়ে পথচারীদের শরীর ঝলসে দেয়, বালির টিলা-টিপিগুলো উপড়ে যায়, ধুলাবালিতে চোখ বন্ধ হয়ে যায় এবং পথিক পথ হারিয়ে ফেলে। পরে বাতাসের তীব্রতা কমে আসার পর যখন চোখ খোলে, তখন তাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না যে, আমরা পথ হারিয়ে কোথায় চলে এলাম।

এরা তিনজন দ্রুতগতিতে চলতে শুরু করল। তাদের ঘোড়াগুলোও সম্ভবত বুঝে ফেলেছে, যদি তাড়াতাড়ি কাফেলায় গিয়ে পৌঁছুতে না পারি, তা হলে ঝঞ্ঝাবায়ু তাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে এবং মরুঝড় তাদের পথচ্যুৎ করে অন্যত্র নিয়ে যাবে। ফলে তারা তীব্রগতিতে ছুটতে শুরু করল এবং কাফেলায় পৌঁছে গেল।

আফীরাকে কাফেলায় পৌঁছিয়ে দিয়ে সাফওয়ান বলল, আমি অনুমতি চাচ্ছি।

আমের বিস্ময়ের সঙ্গে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাবে তুমি এখন?

সাফওয়ান বলল, আরও কিছু পথ এগিয়ে থাকতে চাই।

আফীরা টিপ্পনি কাটল, ওনার বোধহয় বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা আছে।

আমের বললেন, বেটা, এই পরিস্থিতিতে কোথাও যেয়ো না। তোমার পিতা আমার বন্ধু নন– ভাই ছিলেন। আমি তোমার চাচা। আমার তাঁবুটা তোমার জন্য প্রস্তুত আছে। তুমি আমার সঙ্গে থাকো।

সাফওয়ান বলল, আমার উপস্থিতিতে আপনার বা আফীরার কষ্ট হবে।

আমের বললেন, না, আমাদের কোনো কষ্ট হবে না।

সাফওয়ান আমের ও আফীরার সঙ্গে চলতে শুরু করল।

পাঁচ.

সাফওয়ান আফীরাদের তাঁবুতে পৌঁছে গেল। অতি ক্ষুদ্র একটি কাফেলা। কয়েকটিমাত্র তাঁবু, যেগুলো খানিক দূরে-দূরে দাঁড়িয়ে আছে। খেজুরডালের খুঁটি পুঁতে কম্বলের ছাদ তৈরি করে ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে মাত্র। তীব্র বাতাস তাঁবু ও কম্বলগুলোকে নাড়িয়ে তুলছে বটে; কিন্তু তাঁবুগুলো শক্তভাবে স্থাপন করা হয়েছে বিধায় বাতাসের ঝাপটা সহ্য করেও দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাতাস তাঁবুগুলোতে মাথা কুটে-কুটে সরে যাচ্ছে।

গরম খুব বেড়ে গিয়েছিল। তীব্র লু চলছিল। বালি উড়ে-উড়ে এমনভাবে এসে-এসে পড়ছিল, যেন কেউ মরুভূমির বালিগুলো উলটে দিচ্ছে। খেজুরের আকাশচুম্বী গাছগুলোর কারণে এ-জায়গাটি খুবই শান্তিময় ও নিরাপদ। কাফেলার লোকগুলো তাঁবুর ভেতরে ও কম্বলের ছায়ায় ঢুকে গুটিশুটি মেরে বসে আছে।

আমের ও সাফওয়ান ঘোড়াগুলোকে বাঁধলেন। আফীরা তাদের আগে তাঁবুতে ঢুকে পড়েছে। এরা দুজন ঢুকতে-না-ঢুকতে ওর হাত-মুখ ধোওয়া শেষ হয়ে গেছে। তারাও একধারে বসে হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেস হয়ে একস্থানে বসে পড়ল। তাঁবুর ভেতরের পরিবেশটা খুবই শান্তিময়। দরজার পর্দাটাও বেশ মোটা। ফলে পর্দা ভেদ করে বাতাস তেমন একটা ভেতরে ঢুকতে পারছে না। বেশ আরামদায়ক ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব।

আমের মেয়েকে উদ্দেশ করে বললেন, মেহমানের জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করো মা।

আফীরা আপনা থেকেই খাবার বের করছিল। পিতার আদেশের জবাবে বলল, আনছি আব্বু।

আফীরা খাবার এনে হাজির করল। দস্তরখান বিছানো হলো। তিনজন একসঙ্গে বসে খেতে শুরু করল। খাবার হলো যবের আচালা আটার রুটি আর যয়তুন তেল। তারা তেলে ডুবিয়ে-ডুবিয়ে রুটি খেতে শুরু করল।

আহার শেষে আমের দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সাফওয়ানকে তার পিতার কথা জিজ্ঞেস করতে থাকেন। পরে বিশ্রামের জন্য আমের ও সাফওয়ান একধারে শুয়ে পড়লেন আর আফীরা আলাদা একধারে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে আমেরের চোখ লেগে গেল। সাফওয়ান ও আফীরা সজাগ সময় অতিবাহিত করতে লাগল।

বেলা পড়ে গেলে আমের জেগে ওঠলেন। তিনি অজু করে তাঁবুর বাইরে গিয়ে আযান দিলেন। আযানের শব্দ শুনে কাফেলার সব মানুষ তাঁবু ও

কম্বলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। সকলে অজু করে চার রাকাত সুন্নত আদায় করল। তারপর জামাত অনুষ্ঠিত হলো। আমের কাফেলার আমীর। তিনি নামাযের ইমামতি করলেন। ফরজের পর সবাই দু-রাকাত সুন্নত ও নফল আদায় করে নিজ-নিজ তাঁবুতে চলে গেল।

সাফওয়ান যখন তাঁবুতে প্রবেশ করল, ততক্ষণে আফীরাও নামায শেষ করে অবসর হয়েছে। আমের এখনও এসে পৌঁছাননি। তিনি বাইরে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন।

আফীরা বলল, নামায পড়ে এসেছ, না?

সাফওয়ান বলল, হ্যাঁ, আল্লাহ কবুল করুন।

তীব্র ঝড়োহাওয়া বইছে। তাঁবুর ভেতরেও শরীরে সূঁচ বিদ্ধ হচ্ছে যেন।

হ্যাঁ, এক সেইসব দুহিতা, যাদের দেহ তাঁবুর মধ্যেও সূঁচ বিদ্ধ হচ্ছে। এক মা হাওয়ার সেই কন্যারা, যারা প্রখর রোদে তীব্র লু-হাওয়ার মধ্যে মরুভূমিতে ঘুরে ফিরছে।

এক সেই নওজোয়ান, যে ঝড়োহাওয়া ও রৌদ্রতাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাঁবুতে বসে আশ্রয় খুঁজছে, আর এক সেই আদমপুত্ররা, যারা কড়া রোদ আর গরম ঝড়োহাওয়ায় মরু-বিয়াবানে গন্তব্যহীন পথ চলছে।

আমিও তাদেরই একজন। আর সফর তো অব্যাহতই রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু...।

কিন্তু সাহস হয়নি। তা-ই তো? আফীরা সাফওয়ানের কথা কেটে খোঁচা মারল।

তুমি বাস্তবকে অস্বীকার করছ। তুমি তো জান, তোমার আব্বাজানই আমাকে ঠেকিয়ে রেখেছেন।

অজুহাত একটা প্রয়োজন ছিল। মুখে বিদায়ের অনুমতি চাইলেও সাহসে তো হাঁটু কাঁপছিল। সেই অবস্থায় আব্বু খানিক বললেন, যেয়ো না; আর তুমি সুযোগটা লুফে নিয়েছ। এই না বাস্তব ঘটনা!

ঠিক আছে, দেখাব মজা। আমি এখনই রওনা হয়ে যাব।

বুঝেছি, একটু পরে বাতাস থেমে যাবে। সূর্যের তাপ কমে যাবে। আর তখন অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে বীরের মতো চলে যাবে। এই না মতলব! ঠিক আছে, এই ফাঁকে কতক্ষণ আমার সঙ্গে আর কতক্ষণ আব্বুর সঙ্গে কথা বলে সময়টা কাটিয়ে দাও।

তা হলে ঠিক আছে, আজ যাব না। কাল ঠিক দুপুরবেলা কড়া রোদে ও লু-হাওয়ার মধ্যে রওনা হয়ে যাব।

ঝড়োবাতাস আর লু-হাওয়া তোমার এই সাহস ও বীরত্বকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তুমি টেরই পাবে না বাহাদুর সাহেব।

আমি সেই বীর-বাহাদুরদের একজন, যারা মরুভূমির ঝড়োহাওয়া ও লু-হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দেয় আর যাদের দেখে ঝড়োহাওয়া-লু-হাওয়ারা পেছনে সরে যায়।

আহা রে, এ-কারণেই তো ঝড়োহাওয়ার তীব্রতা আরও বেড়ে গেছে। যাও না, তাঁবুর বাইরে গিয়ে ঝড়টা থামিয়ে দিয়ে আসো না বীর সাহেব। বলেই আফীরা হেসে ওঠল।

এমন সময় আমের এসে তাঁবুতে ঢুকলেন। বললেন, কাকে বলছিলে ঝড়োহাওয়া থামিয়ে দিতে আফীরা?

আফীরা সাফওয়ানের প্রতি ইঙ্গিত করে বলল, এঁকে। ইনি বলছেন, এঁকে দেখে নাকি ঝড়-তুফান পেছনে সরে যায়।

আমের বললেন, দুষ্টু মেয়েটির কথায় দোষ ধরো না সাফওয়ান। ও যখন ছোট ছিল, তখনও দুষ্টু ছিল। আর বড় হয়ে এখন আরও দুষ্টু হয়ে গেছে। কিন্তু বিবাদটা শুরু হলো কোন কথার সূত্র ধরে?

সাফওয়ান বলল, ওকেই জিজ্ঞেস করুন।

আফীরা বলল, তুমিই বলো না।

সাফওয়ান বলল, ও বলছিল, এমন তীব্র ঝড়োহাওয়া বইছে যে, তাঁবুতে বসে গা ফুটছে। আমি বললাম, এক হলে তুমি যে, তাঁবুতে বসেও শরীর ফুটছে আর এক হলো সেই নারী, যে তীব্র গরমের মধ্যে মরুভূমিতে ঘুরে ফিরছে।

আমের বললেন, তুমি তো ঠিকই বলেছ।

আফীরা বলল, পুরুষ তো, তাই পুরুষের পক্ষপাতিত্ব শুরু করেছ। তারাও তো আল্লাহর বান্দা, যারা প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ ও গরম বালির মধ্যে পায়ে হেঁটে সফর করছে।

আমের বললেন, তারা তো আমাদেরই ভাই, না?

আফীরা বলল, আর একজন আছে তোমার জাতের, যে ঝড়ের ভয়ে ভীত হয়ে তাঁবুতে বসে আশ্রয় নিয়েছে।

আমের বললেন, এ তো চলেই যাচ্ছিল। আমি-না একে ধরে রেখেছি।

সাফওয়ান বলল, কিন্তু আফীরা এ-কথাটা স্বীকারই করছে না।

আফীরা বলল, এখন তোমরা দুজন হয়ে গেছ; এখন তো মানতেই হবে।

বাধ্য হয়ে, না?

না-না খুশিমনে, সন্তুষ্টচিত্তে।

সত্য ও বাস্তবতাকে মেনে নেয়ার জন্য তোমাকে অনেক-অনেক ধন্যবাদ।

তুমি জিতে গেছ, না?

পুরুষ কখনও নারীর উপর জয়ী হতে পারে না।

আমের বললেন, তুমি বিলকুল সত্য বলেছ। তুমি হেরেও জিতে যাবে। ওদের হার-জিতের কোনো ঠিক-ঠিকানা আছে নাকি।

আফীরা বলল, আমার আর কোনো কথা নেই।

আমের বললেন, এখানে কিছু বলার সুযোগই-বা কোথায়। আচ্ছা, এই আলোচনা বন্ধ করো। বলো, রাতের খাবারের ব্যবস্থা কী আছে?

যা বলবে, তৈরি করে দেব। কী খাবেন বলুন। মেহমানও তো একজন আছে।

আমি কী আর বলব, বকরি-টকরি একটা জবাই করে নাও।

আফীরা হেসে বলল, বকরি যবাই করব আমি?

আমের বললেন, সাফওয়ান তোমাকে সাহায্য করবে।

আফীরা খোঁচা মারল, ওকে দেখে যদি ঝড়োহাওয়া এসে পড়ে, তাহলে?

সাফওয়ান বলল, আমার মুখ দেখেই পালিয়ে যাবে।

আমের হেসে বললেন, ব্যস, তা হলে ঝড় আসবেই না।

আফীরা তাঁবুর বাইরে গিয়ে একটি বকরি যবাই করল এবং ফিরে এসে বলল, আমি বকরি যবাই করে এসেছি। এবার তুমি গিয়ে চামড়াটা খসিয়ে দাও।

সাফওয়ান বলল, আমি মুজাহিদ। হত্যা করতে জানি, যবাই করতে জানি। চামড়া খসানো আমার কাজ নয়। এই কাজ তো মহিলাদের।

আমের বললেন, দুষ্টুমিতে তোমরা দু-জনই সেরা।

আফীরা পুনরায় বেরিয়ে গিয়ে চামড়া খসাতে শুরু করল। পরক্ষণে সাফওয়ানও গিয়ে হাজির হলো। বলল, দাও, খঞ্জরটা আমাকে দাও। কোমল হাত ব্যথা পাবে।

আফীরা খানিক আত্মম্ভরী দৃষ্টিতে সাফওয়ানের প্রতি তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, আমার বাহুতে এত শক্তি আছে যে...।

...বকরি যবাই করতে পারি। সাফওয়ান আফীরার কথা কেড়ে নিয়ে হেসে বলল। দুজনের চোখাচুখি হলো। উভয় উভয়কে মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে নীরব হয়ে গেল।

রাতের খাবারটা বেশ সুস্বাদু হলো। তিনজন পেটভরে তৃপ্তি সহকারে খেল। কিছু গোশত কাফেলার অন্য সদস্যদেরও দেওয়া হলো।

পরদিক ফজর নামাযের পর কাফেলা যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করল। তাঁবুগুলো তুলে ফেলা হলো। মালপত্র বেঁধে উট-ঘোড়ার পিঠে বোঝাই করা হলো।

কাফেলা মদীনা অভিমুখে রওনা হয়ে গেল।

ছয়.

কাফেলা মদীনার দিকে এগিয়ে চলছে। তাদের মনে আগ্রহ ও উদ্দীপনার সীমা নেই। তাদের কেউ-কেউ এর আগেও এই পবিত্র নগরীতে এসেছিল। অনেকের এখন পর্যন্ত এই পুণ্যভূমির দর্শন নসিব হয়নি।

তারা এক-একটি মনযিল অতিক্রম করছে আর তাদের ও মদীনার মধ্যকার দূরত্ব কমছে। দূরত্ব হ্রাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তাদের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস। হৃদয়ে কামনা জাগল, যদি আমাদের শরীরে পালক গজাত আর আমরা পাখির মতো উড়ে দ্রুত পৌঁছে যেতে পারতাম সোনার মদীনা!

মদীনার আদি নাম ইয়াস্‌রিব। এই নগরীটি কোন সময় আবাদ হয়েছিল এবং কে আবাদ করেছিল, তা কেউ বলতে পারে না। ইতিহাস থেকে শুধু এটুকু জানা যায় যে, প্রাচীনকালে ইহুদিরা এসে এখানে বসতি স্থাপন করেছিল।

ইয়াস্‌রিবের কোনো খ্যাতি ছিল না। এর মর্যাদা শুধু এটুকু ছিল যে, এটি আরবে মক্কার পর সর্বাপেক্ষা বড় নগরী এবং মক্কার যেসব কাফেলা ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া যেত, তারা দিন কতক এখানে অবস্থান করে বিশ্রাম গ্রহণ করত।

কিন্তু শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কার কাফির-মুশরিকদের জালাতন-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে হিজরত করলেন এবং ইয়াস্‌রিব চলে এলেন, তখন এই নগরী বিশ্বময় বিখ্যাত হয়ে গেল। তখন এর পূর্বনাম পরিবর্তিত হয়ে 'মদীনাতুন-রাসূল' বা 'রাসূলের নগরী' হয়ে গেল। আজও জগতে এই পবিত্র নগরী এ-নামেই পরিচিত। ইতিহাস-ভূগোলও তাকে এ-নামেই ডাকে। নগরীটি এখন সৃষ্টিকূলের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত। পৃথিবীর আনাচ-কানাচ থেকে যেসব মানুষ হজ করতে মক্কা গমন করে, তারা নবীজি (সা.)-এর রওজা যিয়ারতের জন্য মদীনাও গিয়ে থাকে।

যাহোক একদিন কাফেলা এমন একস্থানে গিয়ে উপনীত হলো, যেখান থেকে কুবার উঁচু-উঁচু ভবনগুলো চোখে পড়তে শুরু করেছে। কাফেলার হৃদয়সমুদ্রে আনন্দের ঢেউ উথলে ওঠল।

কুবা মদীনা থেকে দু-মাইল দূরে অবস্থিত একটি লোকালয়। তবে মানুষ তাকে মদীনার একটি অঞ্চল বলেই চেনে। আল্লাহর রাসূল (সা.) হিজরত করে প্রথমে এই অঞ্চলে গমন করেছিলেন।

কাফেলা যখন এখানে এসে পৌঁছুল, তখন বেলা দ্বি-প্রহর। প্রখর সূর্যতাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত। মাঠের বালিগুলো এত গরম হয়ে গেছে যে, তাতে ধান ছিটালে খই ফুটবে। তীব্রবেগে লু-হাওয়া বইছে। কিন্তু যেহেতু মদীনা খেজুর বাগান সমৃদ্ধ অঞ্চল, তাই এখানকার সূর্যতাপ অতটা অসহনীয় নয়, যতটা অসহনীয় মরু-অঞ্চলের। যে-এলাকায় গাছ থাকে, সেখানে প্রখর রোদের উত্তাপ ও লু-হাওয়ার কঠোরতা ক্রিয়া করে কম।

কাফেলা বেজায় উদগ্রীব। কখন নবীনগরীর প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছে যাবে, কখন প্রিয়নবীর পবিত্র মাজারের দর্শন লাভ করবে, কখন মসজিদে-নববীতে ঢুকে নামায পড়বে! তাদের তর সইছে না।

তারা চলার গতি আরও বাড়িয়ে দিল।

তারা এগিয়ে চলছে। হঠাৎ দেখল, পথের ধারে একটি বাবলা গাছের তলে একজন মানুষ শুয়ে আছে। লোকটির মাথার নিচে বালিশের জায়গায় একখণ্ড পাথর। পরিধানে কয়েক স্থানে তালি লাগানো জামা। পাজামার পা দুটোতেও তালি। বেশ নির্লিপ্ত মনে ও নির্ভীক চিত্তে মধুর ঘুমের স্বাদ উপভোগ করছে। সন্নিকটে একটি বর্ম পড়ে আছে। দু-পায়ে একজোড়া ছেঁড়া চপ্পল।

বাবলা গাছটি তেমন বড় বা ঝোপালো নয়। ডাল-পাতার ফাঁক গলে-গলে রোদ এসে লোকটির গায়ে পড়ছে। তবু তার সুখনিদ্রায় কোন ব্যাঘাত ঘটছে না।

কাফেলা গাছটির সামান্য দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল। আমের ও সাফওয়ান ঘোড়ার পিঠে সকলের সম্মুখে। আমের গভীর চোখে লোকটিকে দেখে বলল, আমীরুল মুমিনীন নয়ত আবার!

সাফওয়ান নিরীক্ষার চোখে লোকটিকে দেখল। বলল, আমি আমীরুল মুমিনীনকে কখনও দেখিনি। কাজেই আমি বলতে পারব না ইনি আমীরুল মুমিনীন কি-না।

আমের বললেন, আমিও মাত্র একবারই দেখেছি। আমার মন বলছে, ইনি আমীরুল মুমিনীনই।

কিন্তু তিনি মদীনার বাইরে বন এলাকায় একাকি কেন আসবেন?

আমি শুনেছি, তিনি কখনও শামের রাস্তায়, কখনও ইরানের রাস্তায়, কখনও ইয়েমেন ও মক্কার রাস্তায় বিভিন্ন কাফেলা ও দূতদের অপেক্ষায় বেরিয়ে আসেন। আমার মন সাক্ষ্য দিচ্ছে, ইনি আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারুকই। ওই দেখো না, তাঁর পাশে একটি বর্ম পড়ে আছে। বর্ম তো তিনিই সঙ্গে রাখেন।

তাঁর গায়ে রোদ পড়ছে। আমরা ছায়ার ব্যবস্থা করলে ভালো হয় না?

খুবই ভালো কাজ হবে। আল্লাহ এর জন্য আমাদেরকে ছাওয়াব দান করবেন। এই মর্দে-মুমিন খেলাফতের কাজ-কর্ম, এতিম, বিধবা ও গরিব-অসহায়দের সুখ-শান্তির কাজে এত ব্যস্ত থাকেন যে, নিজের আরামের প্রতি একদম খেয়াল করেন না। প্রায় সময় দূতের অপেক্ষা করতে-করতে জঙ্গলে কোনো গাছের তলে ঘুমিয়ে পড়েন। এস, আমরা তাঁর জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করি।

দুজন ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে একখানা কম্বল নিয়ে পা টিপে-টিপে এগিয়ে গেলেন এবং কম্বলটি ছড়িয়ে ধরে এমনভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন, যেন ঘুমন্ত লোকটির গায়ে রোদ না পড়ে।

কাফেলার লোকেরা জেনে ফেলেছে, আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সুযোগ্য উত্তরসূরী এবং দ্বিতীয় খলীফা আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) বাবলা গাছের তলে শুয়ে আরাম করছেন। এই লোকটিকেই তো একনজর দেখার জন্য তারা উদগ্রীব। কিন্তু কেউ তাঁকে দেখার জন্য এগিয়ে গেল না। কারণ, তাতে তাঁর ঘুম ভেঙে যেতে পারে, আরামে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিকে কষ্ট দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

আমের ও সাফওয়ান ছায়ার ব্যবস্থা করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। অল্পক্ষণ পর শয়িত লোকটির ঘুম ভেঙে গেল। তিনি শান্তমনে উঠে বসে বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা?

আমের বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আমি আমের নাহ্মি।

লোকটি আমীরুল মুমিনীন হযরত ফারুকই (রা.)। তিনি সাফওয়ানের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, আর এ?

সাফওয়ান বলল, মহান খলীফা, আমি সাফওয়ান আয্‌রি।

আমীরুল মুমিনীন জিজ্ঞেস করলেন, তা তোমরা কেন এসেছ?

আমের উত্তর দিলেন, আমরা জিহাদের জন্য এসেছি।

আমীরুল মুমিনীন বললেন, আমি তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। রাতে স্বপ্নে দেখেছি, এক লোক এপথে এসেছে। সে ইরান গেছে এবং

ইরানিদেরকে পরাজিত করে ইয়াযদাজারদকে তাড়িয়ে দিয়েছে। দুপুরের খানিক আগে আমি এখানে এসে পড়েছি এবং লোকটির অপেক্ষা করতে শুরু করেছি। বোধহয় সেই লোকটি তোমাদেরই একজন হবে।

ইয়াযদাজারদ ইরানের সম্রাট। ইরানের সম্ভ্রান্ত বংশ কিয়ানের সদস্য। নওশেরওয়ার বংশধর। মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। সে-সময় তিনি খোরাসানের এক অঞ্চলে অবস্থান করছিলেন এবং সেখানকার লোকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছিলেন। এটি হিজরি ২৩ সনের ঘটনা।

আমের বললেন, আপনি দু'আ করুন আমীরুল মুমিনীন, যেন সেই লোকটি আমাদেরই কেউ হয়। ইয়াযদাজারদকে হত্যা, গ্রেফতার কিংবা দেশান্তর করার গৌরব আমরা অর্জন করতে চাই।

মুসলমানদের মাঝে এই ধারণা বিদ্যমান ছিল যে, আমীরুল মুমিনীন যে-দু'আ করেন, তা সাধারণত কবুল হয়ে যায়। হযরত উমর (রা.) বললেন, আল্লাহ ভালো জানেন, সেই লোকটি কে হবে। তোমরা আমার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছ: নিজেরা রোদে দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে ছায়া দিয়েছ।

আমের বললেন, আমরা আপনাকে এত ভালবাসি যে, আপনার জন্য কুরবান হয়ে যেতে মন চায়।

আমীরুল মুমিনীন বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকেই ভালবাসো। আমি তো আল্লাহর একজন গুনাহগার বান্দা মাত্র।

এতক্ষণ কাফেলার সব মানুষ আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.)-এর চারপাশে এসে ভিড় জমিয়ে ফেলেছে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলুন, এবার মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হই।

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) পায়ে হেঁটে মদীনা অভিমুখে রওনা হলেন। এমতাবস্থায় কার সাধ্য উট-ঘোড়ায় সাওয়ার হয়। শুধু নারী ও শিশুরা হাওদায় বসে থাকল। পুরুষরা সবাই আমীরুল মুমিনীনের পেছনে-পেছনে পায়ে হাঁটতে শুরু করল। আমীরুল মুমিনীন সকলের আগে-আগে হাঁটছেন।

তাঁরা প্রথমে কুবায় প্রবেশ করলেন। বাইরে কোনো জনমানবের চিহ্ন নেই। সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কুবাবাসী আপন-আপন ঘরে আশ্রয় নিয়ে আছে। অথচ তাদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব ও শাসনকর্তা জঙ্গল থেকে আসছেন।

কুবা অতিক্রম করে কাফেলা মদীনায় প্রবেশ করল। তারা লক্ষ্য করল, চারদিক থেকে মানুষ ছুটে এসে-এসে মসজিদে-নববীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মসজিদের কাছাকাছি গিয়ে তারা ওখানে বিশাল এক জনসমাবেশ দেখতে পেল। মসজিদের সামনে একধারে এমন কতগুলো পশু দাঁড়িয়ে আছে, যেগুলো উটের মতো উঁচু ও মোটাতাজা। কিন্তু গায়ের রং কালো। তারা পশুগুলো চিনতে পারল না। এই অদ্ভূত পশুগুলো দেখে তারা বিস্মিত হলো।

সাত.

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারুক (রা.)-কে দেখেই জনতা আদবের সঙ্গে সরে যেতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই মালে-গনীমত কোথা থেকে এল?

এক আরব সম্মুখে এগিয়ে এলেন। লোকটি সর্বাঙ্গ ধূলিমলিন ও পরিশ্রান্ত। অনুমিত হলো, কোনো দূর অঞ্চল থেকে সফর করে এসেছেন। তিনি সালাম দিলেন। আমীরুল মুমিনীন সালামের উত্তর দিয়ে গভীর চোখে তাঁর প্রতি তাকালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথা থেকে এসেছ?

আরব উত্তর দিলেন, আমি মুকরান থেকে এসেছে।

মুকরান থেকে। আমীরুল মুমিনীন বললেন। তারপর কী যেন ভাবতে শুরু করলেন। পরক্ষণেই বললেন, সম্ভবত তুমি হাকাম ইবনে উমর আশ-শাতীর দূত।

হযরত উমর (রা.) মুকরানের যুদ্ধে হাকাম ইবনে উমর আশ–শাতীকে সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। ইয়ায্‌দাজার্‌দ একদিকে ইস্‌ফাহান থেকে মুকরান পর্যন্ত অপরদিকে ইসফাহান থেকে কিরমান, সিসতান, নিশাপুর, হেরাত ও মারাদ পর্যন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। সে-কারণে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) উক্ত অঞ্চলে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

যেসব মুসলিম গভর্নর ইরানের বিভিন্ন প্রদেশে দখল প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিলেন, হযরত উমর (রা.) তাঁদের প্রতি আদেশ প্রেরণ করেছেন, যেন ওপথে কোনো ইরানি বাহিনী পথ অতিক্রম করতে না পারে। যেন তারা আপন-আপন প্রদেশগুলোকে সীল করে দেন। আর হাকাম ইবনে উমর আশ-শাতীকে মুকরানে ও আহনাফ ইবনে কায়েসকে খোরাসানে ইয়ায্‌দাজার্‌দকে ধাওয়া করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

আরব উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমি আপনার গভর্নর হাকাম ইবনে উমর আশ-শাতীর দূত।

আমীরুল মুমিনীন বললেন, মারহাবা, আশা করি, তুমি সুসংবাদ নিয়ে এসেছ।

আরব বললেন, জি হে আমীরুল মুমিনীন, আমি জয়ের সুসংবাদ আর গনীমতের মালামাল নিয়ে এসেছি।

আমি মহান আল্লাহর শোকর আদায় করছি। আমীরুল মুমিনীন বললেন এবং তৎক্ষণাৎ ওখানেই সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর নিয়ম ছিল, যুদ্ধজয়ের সুসংবাদ শুনে তিনি শোকরের সেজদা আদায় করতেন।

সেজদা থেকে মাথা উত্তোলনের পর দেখা গেল, তার কপাল ও নাকে ধুলা মেখে গেছে। তিনি আরবকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নামটা কী ভাই?

আবর উত্তর দিলেন, আমার নাম সাহ্হার আব্দি।

সাহ্হার আব্দি...। হযরত উমর (রা.) মাথাটা ঝুঁকিয়ে বললেন। কিন্তু পরক্ষণেই চোখ তুলে সাহ্হারের প্রতি তাকিয়ে বললেন, তুমি তো কবিও, না?

হযরত উমর (রা.) আরবের প্রতিটি গোত্রের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ ও তাদের বিদ্যা-যোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সাহ্হার (রা.) উত্তর দিলেন, জি, আমার কাব্যচর্চার সখ আছে।

আমীরুল মুমিনীন বললেন, গনীমতের মালামালের মধ্যে তুমি হাতিও এনেছ বুঝি?

সাহ্হার (রা.) বললেন, জি, কয়েকটি হাতিও আছে। মুকরানের রাজা রাসেল হাতি নিয়ে লড়তে এসেছিল।

আমীরুল মুমিনীন বললেন, যুদ্ধের কাহিনী জোহর নামাযের পরে বর্ণনা কোরো। এখন বিশ্রাম নাও আর গনীমতের মালগুলো মসজিদের বারান্দায় স্তূপ করে রাখো।

হযরত উমর (রা.) চলে গেলেন। সাহ্হার (রা.) গনীমতের মালগুলো মসজিদের বারান্দায় স্তূপ করে কয়েকটি কম্বল দ্বারা ঢেকে রাখলেন। নিজে মসজিদে প্রবেশ করলেন।

আমেরের কাফেলা মসজিদের একধারে অবস্থান গ্রহণ করল। একস্থানে তাঁবু স্থাপন করে তাতে মহিলা ও শিশুদেরকে থাকতে দেওয়া হলো। পুরুষরা মসজিদে চলে গেল। দর্শনার্থীরাও এক-এক করে চলে গেল। শুধু কয়েকটি শিশু ওখানে রয়ে গেল।

শিশুরা হাতিগুলো দেখছিল। সম্ভবত তারা এত বড় প্রাণী এর আগে

কখনও দেখেনি। ওরা হাতির মুখ খুঁজে পাচ্ছিল না। অনেক দেখে ও ভেবে-চিন্তে আবিষ্কার করল, ওই যে, লম্বা কী যেন একটা আছে, ওটার নিচে দাঁত দেখা যায়। ওখানেই ওদের মুখ। হাতিরা যখন শুঁড় দ্বারা ফোঁস করছে, তখন শিশুরা ভয়ে এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ছে।

হাতি একটি বেঢপ ও ভয়ংকর প্রাণী। সে-যুগে অমুসলিমরা যুদ্ধে মুসলমানদের মোকাবেলায় হাতি নিয়ে আসত, যাতে বিশাল, ভয়ংকর ও বেঢপ প্রাণীগুলো দেখে মুসলমানদের ঘোড়া ভয় পেয়ে যায়।

যেহেতু আরবি ঘোড়ার কখনও হাতির মুখোমুখি হতে হতো না, তাই দৈত্যের মতো প্রাণীগুলো দেখে ওরা ভয় পেয়ে যেত এবং মুসলিম বাহিনীর মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। তখন পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য মুসলমানরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পদাতিক হয়ে যেত এবং হাতিগুলোর নাভিতে বর্শা আর শুড়ে তরবারি দ্বারা আঘাত হানত।

অল্পক্ষণ পরে যোহরের আযান হলো। মদীনার অধিবাসীরা আযান শোনামাত্র এমনভাবে ছুটতে শুরু করল, যেন তাদেরকে কোনো মহা নেয়ামত বাটোয়ারার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এ ছিল তাদের পাঁচবেলার রীতি। প্রতিজন মুসলমান আযানের সুর কানে আসামাত্র মসজিদ অভিমুখে ছুটতে শুরু করত। অনেক সময় এমন হতো যে, কেউ ক্রেতার জন্য সওদা ওজন করছেন, এমন সময় আযান শুরু হয়ে গেছে, তো তিনি সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িপাল্লা রেখে দিতেন। পাল্লার সওদা পাল্লায়ই রয়ে যেত। না বিক্রেতা ক্রেতাকে দিতেন, না ক্রেতা গ্রহণ করতেন। বরং দুজনই সোজা মসজিদের দিকে ছুটে যেতেন। তাঁরা কখনও এমনটি ভাবতেন না যে, এরূপ করলে তো ক্রেতা হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাদের আল্লাহর উপর ভরসা ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, এই ক্রেতা না আসুক, আল্লাহ অন্য ক্রেতা পাঠিয়ে দেবেন। আর হতোও এমনই।

পক্ষান্তরে আমরাও মুসলমান। আযান শুনি; কিন্তু ভাব দেখাই কিছুই হয়নি। প্রথমত ৯৫ ভাগ মানুষ নামাযই পড়ি না। যে-পাঁচভাগ পড়ি, তাদের অধিকাংশের অবস্থা হলো, অলসতা ও অবহেলাহেতু সঠিক সময় পার করে যেনতেনভাবে পড়ি। যারা ব্যবসায়ী, তারা তো ক্রেতার অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে বসেই থাকি।

আসলে আমাদের আল্লাহর উপর ভরসা নেই। আমরা তাকদিরে বিশ্বাস করি না। নিজেদের বুদ্ধিমত্তা ও ব্যবস্থাপনাকেই সব কিছু মনে করি।

এ-এক বাস্তব সত্য যে, আমরা নামের মুসলমান। আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া ও অনুকম্পা যে, তিনি আমাদের মতো মুসলমান নামধারীদেরকে এজন্য খাওয়ান যে, আমরা মুসলমান হিসেবে পরিচিত। আমাদেরকে খাইয়ে-পরিয়ে আল্লাহ 'মুসলমান' নামের লাজ রক্ষা করছেন মাত্র। অন্যথায় আমরা আল্লাহ পাকের এক বিন্দু করুণারও উপযুক্ত নই।

যা হোক, কয়েক মিনিটের মধ্যেই মসজিদে-নববী কানায়-কানায় ভরে গেল। সবাই জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করলেন। নামায শেষ করে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) ঘোষণা দিলেন, সবাই বসুন। মহান আল্লাহ ইরানের মুকরান নগরী আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। সাহ্হার আব্দি মালে-গনীমত নিয়ে এসেছে। সে এখন যুদ্ধের কাহিনী শোনাবে।

সবাই আপন-আপন জায়গায় স্থিরভাবে বসে রইলেন। হযরত উমর (রা.) সাহ্হার (রা.)কে ইশারা করলে তিনি দাঁড়িয়ে বক্তব্য শুরু করলেন।

'সমবেত জনতা!

'আমি সর্বপ্রথম সেই মহান আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, যিনি একক, যার কোনো শরীক নেই। যিনি সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা। যিনি অতিশয় মহান ও মেহেরবান। যিনি একমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত। যিনি একমাত্র সিজদা পাওয়ার উপযুক্ত।

'তারপর আমি তাঁর প্রিয়পাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রশংসা করছি, যিনি পথহারা ও পথভোলা মানুষকে সোজাপথ দেখাতে এবং কুফর ও শিরকের নর্দমা থেকে উদ্ধার করে আল্লাহর গোলাম বানাতে দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছেন। আমি তার উপর দুরুদ পাঠ করছি হাজারবার।

'আমি আপনাদেরকে মুকরানের কাহিনী শোনাতে আদিষ্ট হয়েছি।

'আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারুক (রা.) হাকাম ইবনে উমর আশ-শাতীকে মুকরান অভিযানের সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে রওনা হলেন এবং মুকরান নগরীতে ঢুকে পড়লেন। রাসেল বিশ হাজার সৈন্যের বিশাল এক বাহিনী নিয়ে মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গে বৃহৎকায় নাদুস-নুদুস কতগুলো হাতিও নিয়ে এল। সেনাপতি হাকাম তাকে সন্ধির প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু তিনি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে বসলেন। হাতিগুলো বাহিনীর সম্মুখে ছিল। ওরা মুসলিম সেনাদেরকে পদপিষ্ঠ করতে শুরু করল।

'মুসলমানরা বাহন থেকে নেমে পদাতিক হয়ে গেল এবং সাহসিকতা ও বীরত্বের সঙ্গে হাতিবাহিনীর মোকাবেলা করল। তারা কয়েকটি হাতির শুঁড় কেটে দিল। তাতে হাতিগুলো সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে শুরু করল এবং নিজ বাহিনীর সৈন্যদের পিষ্ট করে-করে পেছনে সরে গেল।

'হাতি ইউনিটের এই পরাজয়ে মুশরিক বাহিনীতে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল। মুসলমানরা আত্মসংবরণের সুযোগ পেয়ে গেল। তারা পূর্ণ সাহসকিতা ও বীরত্বের সঙ্গে প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ চালাল যে, শত্রুবাহিনীর এক-একটি সারি নিঃশেষ করে সম্মুখে এগিয়ে গেল। তারা বিপুলসংখ্যক শত্রুসেনাকে হত্যা করে ফেলল।

'মুকরানিরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে শুরু করল। মুসলমানরা ধাওয়া করে বহুদূর পর্যন্ত তাদের হত্যা করল। অবশেষে শত্রুবাহিনী পালিয়ে গেল এবং মুকরান জয় হয়ে গেল। আমি সেই জয়ের সুসংবাদ আর মালে-গনীমত নিয়ে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি।'

সমবেত জনতা খুশি হয়ে উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে ওঠলেন। হযরত উমর (রাঃ) সাহ্হার (রা.)-এর বর্ণনাধারার প্রশংসা করে বললেন, 'তুমি সংক্ষেপে বড় চমৎকার ধারায় অনেক কাহিনী বর্ণনা করেছ। বক্তব্যের ধারা এমনই হওয়া উচিত।'

তারপর হযরত উমর (রা.) উঠে মালে-গনীমতের কাছে গেলেন। উপর থেকে কম্বল সরিয়ে সম্পদের পরিসংখ্যান নিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেসব মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন।

মালে-গনীমত বণ্টন শেষ করে তিনি বললেন, কিছু মুজাহিদ যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য সমবেত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই তাদের প্রেরণ করা হবে।

তারপর সবাই সেখান থেকে চলে গেলেন।

আট.

কিছু মুজাহিদ ইতিমধ্যে এসে হাজির হয়েছেন। তাদের ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন, শীঘ্রই তাদেরকে রণাঙ্গনে প্রেরণ করা হবে। তারাও রওনার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। তাদের হৃদয়সাগরে জিহাদের জয্বা ও যুদ্ধের স্পৃহা উথালপাথাল করছে। অতিশীঘ্র রণাঙ্গনে পৌঁছে গিয়ে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য তারা উদগ্রীব।

সাফওয়ানও তাদের একজন। জিহাদি চেতনার উত্তাল ঢেউ যেন বাঁধ মানছে

না কোনো। পাখি হয়ে উড়ে গিয়ে আহনাফ ইবনে কায়স-এর বাহিনীতে যোগ দিয়ে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখানোর জন্য মনটা আনচান করছে তার।

অনারব সম্রাট ইয়াযদাজারদ মারাদশাহজাহানে অবস্থান নিয়েছেন। তিনি সমগ্র খোরাসানে লোক পাঠিয়ে এবং দূত প্রেরণ করে সমগ্র প্রদেশকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলেছেন। তিনি শেষবারের মতো তাঁর পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে মুসলমানদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হতে চাচ্ছেন। মদীনায় এ-সংবাদও ছড়িয়ে পড়েছে যে, ইয়াযদাজারদ খাকান-এর নিকট সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন।

খাকান-এর বিশাল সাম্রাজ্য। তার শক্তি ইরানের চেয়ে খানিক বেশিই ছিল। চীন ও তুর্কিস্তানের সম্রাটদের উপাধি খাকান। তুর্কি সালতানাতের সীমান্ত ইরানের বিখ্যাত প্রদেশ খোরাসানের সঙ্গে লাগোয়া। ইরানিদের সঙ্গে মুসলমানদের লড়াই শেষ হতে-না-হতেই তাদের তুর্কিদের সঙ্গে মোকাবেলারও প্রস্তুতি নিতে হলো। সে-সময় তুর্কিস্তান ছিল অমুসলিম রাষ্ট্র।

মুসলমানরা যুদ্ধ এড়িয়ে চলার যতটা চেষ্টা করছে, অমুসলিমরা তাদেরকে ততটা যুদ্ধে জড়িয়ে রাখার চক্রান্ত করছে। সে-সময় তুর্কি সরকারের সঙ্গে না মুসলমানদের কোনো দ্বন্দ্ব-বিরোধ ছিল, না তুর্কিস্তানে সামরিক অভিযানের কোনো পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু ইয়াযদাজারদ খাকান-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করায় মুসলমানরা ধরে নিল, খাকান যদি ইয়াযদাজারদকে সাহায্য প্রদান করে, তা হলে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারুক (রা.) সে-দেশেও অভিযান প্রেরণের আদেশ দেবেন। বস্তুত তা-ই যদি ঘটে, তা হলে মুসলমানদের এর কোনো বিকল্প থাকবে না।

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) উপলব্ধি করেছেন যে, ইয়াযদাজারদ না নিজে স্বস্তিতে বসে থাকছে, না অন্যদেরকে শান্তিতে বসতে দিচ্ছে। কাজেই তাকে ভালোমতো একটা শিক্ষা না দিলেই নয়। লোকটি জগতের যে-ভূখণ্ডেই আত্মগোপন করুন, সেখান থেকে তাকে টেনে বের করে দিতে হবে। আর যে-সরকার তাকে আশ্রয় দেবে, তাকেও দেখে ছাড়তে হবে।

ইয়াযদাজারদ যখন মাদায়েন থেকে পলায়ন করেছিলেন, তখন থেকেই তিনি মুসলমানদেরকে ইরান থেকে তাড়ানোর অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি মুসলমানদের মোকাবেলায় বিশাল-বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেছেন। কিন্তু যদিও তিনি সব কটি অভিযানে পরাজিত হয়েছেন, তাতে

মুসলমানদের বহু কাঠ-খড় তো পোড়াতে হয়েছে। নিত্যদিনকার যুদ্ধে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলমানরা আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.)কে এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে বাধ্য হয়েছে যে, হায়, যদি আরব ও পারস্যের মাঝে আগুনের পাহাড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত!

যেহেতু হযরত উমর (রা.) দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন, তিনি ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর পতন ঘটিয়ে ছাড়বেন, তাই প্রতিজন মুসলমানও তাঁর এই প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নে উঠে-পড়ে মাঠে নেমেছে। সে-যুগে মুসলমানদের শক্তি কেন্দ্রীভূত ছিল না। তারা নানা দেশ ও নানা রাজ্যে ছড়িয়ে ছিল। সিরীয় রাজ্যসমূহ, মিসর, ইরাক ও ইরানে ইসলামি বাহিনী মোতায়েন ছিল। এর কোনো একটি রাজ্য থেকে বাহিনী প্রত্যাহারের সুযোগ ছিল না। অন্যথায় ষড়যন্ত্রকারীরা বিদ্রোহ করার আশঙ্কা ছিল।

আর খোদ আরবে এতসংখ্যক মুসলমান অবশিষ্ট নেই যে, বিপুলসংখ্যক লোক ফৌজে ভর্তি হয়ে ইরানের অভিযানে যোগ দিতে পারে। তবে অল্প যে-কজন আছে, তারাও ছুটে আসছে এবং রণাঙ্গনে প্রেরিত হচ্ছে। এই এখনও কিছু লোক অপেক্ষমাণ উপস্থিত আছে, যারা অতিশীঘ্র প্রেরিত হবে।

তাদের মাঝে একজন সাফওয়ান। একজন হলেন আমের। এরা দুজন বেজায় অস্থিরচিত্তে অপেক্ষা করছেন, কখন তাদের রণাঙ্গন অভিমুখে রওনা হওয়ার আদেশ দেওয়া হবে।

আজ মালে-গনীমত বণ্টনের পরের দিন। সাফওয়ান ও আফীরা তাঁবুতে বসে আছে। আফীরা বলল, আচ্ছা, এই প্রাণীগুলো তো খুবই বিস্ময়কর!

সাফওয়ান বলল, যেমন বিস্ময়কর, তেমনি ভয়ংকর। কাছে থেকে দেখলে তুমি ভয়ে মরে যাবে।

ভয় পাব আমি? আফীরা উচ্ছলতার সঙ্গে বলল।

না-না, আমি ভয় পাব।

ভয় পাবে না, খুব সম্ভব তুমি ভয় পেয়েও গেছ। আর সেজন্যই অন্যদের সম্পর্কেও একই ধারণা করছ।

আসলে আমার ওদেরকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তুমি দেখলে অবশ্যই ভয় পেয়ে যাবে।

আমি ওদের দেখেছি।

দূর থেকে দেখেছ। কাছে থেকে দেখলে ভয়ে চিৎকার জুড়ে দেবে।

চলো, কাছে থেকে দেখি।

আমার সঙ্গে গেলে তোমার মনে এই ভরসা থাকবে যে, যদি জন্তুগুলো তোমাকে কিছু বলে, তা হলে আমি ব্যবস্থা নেব। সাহস দেখাতে হলে তুমি একা যাও।

এই তো না দেখতেই ভয় পেয়ে গেছ। চলো, চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি থাকতে কোনো প্রাণী তোমার প্রতি চোখ তুলে তাকাতে সাহস পাবে না।

সাফওয়ান অলক্ষ্যে হেসে ওঠল। পরে হাসি থামিয়ে বলল, খুব বাহাদুর মনে হচ্ছে!

আমার বীরত্বের পতাকা তো উত্তোলিত হয়েই আছে।

সাফওয়ান আবারও শব্দ করে হেসে ওঠল। বলল, ওহ হো, ওই যে পতাকাটা দেখা যাচ্ছে, সেটি তোমার বীরত্বের নিশানা, না?

বিশ্বাস রাখো, সুযোগ হাতে আসতে দাও, সময় আসতে দাও; তখন দেখাব।

ঠিক আছে, দেখিয়ো।

আচ্ছা, এই জন্তুগুলো আসলে কী?

এগুলো হাতি। সূরা ফীলে এদের আলোচনা এসেছে। মুখস্থ আছে সূরাটি?

কেন থাকবে না। প্রায় নামাযেই তো পড়ি। আলাম তারা...।

তা হলে বোঝো, সূরা ফীলে যে-হাতিদের আলোচনা এসেছে, এরা ওদের সমগোত্রের। ওরাও হাতি ছিল, এরাও হাতি।

তোমার কি হাতিবাহিনীর ঘটনাটা জানা আছে?

আছে বই কি।

শোনাও দেখি।

সাফওয়ান পবিত্র কুরআনে আলোচিত হাতিবাহিনীর কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করল

'জাহেলি যুগেও আরবদের অন্তরে পবিত্র কাবাঘরের এত ভক্তি ছিল যে, তারা যথারীতি এই ঘরে হজ করত। কিন্তু কতিপয় লোক আরবের বিভিন্ন প্রদেশে কয়েকটি গৃহ নির্মাণ করে চেষ্টা চালাল, আরবের সবগুলো গোত্র যেন সেসব গৃহে ঠিক যেভাবে হজ করে, যেভাবে কাবাগৃহে করে থাকে। কিন্তু আরবের মানুষ বিষয়টি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাল।

'যে-সময় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পিতা জনাব আবদুল্লাহ আরবের সম্ভ্রান্ত যুহ্রা গোত্রের মেয়ে আমেনা বিনতে ওহ্বকে বিবাহ করলেন, সে-সময় ইয়েমেনে হাবশা রাজার দখল প্রতিষ্ঠিত হলো এবং আবরাহা আল-

আশ্রাম হাবশা রাজার পক্ষ থেকে ইয়েমেনের গভর্নর নিযুক্ত হলেন। তিনি যখন কাবাগৃহের প্রতি আরবের অপার ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রত্যক্ষ করলেন, তখন নতুন একটি উপাসনালয় নির্মাণ করে আরবের লোকদেরকে তাতে হজ করতে উৎসাহ প্রদান করলেন। কিন্তু আরবের মানুষ তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করল। এমনকি এর প্রতিবাদে এক আরব তাতে পায়খানা করে দিল।

'বিষয়টি আবরাহার আত্মমর্যাদায় আঘাত হানল। তিনি ধরে নিলেন, কাবাঘরটিকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত তার এই পরিকল্পনা বাস্তবতার মুখ দেখবে না। আর যদি তা করা যায়, তাহলে আরবের মানুষ তার উপাসনালয়ে হজ করতে বাধ্য হবে।

'আবরাহা কাবাঘর ধ্বংসের প্রস্তুতি নিয়ে রওনা হলো। সঙ্গে বিশাল এক সৈন্যবাহিনী। বাহিনীতে আছে বিপুলসংখ্যক হাতি। সঙ্গে হাতি ছিল বলে এই বাহিনীর নাম পড়ে গেল হাতিবাহিনী। আজও ইতিহাসে সেই বাহিনী হাতিবাহিনী নামে বিখ্যাত।

'হাতিবাহিনী অত্যন্ত জাঁকজমক ও শান-শওকতের সঙ্গে আরবের উপর আক্রমণ চালাল। কোনো-কোনো গোত্র তাদের মোকবেলা করে পরাজিত হলো। মক্কাবাসীরা তাদের আক্রমণ ও আগমনের সংবাদ শুনে খুবই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠল।

'সে-সময় নবীজি (সা.)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব মক্কার শাসনকর্তা ছিলেন। আবরাহার সৈন্যরা তার দুশো উট ধরে নিয়ে গেল। আবদুল মুত্তালিব আবরাহার নিকট গেলেন। তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। আবরাহা তাকে খুব সম্মান দেখালেন এবং তার আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলেন। আবদুল মুত্তালিব বললেন, আপনার সৈন্যরা আমার দুশো উট ধরে এনেছে। আমি উটগুলো নিতে এসেছি। ওগুলো আমাকে দিয়ে দিন।

'আবরাহা মনে করেছিলেন, মক্কার শাসনকর্তা আবদুল মুত্তালিব তার সঙ্গে সন্ধিবিষয়ে আলাপ করতে এসেছেন। কিন্তু যখন তিনি উটের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন, তখন অত্যন্ত তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "আমি বড় ভুল বুঝেছি। তোমাকে দেখে মনে করেছিলাম, তুমি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ শাসক; আমার সঙ্গে কাবাগৃহ সম্পর্কে আলোচনা করতে এসেছ। কিন্তু এখন বুঝলাম, তোমার বুদ্ধি-সুদ্ধি কিচ্ছু নেই।"

'আবদুল মুত্তালিব বললেন, "আমি উটগুলোর মালিক। তাই সেগুলো

ফিরিয়ে নিতে এসেছি। কাবাঘরেরও একজন মালিক আছেন। তাঁর ঘর তিনি নিজেই রক্ষা করবেন।”

'আবরাহা যারপরনাই ক্ষিপ্ত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করে বসলেন। আবদুল মুত্তালিব দৌড়ে মক্কা ফিরে এসে সকল কুরাইশ সদস্যকে পাহাড়ে পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে কাবাঘরকে ঝাপটে ধরে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, “ওহে কাবার প্রভু, বিশাল এক শত্রুবাহিনী তোমার গৃহটিকে ধ্বংস করতে এসেছে। আমাদের মাঝে তাদের মোকাবেলা করার শক্তি নেই। তোমার ঘরটিকে তুমিই রক্ষা করো।”

'আবরাহা যখন কাবাঘরে হামলা চালাল, তখন ভারত সাগরের দিক থেকে একঝাঁক পাখি এসে আকাশ ছেয়ে গেল। ওরা ছোট-ছোট পাথরখণ্ডের এমন প্রচণ্ড বৃষ্টি বর্ষণ করল যে, আবরাহার গোটা বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের হাতিগুলোও প্রাণ হারাল। পবিত্র কুরআনের সূরা ফীলে আল্লাহ্ পাক এ-ঘটনাটিই উল্লেখ করেছেন। বুঝেছ এবার ঘটনাটা?'

আফীরা বলল, খুব ভালোভাবে বুঝেছি।

ইতিমধ্যে আযান হয়ে গেছে। সাফওয়ান নামায পড়তে মসজিদের দিকে রওনা হয়ে গেল আর আফীরাও নামাযের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।

নয়.

মুসলমানগণ অপেক্ষার প্রহর গুণছেন কখন রণাঙ্গনের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার অনুমতি মিলবে। ইতিমধ্যে তথ্য পাওয়া গেছে, তায়েফ থেকে আরও কিছু লোক যুদ্ধে যেতে আসছে। তাদের এসে পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

একদিন তারাও এসে পড়ল। সংখ্যায় তারা পঞ্চাশজন। দুশো আগে থেকেই উপস্থিত আছে। এখন মোট আড়াইশো হলো।

একদিন আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) আসর নামাযের পর বললেন, এ-সময়ে যে-কজন মুজাহিদ সমবেত আছ; আগামী কাল তারা রওনা হবে। ঘোষণা শুনে তাদের বুক খুশিতে ভরে গেল। তারা আনন্দে বাগবাগ হয়ে গেল এবং একে-অপরকে মোবারকবাদ দিতে লাগল।

সে-রাতটি তারা আনন্দের মধ্যদিয়ে অতিবাহিত করল। ভোরে সকাল-সকাল জাগ্রত হয়ে ফজর নামায আদায় করেই রওনার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

সাফওয়ানও বাঁধাছাদার কাজ সারছিল। আফীরা তাকে সাহায্য করছিল। সাফওয়ান বলল, আফীরা, তুমি তোমার গোত্রের কাছে ফিরে যাও।

আফীরা হঠাৎ চকিত হয়ে মনকাড়া দৃষ্টিতে সাফওয়ানের প্রতি তাকিয়ে বলল, কেন?

সাফওয়ান বলল, কারণ, আমরা এখন এমন এক দেশে যাচ্ছি, যে-দেশ সম্পর্কে আমীরুল মুমিনীন একাধিকবার বলেছেন, যদি আরব ও পারস্যের মাঝে আগুনের পাহাড় প্রতিবন্ধক হতো, যাতে না আমরা ওদিকে যেতে পারতাম, না তারা এদিকে আসতে পারত!

একথা বলে কী বোঝাতে চাচ্ছ তুমি?

আমি বোঝাতে চাচ্ছি, বিদেশ-বিভূঁইয়ের ব্যাপার। ওখানকার মানুষগুলো আমাদের জন্য বিদেশি। সামনে কী সব ঘটনা ঘটে, তা আল্লাহই ভালো জানেন। আমি মনে করি, ওই দেশে যাওয়া তোমার পক্ষে ঠিক হবে না।

পরিষ্কার করে কেন বলছ না, তুমি ভয় পাচ্ছ?

ভয়েরই ব্যাপার। আমি তোমাকে রক্ষা করব, নাকি যুদ্ধ করব?

কিন্তু তোমাকে কে বলেছে, আমাকে পাহারা দিতে হবে?

এ-কথাটা নিশ্চয়ই বোঝ যে, তুমি বল আর না বল, তোমার রক্ষণাবেক্ষণ আমাকে করতে হবেই।

তুমি বোধহয় জান না, নাহ্‌ম গোত্রের মেয়েরা যুদ্ধের মাঠে সিংহী হয়ে যায়।

তা হতে পারে। তবে সেই মেয়েরা তোমার মতো দুহিতা হয় না।

তুমি না আয্‌রি? তুমিই বরং নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে চিরাচরিত সেই রোগটিতে আক্রান্ত হয়ে যাও, যে-রোগে তোমার গোত্রের যুবকরা আক্রান্ত হয়ে থাকে। যুদ্ধের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?

অথচ আমি জন্মেছিই জিহাদের জন্য। আমার হৃদয়ে জিহাদের যে তামান্না বিরাজ করছে, তা আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।

তা হলে অন্তর থেকে ভয়-ভীতি ঝেড়ে ফেলো। রণাঙ্গনে পৌঁছে ঘোরতর যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো আর শত্রুকে টুকরো টুকরো করে ফেলো।

আফীরার হৃদয়ে উত্তেজনা জেগে গেছে। তার চেহারাটা তাজা গোলাপের পাঁপড়ির রূপ ধারণ করেছে। কাজলকালো চোখ দুটো চিকচিক করে ওঠেছে।

সাফওয়ান বলল, শুনেছি, জাহেলি যুগে কোনো-কোনো কবিলা দেব-

দেবীদের পূজা করত। তাদের প্রতিমাগুলোকে খুবই সুন্দর করে তৈরি করা হতো। সেই সুদর্শন প্রতিমাগুলো যদি জীবন লাভ করত আর তোমাকে দেখত, তা হলে ওরা অবলীলায় তোমার সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে ফেলত।

আফীরা বলল, এ তুমি কী সব কথাবার্তা শুরু করেছ? তুমি ভুলে যেয়ো না, এটি ইসলামের নতুন যুগ। পুরনো বিষয়-আশয় এখন স্বপ্ন ও কল্পনা হয়ে গেছে। এই বছরকয়েক আগের কথাই তো, তখন সমস্ত আরব মূর্তিপূজারি ছিল। আর এখন তারা আল্লাহর গোলাম।

'কী সব উপদেশ চলছে?' আমের এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন।

হঠাৎ দুজনই থেমে গেল এবং অপ্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু খানিক পর আফীরা সাহস সঞ্চয় করে বলল, সাফওয়ান বলছে, এককালে আরবের মানুষ দেব-দেবীদের পূজা করত। জানি না, ওদের বুদ্ধি-বিবেক কোথায় চলে গিয়েছিল।

আমের বললেন, এই আমাদেরকেই দেখো না। আমরা সবাই মূর্তিপূজারি ছিলাম। অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আপন-আপন গোত্রের প্রতিমাদের পূজা করতাম। প্রত্যেক গোত্রের প্রতিমা আলাদা-আলাদা ছিল। অথচ সব গোত্রই মনে করত, তাদের প্রতিমার আকার-গঠন খোদার আকার-গঠনের অনুরূপ। কীরূপ অজ্ঞ ছিলাম আমরা। আমরা বিস্ময়কর-বিস্ময়কর আকৃতির প্রতিমাকে খোদা মনে করতাম। শয়তান আমাদের চোখের উপর আবরণ ফেলে দিয়েছিল। অবশেষে মহান আল্লাহ আমাদেরকে দয়া করলেন। তিনি তাঁর এক বান্দাকে রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করলেন। রাসূল আমাদের ভাবনার দুয়ারে করাঘাত করলেন। আমাদেরকে আলস্যের ঘুম থেকে জাগ্রত করলেন। বললেন, মূর্তিরা খোদা নয়। আমরা হঠাৎ চমকে উঠলাম বটে; কিন্তু যে দেব-দেবীদেরকে আমরা ও আমাদের বাপ-দাদা-পিতৃপুরুষ পূজা করতেন, সেগুলোকে পরিত্যাগ করতে আমরা প্রস্তুত হলাম না। বরং তাদের ব্যাপারে অপমানজনক কথাবার্তা আমাদের কাছে অপ্রীতিকর ঠেকল। আমরা আল্লাহর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলাম, তাঁকে নানা রকম কষ্ট ও জ্বালাতন দিলাম। সমগ্র জাতি তার বিরোধী হয়ে ওঠল। কিন্তু আল্লাহ তাঁর পেছনে ছিলেন। কিন্তু অবশেষে সত্যের জয় হলো, মিথ্যা বিদূরিত হয়ে গেল। আমরা মূর্তিপূজা ত্যাগ করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিলাম। মূর্তিপূজার দিন শেষ হয়ে গেল। মহান আল্লাহর রাজত্বের যুগ শুরু হলো। আজ আরবে কোনো নিভৃত এক

কোণেও মূর্তিপূজা হয় না। কোথাও আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপাসনা চলে না। আরব ভূমি থেকে শয়তানের প্রভাব দূর হয়ে গেছে। শয়তান এ-ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে যে, এই ভূখণ্ডের কোনো মুসলমান তার প্রতারণার ফাঁদে পা দেবে না। 'লা-হাওলা'র মন্ত্র সব সময় তার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

আমেরের হৃদয়ে ঈমানের জোশ উথলে ওঠেছে। তিনি হৃদয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে দিলেন। সাফওয়ান বলল, বাস্তবিকই শয়তান আমাদের চোখের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছিল। আমরা নিজেদের হাতেগড়া মাটি ও পাথরের প্রতিমাদের পূজা করতাম। এখন জাহেলি যুগের সে-বিষয়গুলো যখন মনে পড়ে, তখন লজ্জা ও আত্মমর্যাদায় মাথাটা নুয়ে যায়।

আমের বললেন, কথা তো তা-ই। আচ্ছা, এখনও অনেক মালপত্র বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে। আমীরুল মুমিনীন আসবেন। তাড়াতাড়ি গোছগাছ ও বাঁধাছাদার কাজ শেষ করে তাঁর আগমনের আগে-আগে প্রস্তুত হয়ে যাও।

সাফওয়ান বলল, এই আফীরাটা না নিজে কিছু করছে, না আমাকে করতে দিচ্ছে।

আমের বললেন, ও কী-ইবা করতে পারবে। ও কোনো কাজের লোক নয়। তুমি নিজেই করে ফেলো।

সাফওয়ান আফীরার প্রতি এমন চোখে তাকাল, যেন ও বলছে, দেখো, তোমার বাবা আমার পক্ষে সায় দিয়েছেন।

আফীরা বলল, হ্যাঁ, পুরুষদের বাহুতে শক্তি বেশি তো, তাই তাদের অহমিকাও বেশি।

আমের বললেন, এই তো মেয়েটা বেঁকে গেল। আচ্ছা, তুমি যতটুকু পার, আমাদেরকে সহযোগিতা করো।

তিনজন ঝটপট বাঁধাছাদার কাজ শেষ করে ফেলল। মালপত্রগুলো উটের পিঠে বোঝাই করল। ইরানের রণাঙ্গনগামী যোদ্ধারা সবাই প্রস্তুত হয়ে গেল।

মহিলা ও শিশুদেরকে ছইওয়ালা বাহনে বসিয়ে দেওয়া হলো। কতিপয় নারী ও কিশোরী ঘোড়ায় আরোহণ করল। আফীরাও একটি ঘোড়ায় চড়ে বসল। সে তার সর্বাঙ্গ চাদর দ্বারা এমনভাবে ঢেকে নিল যে, চোখের তারা আর হাতের তালু দুটো ছাড়া আর কোনো অঙ্গই দেখা যাচ্ছে না।

যেসব মুজাহিদের কাছে ঘোড়া আছে, তাঁরা ঘোড়ায় যিন বেঁধে নিলেন। তাঁরা আপন-আপন ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। যাঁদের

কাছে ঘোড়া নেই, উট আছে, তাঁরা উটের পিঠে পালান স্থাপন করে লাগাম হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

সকলে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.)-এর আগমনের অপেক্ষা করছেন। নিয়ম ছিল, যেসব মুসলমান যুদ্ধের জন্য কোনো অভিযানে রওনা হতো, আমীরুল মুমিনীন তাদের কিছু উপদেশ দিয়ে বিদায় দিতেন।

অবশেষে হযরত উমর ফারুক (রা.) এলেন। সকলে তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য নীরব হয়ে গেলেন।

হযরত উমর (রা.) নিকটে এসে তাঁদের সালাম করলেন এবং বললেন

'মুজাহিদগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মোতাবেক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে জিহাদে যাচ্ছ। তোমরা তোমাদের প্রতিটি কদমে ছাওয়াব পাবে।

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা যে-ঘোড়াগুলোকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করেছ, সেগুলোর বিনিময়ে বিপুল ছওয়াব পাবে। তোমাদের জন্য জান্নাত বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আল্লাহ তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত করে রেখেছেন।

'কিন্তু তোমরা একটি বিষয় ভুলে যেয়ো না যে, মুসলমানের আলামত হচ্ছে নামায। হাশরে সর্বাগ্রে নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। আল্লাহ ও বান্দার মাঝে নামায একটি বন্ধন। এই সম্পর্ক ছিন্ন না হয় যেন। কোনো ওয়াক্তের নামায যেন কাজা না হয়। পরস্পর হৃদ্যতা ও সম্প্রীতি বজায় রেখো। আল্লাহকে সব সময় ভয় করে চলো। আমি যদিও তোমাদের সঙ্গে থাকব না, তবু আমার দু'আ তোমাদের সঙ্গী হবে। আবেগের আতিশয্যে পাগল হয়ে যেয়ো না। ফসলের খেত-খামারকে ধ্বংস করো না। বৃদ্ধ, পঙ্গু, রুগ্ন, ধর্মনেতা, নারী ও শিশুদের উপর তরবারি উত্তোলন করো না। তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়ার আমার যে-দায়িত্ব ছিল, আমি তা আদায় করেছি। আল্লাহ তোমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। এবার আল্লাহর নাম নিয়ে রওনা হও।'

মুসলমানগণ আকাশ ফাটিয়ে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুললেন। একেবারে সামনের উটটি এগুতে শুরু করল। তার পেছনে-পেছনে অন্যান্য উট-ঘোড়াগুলোও চলতে শুরু করল। এই ক্ষুদ্র কাফেলাটি চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত হযরত উমর (রা.) ও তাঁর সঙ্গীরা তাকিয়ে থাকলেন। কাফেলা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে তাঁরা ফিরে এলেন।

দশ.

আমের তাঁর সেনা ইউনিট নিয়ে পথ চলছেন। তিনি মদীনা অতিক্রম করে কুফা গিয়ে উপনীত হলেন।

কুফা ফোরাত নদী থেকে দেড়-দু-মাইল ব্যবধানে অবস্থিত একটি নগরী। ১৭ হিজরিতে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.)-এর আদেশে এই নগরীর গোড়াপত্তন হয়। এর সর্বত্র ফুলের বাগান আর রকমারি আরবি ফুলের মৌ-মৌ গন্ধ।

কুফায় উপনীত হয়ে আমের ও তাঁর বাহিনী অত্যন্ত প্রীত ও আনন্দিত হলেন। বিশেষ করে আফীরা সীমাহীন উৎফুল্ল হলো। ফুল আর ফুলের বাগান দেখে তার মনটা আনন্দে ভরে ওঠল। নেচে উঠল তার সৌখিন হৃদয়। আর ফোরাত নদীর দর্শনে আনন্দ তার সীমা ছাড়িয়ে গেল। আফীরা সাফওয়ানকে বলল, এত মনোরম আর মনমাতানো পরিবেশ! যদি কটা দিন যাত্রাবিরতি দিয়ে এখানকার শোভা–সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারতাম!

সাফওয়ান বলল, মেয়ে মানুষের এসবই প্রিয়। ফুল, ফুলের বাগান, সবুজের সমারোহ, কুলকুল রবে বয়ে-যাওয়া-নদী আর টলটলে স্বচ্ছ পানি। আচ্ছা, নদীর কূলের সবুজ ঘাসের উপর বসে পা দুটো স্বচ্ছ পানিতে ছড়িয়ে দিতে তোমার কেমন লাগে আফীরা!

খুব ভালো লাগে। কেন, তোমার কি প্রকৃতির চিত্তহারী দৃশ্যাবলি ভালো লাগে না?

লাগে বই কি। কিন্তু আমি কখনও ভুলতে পারি না যে, আমি একজন মুজাহিদ এবং আমি জিহাদ করতে এসেছি।

আফীরা অলক্ষ্যে হেসে ওঠল। ও যখন হাসে, তখন তার সুন্দর ঠোঁট দুটো খুলে মুক্তার মতো সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে আসে এবং বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করে। তখন তার চোখ দুটোও হাসতে শুরু করে। যার ফলে তার রূপ আরও বেড়ে যায় এবং তার গোলাপি মুখমণ্ডলে রূপের বাহার বইতে শুরু করে।

আফীরা দুষ্টু স্বরে বলল, ওহ হো, আমার মনেই ছিল না তুমি একজন মুজাহিদ আর হুরদের সন্ধানে যুদ্ধের ময়দানে ছুটে বেড়াচ্ছ।

হুরদের খোঁজে নয়– মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে।

আচ্ছা, তুমি কি তোমার হৃদয় হাতড়িয়ে দেখেছ, তার কোনো এক কোণে জান্নাতের তামান্না আর হুরের আকাঙ্খা আছে কিনা?

যদি জিহাদের ময়দানে শাহাদাত নসিব হয়ে যায় আর দয়াময় তার বিনিময়ে জান্নাত দান করেন, তবে তা হবে তাঁর বিরাট অনুগ্রহ।

হ্যাঁ, একটি বিষয় তো স্বীকার করে নিয়েছ। তোমার অন্তরে জান্নাতের আকাঙ্খা আছে। এখন হুরদের বিষয়টি মেনে নিলেই মামলা শেষ হয়ে যায়।

তুমি কি চাও, আমি আমার মনের গোপন কথাটা ব্যক্ত করে দিই?

আমি তো সে-কথাই বলছি যে, মন হাতড়িয়ে আসল ও বাস্তব কথাটা সাফ-সাফ বলে দাও।

তাতে তুমি রাগ করবে না তো?

আমি রাগ করব কেন?

তাহলে শোনো আফীরা, আমি হুর দেখিনি। তবে তাদের বিবরণ শুনেছি। পবিত্র কুরআনে তাদের রূপের কথা পড়েছি। কিন্তু...।

সাফওয়ান নীরব হয়ে গেল। বাক্যটা সম্পন্ন করতে পারল না। আফীরা জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু' কী?

না, সামনে এগোনো যাবে না। ভয় আছে। তুমি ক্ষেপে যাবে।

আজব মুজাহিদ তুমি। একটি আরবকন্যাকে এত ভয় করছ যে, কথা বলার সাহসটুকুও তোমার নেই।

হাওয়ার কন্যাদেরকে ভয় করা-ই উচিত।

একদম ভয় করো না। নিশ্চিন্তে বলে ফেলো।

আচ্ছা শোনো, আমি তোমাকেই হুর মনে করি।

ধ্যাৎ। বলেই আফীরা মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল।

ব্যস, এই তো বেঁকে গেলে।

তুমি আয্‌রি। আল্লাহ তোমাকে করুণা করুন।

আমি আয্‌রি সে সবাই জানে। কিন্তু...।

আফীরা কথা কেটে বলল, কোনো কিন্তু নেই। বাহিনী আজ যাত্রাবিরতি দিয়েছে। চলো, ফোরাত নদীটা ভ্রমণ করে আসি।

আমার কোনো সমস্যা নেই। তুমি তোমার পিতার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নাও আর ওয়াদা দাও, কোনো দুষ্টুমি করবে না।

তার মানে প্রকারান্তরে আমাকে সায় দিচ্ছ, যেন আমি দুষ্টুমি করি। আমি তো দুষ্টুমি ভুলেই গিয়েছিলাম। তুমি এখন স্মরণ করিয়ে দিলে।

দুষ্টুমি না করার প্রতিশ্রুতি নেওয়া দুষ্টুমি করায় সায় দেওয়া বুঝি?

ওই দেখো, আব্বু আসছেন।

সম্মুখ দিক থেকে আমের আসছিলেন। তিনি নিকটে এলে সাফওয়ান তাকে জিজ্ঞেস করলেন, চাচাজান, এখান থেকে কবে রওনা হওয়ার ইচ্ছা রাখেন?

আমের সাফওয়ানকে দেখে মুচকি হেসে উত্তর দিলেন, কেন, কুফার ভ্রমণে মন ভরে গেছে নাকি?

সাফওয়ান বলল, না, মানে আমাদের তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রণাঙ্গনে পৌঁছে যাওয়া দরকার। ওখানকার পরিস্থিতি তো দিন-দিনই খারাপ হচ্ছে শুনেছি।

আমের বললেন, হ্যাঁ, সেজন্যই এখানে বেশি সময় থাকব না। কাল তো নয়, পরশু ইনশাআল্লাহ রওনা হয়ে যাব।

আজই রওনা দিলে এর জন্য ভালো হতো। আফীরা বলল এবং হেসে ওঠল।

আমের বললেন, এ তো ঠিকই বলছে। আমরা তো এখানে বেড়াতে আসিনি। মুজাহিদের মন সব সময় রণাঙ্গনের সঙ্গেই ঝুলে থাকে। মুজাহিদ জিহাদ ছাড়া অন্য কিছুতে শান্তি পায় না।

সাফওয়ান বলল, কিন্তু আফীরার তো এখানকার বিত্তহারী ফুলবাগান আর ফোরাত নদীর মনকাড়া দৃশ্যাবলিই বেশি প্রিয়।

আফীরা বলল, হ্যাঁ, এসব আমার খুবই প্রিয়। একটুখানি নদীটা দেখে আসতে বললাম আর অমনি বিগড়ে গেলে। ঠিক আছে, তুমি না যাও, আব্বু নিয়ে যাবেন।

আমের হেসে বললেন, এই কথা।

আফীরা খানিক অহমিকার সুরে ঠোঁট দুটোতে চাপ দিয়ে বলল, এ নিজেকে মুজাহিদ মনে করে, মুজাহিদ।

আমের বললেন, মনে করার কী আছে, সাফওয়ান তো মুজাহিদই।

আফীরা বলল, হয়তবা।

আমের বললেন, এই তো ক্ষেপে গেলে বেটী। মনে হচ্ছে, দুজনে এতক্ষণ বিবাদ করেছ। আচ্ছা, এখন মিটমাট করে ফেলো আর তোমরা দুজনই যাও।

সাফওয়ান বলল, আমি মুজাহিদ। আর এ-জাতীয় আলাপচারিতা মুজাহিদদের ভালো লাগে না।

আফীরা বলল, আর আমি তো ওকে মুজাহিদই মনে করি না।

আমের অলক্ষ্যে হেসে ওঠেন। সাফওয়ানকে উদ্দেশ করে বললেন, এবার প্রমাণ দাও, তুমি মুজাহিদ।

সাফওয়ান বলল, এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে যে, আমি জিহাদে যাচ্ছি?

আমের বললেন, ঠিক আছে সাফওয়ান, তুমি আফীরাকে বিরক্ত করো না; ওকে নিয়েই চলে যাও।

আফীরা বলল, কিন্তু ইনি তো ভয় পান।

সাফওয়ান বলল, ভয় পাব কেন আমি?

আফীরা বলল, ভয়-ই যদি না পাও, তাহলে আগডুম-বাগডুম বলছ কেন?

আমের বললেন, ব্যস, মিট হয়ে গেছে। আফীরা, তুমি ওর সঙ্গে চলে যাও।

সাফওয়ানের আর কিছু বলবার নেই। চুপচাপ উঠে আফীরাকে সঙ্গে নিয়ে ফোরাত নদীর তীরে চলে গেল।

অত্যন্ত খরস্রোতা নদী। দুই পাড়ে সবুজঘেরা ঝোঁপজঙ্গল। কোথাও-কোথাও উঁচু-উঁচু টিলা। আয়নার মতো স্বচ্ছ পানি তরতর করে বয়ে চলছে। মাঝে-মধ্যে বাতাসের ঝাপটায় ঢেউ উঠে প্রশান্ত নদীকে অশান্ত করে তুলছে।

আফীরা একটি উপযুক্ত জায়গা খুঁজে নিয়ে পা দুটো পানিতে ঝুলিয়ে দিয়ে কূলে বসে পড়ল। সাফওয়ান বলল, দেব একটা ঠেলা?

আফীরা হৃদয়কাড়া চোখে সাফওয়ানের প্রতি তাকিয়ে বলল, আমার ভদ্রতার সুযোগে তুমি ধীরে-ধীরে দুষ্টু হয়ে যাচ্ছ!

সাফওয়ান হেসে বলল, দুষ্টু আর ভদ্র এ কী কথা বললে তুমি?

সাফওয়ান আফীরার দু-পা দূরে উকো হয়ে বসা ছিল। আফীরা পা দুটো পানি থেকে তুলে এনে দূরপানে ইশারা করে বলল, দেখো তো কী ওটা সাঁতার কেটে আসছে?

সাফওয়ান চকিতে ওদিকে তাকাল এবং জিনিসটা চিনবার জন্য গভীর চোখে তাকিয়ে থাকল। আফীরা অতি সন্তর্পণে ওঠে দাঁড়াল এবং বিড়ালের মতো পা টিপে-টিপে সাফওয়ানের কাছে চলে গেল। সাফওয়ান টের পাওয়ার আগেই আফীরা দুই হাতে সজোরে একটা ধাক্কা মেরে সাফওয়ানকে পানিতে ফেলে দিল। সাফওয়ান পানিতে পড়ে ডুবে গিয়ে ভেসে ওঠল।

আফীরা হাসতে-হাসতে লুটিয়ে পড়ার উপক্রম হলো। কিছুক্ষণ পর অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, কী খবর মুজাহিদ সাহেব, ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছ বুঝি?

ভাগ্য ভালো যে, সাফওয়ান যে-স্থানটিতে পড়েছে, সেখানে পানি গভীর ছিল না। অন্যথায় নদী থেকে উঠে আসতে তাকে অনেক কষ্ট-সাধনা করতে হতো।

সাফওয়ান গোটাকতক ডুব দিয়ে কূলে উঠে এল এবং দুষ্টুমতি আফীরার দিকে তেড়ে গেল।

আফীরা আগেই বুঝে ফেলেছে, সাফওয়ান এর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে। তাই আগে-ভাগেই পালিয়ে ঘোড়ার কাছে চলে গেল এবং ঝটপট ঘোড়ায় চড়ে উধাও হয়ে গেল।

সাফওয়ানের পরিধানের সমুদয় পোশাক ভিজে গেছে। তাই ওখানে কিছু সময় বিলম্ব করে পোশাক শুকিয়ে তারপর ছাউনিতে ফিরল। আফীরা তাকে দেখে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

তিন দিন পর আমের রওনা হলেন। খোরাসান অঞ্চলে প্রবেশ করে জানতে পারলেন, আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) তাইবানের দিকে এগিয়ে গেছেন। আমের প্রথমে কাশান পৌঁছুলেন। এখানে এসে জানতে পারলেন, ইরানিদের একটি সেনা-ইউনিট কাছেই একস্থানে অবস্থান করছে।

কিন্তু তিনি জানতে পারেননি, উক্ত ইউনিটে কতজন সৈন্য আছে। তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা জিহাদের জন্য উদগ্রীব। তাই নারী ও শিশুদেরকে কাশান রেখে এবং পঁচিশজন মুজাহিদকে তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত করে তাঁরা ইরানিদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন।

কিন্তু যে-স্থানে সৈন্যদের উপস্থিতির সংবাদ পেয়েছিলেন, সেখানে গিয়ে কিছুই পেলেন না। জানতে পারলেন, তথ্যটি ভুল ছিল। ইরানিদের কোনো একটি কাফেলা মুসলমানদের ভয়ে পালিয়ে মারাদ যাচ্ছিল, যেটি দিনকতক আগে উক্ত অঞ্চল থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিল।

আমের ওখান থেকে ফিরে এসে আরও একদিন কাশান অবস্থান করে পরদিন সকালে ফজর নামায আদায় করেই তাইবানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন।

এগারো.

কাশান ত্যাগ করে আমের সবে এক মাইল পথ অতিক্রম করেছেন। হঠাৎ তিনি অত্যন্ত মনোরম এক উপত্যকায় এসে পৌঁছুলেন। একটি সবুজ-শ্যামল প্রান্তর, যার বিস্তৃতি বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে। স্থানে-স্থানে ফলদার বৃক্ষের ঝাড়। কোথাও-কোথাও সুবর্ণ ও সুগন্ধ ফুলের সারি-সারি বাগান। মাঠের একধার থেকে পাহাড়ের ধারা ওঠে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত চলে গেছে। মাঠে দাঁড়িয়ে তাকালে পাহাড়ের বিশাল-বিশাল গাছগুলোকে ছোট-ছোট ঝোঁপ বলে প্রতীয়মান হয়।

পাহাড় সবুজে পরিপূর্ণ। অত্যন্ত মনকাড়া ও হৃদয়ছোঁয়া। কাফেলার সদস্যরা সবুজ উপত্যকা ও পাহাড় দেখে সীমাহীন আনন্দিত হলো। কয়েকজন এসে কমান্ডার আমেরের নিকট এখানে অন্তত একটি দিন অবস্থান করার আবেদন জানাল। আমের তাদের আবেদন মঞ্জুর করে নিলেন। তিনি ছোট্ট একটি ঝরনার নিকট– সম্ভবত এই ময়দানকে সিঞ্চিত করার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ এটি প্রবাহিত করে দিয়েছেন– ছাউনি ফেললেন।

আফীরা ও সাফওয়ান রাতের খানা খেল। আফীরা সাফওয়ানকে বলল, সাহস-টাহস আছে কিছু?

দুজনে তাঁবুর বাইরে কম্বল পেতে বসে গল্প করছিল। জোসনা রাত। আকাশ থেকে আলোর বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। সেই আলোর বারিতে গোসল করছে দুজন।

জোসনা রাত আফীরার খুবই ভালো লাগে। সাফওয়ান তার মুখপানে তাকিয়ে বলল, কেমন সাহস চাই তোমার?

আফীরা বলল, এই ধরো চল্লিশ পা হাঁটার।

এতে সাহসের কী আছে?

থাকবে না কেন? পাহাড়ের পাদদেশ। ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা। সম্ভাবনা আছে, তুমি ভয় পেয়ে যাবে।

আমি ভয় পেয়ে যাব, না?

না, আমি ভয় পাব। তুমি তো মুজাহিদ। মুজাহিদ ভয় পায় না।

তুমি অবশ্য ভয় পেতে পার।

ঠিক আছে চলো; পরীক্ষা হয়ে যাক।

মাফ করো, আমার পা চলে না।

এজন্যই তো জিজ্ঞেস করেছি, সাহস আছে কি-না। তোমার সাহস জবাব দিয়ে দিয়েছে, না?

না, আমার পা চলবে না।

এত অজুহাত না পেড়ে সোজা কথাটা বলে দাও না কেন, ভয়ের জায়গা, আমার সাহস হয় না?

তোমার সাহস হয়, না?

হবে না কেন? আমি তোমার মতো কাপুরুষ নই।

তুমি পুরুষ নও, তা আমিও জানি। তুমি নারী।

নারী বটে; কিন্তু তোমার মতো আমার হাঁটু কাঁপে না।

তা হলে একাই গিয়ে ঘুরে আস।

আমি তো যাবই। তোমাকেও একটু বাজিয়ে দেখলাম আর কী।

তুমি খুব দুষ্টু মেয়ে। সেদিন ফোরাত নদীতে ফেলে এসেছে। আজ না জানি কী মতলব এঁটেছ।

আমি ফেলে দিয়েছি তোমাকে? এ তুমি কী বললে?

ভাগ্য ভালো যে, পালিয়ে এসেছ। অন্যথায় কটা ধানে কটা চাল হয় হিসাবটা বুঝিয়ে দিতাম।

তুমি উকো হয়ে বসে ছিলে। মনে করলাম, নদীতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছ। তাই আমি তোমাকে সাহায্য করলাম। 'করবে ভালো, পাবে মন্দ' একেই বলে।

ভালো-মন্দ সব জানা হয়ে যেত। এমন ধাক্কা দিতাম যে, ছোট কালের মায়ের দুধ খাওয়ার কথা মনে পড়ে যেত।

নিজে পড়ে কুল পাও না, আবার আমাকে ফেলবে। যা হোক পিছনের কথা বাদ দাও। এখানে না অমন খরস্রোতা নদী আছে, না নদীর উঁচু পাড় আছে। সবুজ-শ্যামল মাঠ। তবে হাঁটতে গিয়ে যদি পা পিছলে পড়ে যাও, সে ভিন্ন কথা। অন্যথায় এখানে আর কোনো সমস্যার সম্ভাবনা নেই।

খুব প্যাঁচাল শুরু করেছ তুমি। এবার থামো।

যাও, তাঁবুর ভেতরে গিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে থাকো। এদিক-ওদিক থেকে শত্রু বেরিয়ে এলে বিপদ হবে।

এখানে শত্রু আসবে না। আর এলে চরম শিক্ষা দিয়ে দেব।

তাওবা করো। কোথাও একটু ঘুরতেও যাবে না, শত্রুরও মোকাবেলা করতে পারবে না। তুমি আসলে কোনো কাজেরই না।

তার মানে তোমার সঙ্গে যাব, না?

না ভাই, আমি তোমাকে নেব না। বিপদ-টিপদে পড়ে গেলে কী উত্তর দেব?

সত্য বলেছ আফীরা, সব সময় আমাকে একটি ভয় তাড়া করে ফিরে, পাছে তুমি কোনো বিপদে পড়ে যাও কিনা।

অথচ তুমি জান, বিপদের সময় আমি নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখি, এমনকি তোমাকেও।

আফীরা দুষ্টু হাসি হাসল।

সাফওয়ান বলল, আচ্ছা চলো, তোমাকে ঘুরিয়ে আনি। না নিলে আবার ক্ষেপে-টেপে যাও নাকি।

চলো।

দুজন হাঁটতে শুরু করল। ক্যাম্প থেকে বের হয়ে একটি ফুলবাগানে ঢুকে পড়ল। রাতের বেলা। চাঁদের আলো শীতল রোদের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। রকমারি ফুলের মনমাতানো দৃশ্য আর মৌ-মৌ গন্ধ দুটি উচ্ছল প্রাণীকে বিমোহিত করে তুলছে। আফীরা কয়েকটি ফুল ছিঁড়ে চুলে বেঁধে নিল। মেয়েটির চুলের বাহার, রূপের বাহার আরও বেড়ে গল।

সাফওয়ান ও আফীরা ফুলবাগানের একদিক দিয়ে ঢুকে আরেক দিকে বেরিয়ে গেল। পাহাড়টি ওখান থেকে খুবই কাছে। জোসনা রাতে পাহাড়ের দৃশ্য আরও মনোরম হয়ে ওঠেছে। আফীরা পাহাড়ের প্রতি পা বাড়ালে সাফওয়ান বলল, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

আফীরা শান্তকণ্ঠে বলল, পাহাড়ে উঠব। ভয় পেয়ো না; আমি আছি তোমার সঙ্গে।

কোনো হিংস্র পশু হুংকার ছাড়লে কিংবা বেরিয়ে এলে তখন বুঝবে কে কার সঙ্গে আছে।

কী করবে হিংস্র প্রাণী আমাদের?

তোমার রূপ-যৌবন ওদেরকে মাতোয়ারা করতে সক্ষম হবে না।

আবার সেই আযরির মতো কথা বলছ। চোখ তুলে দেখো না, পাহাড়টা কত সুন্দর লাগছে।

কিন্তু এই সময়ে পাহাড়ে চড়া ঠিক হবে না।

একটু সাহস করো না বীর সাহেব।

আল্লাহ না করুন, এমন কোনো প্রাণী বেরিয়ে আসতে পারে, যাকে দেখে তুমি ভয়ে চিৎকার জুড়ে দেবে।

তুমি ভুলে যেয়ো না সাফওয়ান, আমি আরবকন্যা। ভয় আমার কাছেও ঘেঁষতে পারে না।

আফীরা পরীর মতো ডানা মেলে পাহাড়ে চড়তে শুরু করল। সাফওয়ান তার পেছনে-পেছনে হাঁটছে। তারা যে-পাকডন্ডিতে আরোহণ করছিল, সেটি বেশি চওড়া ছিল না, যার একদিকে সমতল ভূমি, যে কিনা আকাশের সঙ্গে কথা বলছিল। আর অপরদিকে গভীর খাদ।

সাফওয়ান ভয় পাচ্ছিল, আফীরা পা পিছলে খাদে পড়ে যায় কি-না। সে নিশ্চিত জানে, আল্লাহ না করুন যদি মেয়েটি কোনো কিছুর সঙ্গে হোঁচট খায় আর কোনো একটি খাদে পড়ে যায়, তা হলে তার হাড়-গোড় ভেঙে গুড়োগুড়ো হয়ে যাবে। তাই সে বলল, খুব সাবধানে হাঁটো আফীরা। অত্যন্ত ভয়ংকর এক পাকডন্ডি দিয়ে হাঁটছ তুমি।

আফীরা বলল, তুমি চিন্তা করো না। আমি এর চেয়েও সরু পাকডন্ডি দিয়ে দৌড়াতে পারব।

সাফওয়ান বলল, আমি জানি। তারপরও তুমি সামলে হাঁটো।

সাফওয়ান বুঝে ফেলেছে, মেয়েটির স্বভাবে দুষ্টুমিও আছে, গোঁড়ামিও আছে। যে-কাজ করতে বারণ করব, তা ও করবেই। তাই সে বেশি কিছু বলা সমীচীন মনে করল না।

তবে পা বাড়িয়ে দ্রুত হেঁটে তার কাছে চলে গেল– এত কাছে, যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটবার উপক্রম হয়, তাহলে যেন ওকে ধরে ফেলতে পারে। এই সরু পথটি সাপের মতো এঁকে-বেঁকে উপত্যকা ও গুহার মধ্যখান দিয়ে অতিক্রম করে উপরে উঠে গেছে।

খাদ ও গুহাগুলোর মধ্যে অন্ধকার ছড়িয়ে আছে। ফলে এই জায়গাগুলো অধিক ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু আফীরার এসবের প্রতি যেন কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। মেয়েটি দ্রুতপায়ে তরতর করে উপরে উঠে যাচ্ছে।

অবশেষে দুজন একটি চটানে গিয়ে উপনীত হলো। আফীরা চটানে বসে পড়ল। তার থেকে খানিক দূরে সাফওয়ানও উপবেশন করল। বসে আফীরা আকাশপানে তাকিয়ে চাঁদ দেখছে। চাঁদ বোধহয় ওর কাছে খুবই ভালো লাগে।

সাফওয়ান বলল, কী দেখছ আফীরা।

আফীরা বলল, চাঁদ দেখছি। একটুখানি উপরে ওঠে আমার এখন কত কাছে মনে হচ্ছে ওটা, আর কত সুন্দর!

সাফওয়ান কী যেন বলতে চাচ্ছিল। এমন সময় কী একটা শব্দ কানে ভেসে এল, যেন কেউ পাথরের উপর পিছলে পড়েছে। আফীরা ও সাফওয়ান দুজনই চকিত হয়ে উঠল এবং তাকিয়ে দেখল, একজন মানুষ উপরে উঠে আসছে। লোকটির মুখে লম্বা দাড়ি, লম্বা গোঁফ। গোঁফ আর দাড়ি একাকার হয়ে গেছে। আর মুখটা লুকিয়ে গেছে তার আড়ালে। চোখ দুটো টকটকে লাল– মশালের মতো জ্বলছে। অতিশয় ভয়ানক আকৃতির এক বনমানুষ।

মানুষটি দেখামাত্র আফীরার মুখ থেকে চিৎকার বেরিয়ে এল। বনমানুষটি দ্রুতগতিতে পেছন দিকে দৌড় দিল। সাফওয়ান আফীরাকে ধরে সামলে রাখল।

বারো.

আফীরা খুব ভয় পেয়ে গেছে। লম্বা-লম্বা শ্বাস নিচ্ছে। সাফওয়ান তার মনের ভীতি দূর করার চেষ্টা করল। বলল, ভয়ের কিছু নেই। ওটা কোনো পাহাড়ি মানুষ ছিল।

আফীরার চোখ দুটো বন্ধ ছিল। যখন ভয় কিছুট কমে এল, তখন ধীরে-ধীরে চোখ খুলল। প্রথমে সাফওয়ানের দিকে তাকাল। তারপর যেখানে ভয়ংকর মানুষটি আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেদিকে তাকাল। এখন ও সেখানে নেই।

আফীরা নিজেকে সামলে নিয়ে বসে পড়ল। গভীর শীতল শ্বাস নিয়ে বলল, উহ, কীরূপ ভয়ংকর মানুষ ছিল ওটা!

সাফওয়ান তার মন থেকে ভয় দূর করার জন্য বলল, ভয়ংকর কিছু না। গোঁফ-দাড়ি বড় হয়ে গেছে, এ-ই যা। মনে হয় নাপিত পায়নি এবং সেভ করতে পারেনি।

নাকি ওটা এমন কোনো প্রাণী, যে মানুষের ক্ষতি করে থাকে? কম্পিত ঠোঁটে আফীরা বলল এবং একটা সন্তোষজনক উত্তরের অপেক্ষায় সাফওয়ানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

সাফওয়ান বলল, তুমি কি ভুলে গেছ আফীরা, পবিত্র কুরআনে মানুষ আর জিন ব্যতীত অন্য কোনো সৃষ্টির উল্লেখ নেই?

আফীরা বলল, আমি তা জানি। ওটা জিনই হবে মনে হয়।

সাফওয়ান আফীরার কাছ থেকে উঠে সরতে-সরতে বলল, আমি গিয়ে দেখে আসি, ওটা আসলে কী?

আফীরা হঠাৎ চমকে উঠে বলল, না-না, তুমি যেও না। আমার খুব ভয় লাগছে। তাছাড়া প্রাণীটা তোমার কোনো ক্ষতি করে ফেলতে পারে।

সাফওয়ান সুযোগ নিল। বলল, কেন, এত সাহস-বীরত্ব সব হারিয়ে গেল নাকি? খুব তো গুল মারতে বীরত্বের। এখন কোথায় গেল তোমার সেই বাহাদুরি?

আফীরা বলল, ওসব কথা এখন রাখো। আগে জান বাঁচাও।

সাফওয়ান বলল, রাখব কেন, যখন আমি দেখতে পাচ্ছি, আরবকন্যা নাহ্ম গোত্রের বীরাঙ্গনা মেয়েটি দাড়ি-গোঁফওয়ালা একজন মানুষের দর্শনে ভয়ে জড়সড় হয়ে গেছে? এমন মোক্ষম সুযোগে আমি তাকে তার বীরত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেব না কেন?

আফীরা বলল, আমি মানুষকে ভয় করি না। কিন্তু এমন ভয়ংকর প্রাণী! আল্লাহ রক্ষা করুন। আফীরার ঠোঁট দুটো আবারও কেঁপে ওঠল।

সাওয়ান বলল, তুমি যদি একটুখানি সাহসের পরিচয় দিতে পার, তাহলে আমি সেই 'ভয়ংকর' প্রাণীটিকে ধরে বেঁধে তোমার সামনে এনে দাঁড় করাতে পারি।

আফীরা বলল, ওর উল্লেখই করো না।

আমি দেখতে চাই ও আসলে কে। চলো, তোমাকে ক্যাম্পে পৌঁছিয়ে দিয়ে ফিরে এসে ওকে খুঁজে বের করব।

আফীরা বলল, চলো।

দুজন উঠে রওনা হলো। এবার আফীরার পা আগের মতো দ্রুত উঠছে না। ধীরে-ধীরে হাঁটছে। সাফওয়ান তার মন থেকে ভয় দূর করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। হাঁটতে-হাঁটতে বলল, চাঁদের আলো আর চাঁদনি রাত কেমন ভালো লাগছে! মহান আল্লাহ পাথর, সবুজ-শ্যামলিমা, গাছ-গাছালি ও ফুল-ফল, মোটকথা প্রতিটি বস্তুকে যেন আলোর ঝরনায় গোসল করাচ্ছেন।

কিন্তু সাফওয়ান যত যা কিছুই বলছে, এ-মুহূর্তে আফীরার কোনো কিছুতেই মন গলছে না। মেয়েটির কাছে কিছুই যেন এখন ভালো লাগছে না। কোনো আবেগ-উচ্ছ্বাস বা অনুভূতি না দেখিয়েই সে বলল, হ্যাঁ, চাঁদের আলোতে সবকিছুই ভালো দেখাচ্ছে। আল্লাহ অমঙ্গল করুন ওই ভয়ানক আকৃতিটির। বেটা আমাদেরকে এই হৃদয়কাড়া দৃশ্যটি মন ভরে উপভোগ করতে দিল না।

দুজন পাহাড় থেকে নেমে ফুলবাগানটি অতিক্রম করে ছাউনিতে ফিরে এল। সাফওয়ান বলল, তুমি তাঁবুতে চলে যাও আফীরা, আমি আসছি।

আফীরা সাফওয়ানের প্রতি তাকিয়ে ভয়জড়িত কণ্ঠে বলল, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

সাফওয়ান বলল, পাহাড়ে– ওই ভয়ানক আকৃতিটির সন্ধানে।

আফীরা সাফওয়ানের হাত চেপে ধরে বলল, এ-সময় আমি তোমাকে যেতে দেব না।

সাফওয়ান অপারগ হয়ে পড়ল। অগত্যা সে আফীরার সঙ্গে তাঁবুতে ফিরে এল।

ততক্ষণে ঈশার আযান হয়ে গেছে। সাফওয়ান জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করল। আফীরা নিজ তাঁবুতে নামায আদায় করল।

পরদিনও এই বাহিনী উক্ত স্থানে অবস্থান করল। ততক্ষণে আফীরার ভীতি দূর হয়ে গেছে। হৃদয়ে আগের মতো চাঞ্চল্য, সাহস ও বীরত্ব ফিরে এসেছে। সাফওয়ানকে বলল, চলো, ঘুরতে যাই।

সাফওয়ান খানিক বিস্ময়ের সুরে বলল, ভুলে গেছ রাতের ঘটনা!

ভুলব কেন; মনে আছে।

তা হলে আবারও বেড়ানোর কথা বলছ! সাহস তো তোমার মন্দ নয়।

সাহস মন্দ হবে কেন? আর সাহস থাকা কি দোষ?

না, মানে বলছিলাম, রাতে কী অবস্থাটা দাঁড়িয়েছিল। ভয়ে-আতঙ্কে কাঁপতে শুরু করেছিলে। অন্যথায় সাহস থাকা তো দোষ নয় সে আমিও জানি।

আসল ব্যাপারটা কী জান? আমি তোমার কারণে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলাম, পাছে বীরত্ব দেখাতে গিয়ে তুমি বনমানুষটির সঙ্গে লেগে পড় কিনা। সেজন্য আমি ভয় পাওয়ার ভান ধরেছিলাম, যাতে তুমি না যাও।

এই কথা। আচ্ছা চলো, দিনের বেলা গিয়ে দেখি, ওটা আসলে কি ছিল বা কে ছিল।

চলো।

দুজন প্রস্তুত হয়ে রওনা হলো। পাহাড়ে উঠতে গিয়ে এবার তারা পাকডন্ডির একপার্শ্বে অবস্থিত সেই খাদ ও গুহাগুলোকে দেখল। অত্যন্ত গভীর ও ভয়ংকর। আফীরা বলল, উহ! কীরূপ ভয়ংকর গুহা এগুলো। সাফওয়ান বলল, রাতে তো তুমি লাফিয়ে-লাফিয়ে হেঁটেছিলে। আমার নিষেধাজ্ঞায় কোনোই ভ্রূক্ষেপ করনি। এখন দেখো, কেমন ভয়ংকর জায়গা এগুলো!

আফীরা বলল, ভয়ংকরই বটে! এখন-না বুঝলাম।

রাতে যে-চটানে গিয়ে বসেছিল, এখনও দুজন সেখানে পৌঁছে গেল। তারা পুরো দৃশ্যটা দেখার চেষ্টা করল। যতদূর চোখ গেল চটান কিংবা গাছ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। তারা আরও সম্মুখে এগিয়ে গেল।

সবুজে ঘেরা বিশাল এক পাহাড়। পায়ে-পায়ে শ্যামলিমা, যেন পাথরের বুক চিরে এসব গাছ আর শ্যামলিমারা জন্ম নিয়েছে। তরতাজা ডাল-পাতায় ঠাসানো গাছ আর গাছ। স্থানে-স্থানে আপনা-আপনি গজিয়েওঠা ফুলবাগান মনমাতানো দৃশ্য উপহার দিচ্ছে। কোথাও-কোথাও এত বেশি ফুলের সমারোহ যে, সমস্ত পাহাড় ফুলে-ফুলে ছেয়ে গেছে।

ফুল খুব প্রিয় আফীরার। সে ফুল ছিঁড়ে-ছিঁড়ে হাতে নিচ্ছে এবং অধিক পছন্দের ফুলটি চুলের খোঁপায় গেঁথে নিচ্ছে। সেই ফুলেরা তার রূপ-

সৌন্দর্যকে আরও চিত্তহারী করে তুলেছে। সাফওয়ান জিজ্ঞেস করল, ফুলগুলোকে খোঁপায় বাঁধছ কেন?

কেন, ভালো লাগছে না?

এত ভালো লাগছে যে, এই ভালো লাগার পথ ধরে যদি সেই বনমানুষটি আবার বেরিয়ে আসে, তা হলে তো...।

আফীরা সাফওয়ানকে আর এগোতে না দিয়ে বলল, ধ্যাৎ, আবার সেই আয্‌রিমার্কা কথা!

পাহাড়ে হাঁটতে-হাঁটতে দুজন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আফীরার মনে সীমাহীন আনন্দ। সে উৎফুল্লমনে হাঁটছে, হেসে-হেসে কথা বলছে আর ফুল ছিটাচ্ছে।

একটি ফুলসমৃদ্ধ এলাকায় এসে পৌঁছুল দুজন। নানা জাতের সুবর্ণ ও সুন্দর-সুন্দর সুগন্ধময় ফুল ফুটে আছে। অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও মনোরম জায়গা। ফুলের সৌরভে মন-মস্তিষ্ক সুরভিত হয়ে গেল সাফওয়ান ও আফীরার।

আফীরা বলল, কিছুক্ষণ এখানে বসে নিজেকে ধন্য করি।

সাফওয়ান বলল, তুমি বসো; আমি সামনের ওই চটানটি পর্যন্ত ঘুরে আসি।

আফীরা বলল, এ আবার কেমন কথা! আমি এখানে আর তুমি ওখানে?

সাফওয়ান বলল, ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমি তোমার প্রতি নজর রাখব।

সাফওয়ান চলে গেল। তার চলে যাওয়ার অল্পক্ষণ পর হঠাৎ একদিক থেকে কেমন একটা শব্দ এল। আফীরা সহসা চমকে উঠে মোড় ঘুরিয়ে তাকাল। ভয়ে তার গা ছমছম করে ওঠল। মনে শঙ্কা জাগল, আবার রাতের সেই বনমানুষটি এসে পড়ল নাকি! তার গোলাপি চেহারাটা সাদা হয়ে গেল এবং সুন্দর চোখ দুটো থেকে ভীতি ঠিক্‌রে পড়তে লাগল।

কিন্তু আফীরা মোড় ঘুরিয়েই দেখতে পেল, দামি পোশাক পরিহিত ও সর্বাঙ্গ সোনা-জহরত সজ্জিত এক অনারব যুবক একস্থানে দাঁড়িয়ে বিস্ময়কর ভঙ্গিতে অপলক চোখে তার প্রতি তাকিয়ে আছে।

এক অচেনা যুবকের এভাবে নিজের প্রতি তাকিয়ে থাকা আফীরার কাছে অপ্রীতিকর ঠেকল। তার শিরায় আরব রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করল। সে ওদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আনল।

অনারব ধীরপায়ে এগিয়ে আফীরার সামনে এসে দাঁড়াল এবং নিজের ভাষায় বলল, ওহে রূপসী, এক অনারব রাজপুত্রের সালাম গ্রহণ করো।

যুবক ফার্সি ভাষায় কথা বলল।

আফীরা আরব মেয়ে– ফার্সি জানে না। তাই বুঝল না, যুবক কী বলছে। মেয়েটি কোনো উত্তর না দিয়ে নিশ্চুপ বসে থাকল। যুবক পুনরায় বলল, ওহে তন্বী-তরুণী, আমার সালাম গৃহীত হলো কি?

আফীরা এবারও কিছু বুঝল না। কিন্তু বলল, আমি তোমার কথা বুঝছি না। আমি তোমার ভাষা জানি না।

আফীরা আরবিতে কথা বলল। অনারব যুবক আরবি জানে না। তাই সেও আফীরার কথা বুঝল না। তবে এটুকু বুঝে নিল যে, মেয়েটি ফার্সি জানে না। অগত্যা সে চোখ দুটো বিস্ফারিত করে আফীরার প্রতি তাকিয়ে রইল।

আফীরা বিরক্ত হয়ে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল, কে তুমি? চলে যাও আমার সম্মুখ থেকে।

অনারব যুবক তার কথা বুঝল না বটে; কিন্তু ভাব দেখে বুঝে নিল, মেয়েটি ক্ষেপে গেছে। তাই সে শান্ত গলায় বলল, ওহে ফুলকলি, তোমার এই প্রেমাষ্পদটির প্রতি রাগ করো না।

যুবক একনাগাড়ে অপলক চোখে আফীরার প্রতি তাকিয়ে রইল। আফীরার মেজাজটা চড়ে গেল। বলল, তুমি কি যাবে না এখান থেকে? বলেই আফীরা বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। খঞ্জর বের করার জন্য পকেটে হাত ঢোকাল। অনারব যুবক মোড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকাল। সম্ভবত আগে সে সাফওয়ানকে দেখে নিয়েছিল। সাফওয়ান ওদিক থেকে আসছিল। সে দ্রুতপায়ে হেঁটে চটানের পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাফওয়ান ফিরে এসে আফীরার সম্মুখে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কে ছিল লোকটি?

আফীরা উত্তর দিল, জানি না কে ছিল। ভূত-প্রেত হবে হয়ত।

কী বলছিল?

সে তার ভাষায় কথা বলছিল। আমি কিছুই বুঝিনি। চলো ফিরে যাই।

দুজন চুপচাপ হাঁটতে শুরু করল। তারা পাহাড় থেকে নিচে অবতরণ করছে। অনারব যুবক এক চটানের পেছনে দাঁড়িয়ে ওদের অবলোকন করছে।

তেরো.

অনাবর যুবক গভীর চোখে আফীরাকে অবলোকন করছে। এ-মুহূর্তে আফীরার পেছন দিকটা দেখতে পাচ্ছে না। সম্ভবত যুবক মেয়েটির উচ্চতা, চলন ও ভাবভঙ্গি দেখে নিজেকে ধন্য করছে। সে শীতল শ্বাস নিয়ে মনে-মনে বলল, আমাদের দেশে অনেক রূপসী মেয়ে আছে। কিন্তু ইয়ায্‌দানের শপথ, এই আরব দুহিতার স্থানে ওরা এমন, যেমন চাঁদের সামনে তারকা।

মেয়েটির চেহারা কত মনকাড়া, ভাবভঙ্গি কত চিত্তাকর্ষী এবং শরীরের গঠন কত সুসমঞ্জস্য ও মনোলোভা। মন চায়...।

এমন সময় এক দিক থেকে আওয়াজ ভেসে এল– মন চায় ওর প্রতিটি গুণের কাছে আত্মবিসর্জন দিই, না?

অনারব যুবক চকিতে মোড় ঘুরিয়ে তাকাল। তার একেবারে সম্মুখে সেই বনমানুষটি দাঁড়ানো, যাকে গত রাতে দেখে আফীরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। অনারব যুবকও তাকে দেখে ভয়ে পেয়ে গেল। ভয়ে-আতঙ্কে তার শরীরে কম্পন শুরু হয়ে গেল।

বনমানুষটির আকৃতিই ভয়ংকর। মাথার চুলগুলো এত বড় যে, পেছন দিকে ঘাড়ের অনেক নিচ পর্যন্ত খুব বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। আর সামনের দিকে কপালটা ঢেকে রেখেছে। শুধু চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে– অতিশয় টকটকে লাল। গোঁফগুলো বড় হয়ে-হয়ে দাড়ির সঙ্গে গিয়ে মিশেছে আর তাতে মুখটা ঢেকে আছে। দাড়ি এত লম্বা যে, পুরো বক্ষদেশ তাতে ঢেকে আছে। অত্যন্ত ভয়ানক এক আকৃতি।

অনারব যুবক তাকে দেখে যখন ভয় পেয়ে গেল, তখন সম্ভবত সে মিটিমিটি হেসেছিল। কারণ, সে-সময় তার চোখ দুটো ঝিলিক মেরে ওঠেছিল। কিন্তু মুখটা যেহেতু গোঁফ দ্বারা ঢাকা, তাই তারা হাসা দেখা যায়নি। বলল, আমাকেও খানিক মনোযোগ সহকারে দেখো।

তাকে দেখে অনারব যুবকের প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। যুবক ধরা গলায় বলল, আপনি...।

অনারব যুবক এত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে যে, সে কথাটা শেষ করতে পারল না।

বনমানুষ বলল, আমি কে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছ, না?

যুবক এবারও কিছু বলতে পারল না। তার ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে। কিন্তু তার চাহনিতে বোঝা গেল, সে এ-কথাটিই জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছে।

বনমানুষ ঠাণ্ডা শ্বাস নিয়ে বলল, একটি সময় ছিল যখন আমি কিছু ছিলাম। কিন্তু এখন আমি একটি বনমানুষ, যাকে দেখে শুধু আমার স্বজাতিই নয়– যে কোনো মানুষই ভয় পায়। যে-ইরানিরা আমাকে দেখেছে, তাদের উক্তি হলো, আমি বনমানুষ।

অনারব খানিক সাহস সঞ্চয় করে বলল, আপনি আপনার আকৃতিটা এমন বানিয়ে রেখেছেন যে, ভয় না পেয়ে উপায় নেই। আপনি কি নাপিত পান না যে, এগুলো কাটিয়ে স্বাভাবিক করে রাখবেন?

বনমানুষ বলল, মানুষের প্রতি আমার ঘৃণা জন্মে গেছে। বিশেষত সেই সম্প্রদায়টির প্রতি, যারা আমার জীবনটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে, আমাকে বনমানুষ হতে বাধ্য করেছে।

যুবক জিজ্ঞেস করল, তারা কারা?

তারা তোমার জাতি। যারদাশ্‌তের অনুসারী। ইয়ায্‌দানের পুজারি। ইরানি।

আমি আপনার কাহিনী বিস্তারিত শুনতে চাই।

আমার কাহিনী তোমাকে পরে একদিন শোনাব। এখন বলো, ওই মেয়েটি কে, যাকে তুমি দেখছিলে?

আমি নিজেই জানি না, কে এই রূপরানী। আমি তাকে আজই প্রথম দেখলাম।

ওই মেয়েটি আর তার সঙ্গীর পোশাক বিস্ময়কর ধরনের। আমাদের দেশের পোশাকের মতো নয়।

এরা ইরানি নয়– আরবি।

আরবি– বনমানুষ বিস্ময়ের সঙ্গে বলল এবং অনারব যুবকের প্রতি তাকিয়ে থাকল।

হ্যাঁ, আরবি। আপনি কি জীবনে কখনও কোনো আরবকে দেখেননি?

দেখেছিলাম। মনে পড়েছে। একবার– যখন আমি মানুষ ছিলাম এবং যুবক ছিলাম– কয়েকজন আরবকে দেখেছিলাম। তারা কাজের সন্ধানে এসেছিল। আমি তাদের একজনকে নওকর রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু যখন জানলাম, ওরা মূর্তিপুজারি এবং আগুনকে খোদার জ্যোতি বিশ্বাস করে না, তখন আমার মনে খুব রাগ হলো। আর চাকুরি দিলাম না।

এখন আরবরা মূর্তিপুজারি নয়। তাদের মাঝে নতুন এক নবী জন্মগ্রহণ করেছেন বলে শুনেছি। এখন তারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে।

মুসলমান দাবি করে...। বনমানুষ অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলল।

হ্যাঁ, আমি এমনই শুনেছি।

সেই নবী কি এখনও জীবিত আছেন?

তা আমার জানা নেই।

সেই যুগ এসে পড়ল নাকি, যার সম্পর্কে আমাকে অবহিত করা হয়েছিল!

আপনাকে কী অবহিত করা হয়েছিল?

আমাকে অবহিত করা হয়েছিল, জগতে বিপ্লব আসবে। রাজ্যসমূহ ওলট-পালট হয়ে যাবে। আমাদের দেশে যে-নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও অনাচার ছড়িয়ে পড়েছে, তা দূর হয়ে যাবে।

বিপ্লব এসে পড়েছে। রাজ্যসমূহ ওলট-পালট হয়ে গেছে। আপনার বোধহয় জানা আছে, আরব কীরূপ দরিদ্র ও দুর্বল জাতি ছিল।

আমি জানি, কোনো রাষ্ট্রই আরব দেশকে ভালো চোখে দেখত না এবং কোনো জাতিই আরব জাতিকে মর্যাদা দিত না। সবাই তাদেরকে পশ্চাৎপদ জাতি মনে করত। তারা ছিলও বজ্জাত। তাদের মাঝে ঐক্য ছিল না, সভ্যতা ছিল না। ছিল শুধু অনৈক্য। যতসব বাজে চরিত্রের মানুষ ছিল তারা।

সেই আরব এখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের নবী তাদের চিত্র পালটে দিয়েছেন। তাদের জীবন থেকে মন্দ স্বভাবগুলো দূর করে দিয়েছেন। এখন তারা নতুন এক সভ্যতা ও নতুন এক জীবনদর্শন নিয়ে আরব থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

তা হলে তো তারা অন্যান্য দেশের উপর আক্রমণও শুরু করে দিয়েছে!

আপনার বোধহয় তাদের সম্পর্কে কিছুই জানা নেই।

জানব কীভাবে, দীর্ঘ একটি সময় ধরে আমি এই পাহাড়ে অবস্থান করছি। গুহা আমার বাসস্থান, পাথর আমার জীবনসঙ্গী। মানুষ আমাকে দেখেই ভয়ে পালিয়ে যায়। জীবজন্তুদের মাঝে বাক্‌শক্তি নেই যে, তাদেরকে আমার কথা শোনাব, আর আমি তাদের কথা শুনব।

তাহলে আমার কাছ থেকে শোনো। তারা নিজ দেশে বিশাল এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। এখন তারা বিভিন্ন দেশে আক্রমণ চালিয়ে সেগুলো জয় করা এবং নিজেদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার মিশন নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে।

বনমানুষের চোখ দুটো চিকচিক করে ওঠল। বলল, তাহলে আমার গুরু আমাকে সত্যই বলেছেন।

কে ছিলেন আপনার গুরু?

এক দুনিয়াত্যাগী সাধক। একবার আমি বলখের সন্নিকটস্থ পাহাড়ি অঞ্চলে চলে গিয়েছিলাম। চিন্তা-পেরেশানি আমাকে পিষে ফেলেছিল। জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেছিলাম। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমি আত্মহত্যা করব। আমি একটি উঁচু চটানের উপর ওঠে গেলাম এবং গুহার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলাম। ঠিক এমন সময় কেউ একজন আমার কাঁধের উপর হাত রেখে কোমল কণ্ঠে বলল, আত্মহত্যা করা ঠিক নয় যুবক। আমি মোড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখি, এক যারদাশ্‌তি বুযর্গ দাঁড়িয়ে আছেন। হলুদ পোশাক পরিহিত। তিনি হাত ধরে আমাকে

পেছনে সরিয়ে নিয়ে গেলেন এবং একটি পাথরের উপর বসে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আত্মহত্যা করতে চাচ্ছ কেন?

আমি তাকে আমার বিপদ ও সমস্যার কথা জানালাম। তিনি খুব প্রভাবিত হলেন। আমাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, ধৈর্য ধরো মেহেরজান। আর সেই সময়টির অপেক্ষা করো, যখন তোমার ও আমার জাতির উপর আহ্রামের গজব আপতিত হবে। এই জাতি তাদের দুশ্চরিত্রের কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে। এমন একটি জাতির হাতে তাদের কর্তৃত্ব তুলে দেওয়া হবে, যারা আজ খুবই অপদস্থ ও তুচ্ছ জাতি।

আমি তাঁর সঙ্গে থাকতে শুরু করলাম। তিনি অত্যন্ত বুযর্গ লোক ছিলেন এবং জ্যোতির্বিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। আমাকে তিনি অনেক কথা বলতেন। তাঁর এক-একটি কথা আজও আমার অন্তরে গেঁথে আছে। আমি কয়েক বছর তাঁর সঙ্গে থাকলাম। তিনি আমার থেকে ওয়াদা নিয়ে রেখেছিলেন, আমি আত্মহত্যা করব না। বরং সেই সময়টির অপেক্ষা করব, যখন আমার নিপীড়নকারীরা যাযাবর হয়ে যাবে এবং তাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই সুবাদে আমি আজও বেঁচে আছি এবং সেই সময়টির অপেক্ষা করছি।

সেই লোকগুলো কারা ছিল, যারা তোমাকে অত্যাচার করেছে?

বনমানুষটির নাম মেহেরজান। সে বলল, শুনতেই যখন চাচ্ছ, তো শোনো। তারা ইরানের রাজা ইয়ায্দাজার্দ ও তার উপদেষ্টা।

অনারব যুবক খুব বিস্মিত হলো। বলল, উক্ত বুযর্গ কি এ-কথা বলেছিলেন যে, ইয়ায্দাজার্দ ও তাঁর উপদেষ্টা ছন্নছাড়া হয়ে যাবেন?

হ্যাঁ, তিনি বলেছিলেন, তাদের শক্তি খানখান হয়ে যাবে। তারা ধ্বংস হয়ে যাবে আর যাযাবরের মতো জীবন-যাপন করবে।

তাঁর এই ভবিষদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ইয়ায্দাজার্দ ও তাঁর উপদেষ্টা ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের শক্তি ভেঙে খানখান হয়ে গেছে। এখন তারা যাযাবর।

মেহেরজানের চোখ দুটো চিকচিক করতে শুরু করল। বলল, এখন আমি আমার প্রতিশোধ নেব। এই মুহূর্তে আমি যে-সুসংবাদ শুনলাম, তার বিনিময়ে আমি ইয়ায্দানের উপাসনা করব। আগামী কাল ঠিক এই সময় যদি তুমি এখানে আস, তা হলে আমি তোমাকে আমার কাহিনী শোনাব আর তোমার কাছে ইয়ায্দাজার্দ ও তার উপদেষ্টার অবস্থান জানব। বলো, আসবে কাল?

আমি আসব। আমার মনে আপনার কাহিনী শোনবার প্রবল আগ্রহ জন্মে গেছে।

আচ্ছা, এখন যাও, আগামী কাল ঠিক এ-সময়ে এখানে এসো।

মেহেরজান চলে গেল। অনারব যুবকও একদিকে হাঁটতে শুরু করল।

চৌদ্দ.

পরদিন রাত পোহাবামাত্র অনারব যুবক পাহাড়ে এসে হাজির হলো। তাকে বেশি সময় অপেক্ষা করতে হলো না। মেহেরজানও তাড়াতাড়িই এসে উপস্থিত হলো। অনারব যুবক বলল, তুমি এ কী এক আকৃতি বানিয়ে রেখেছ! শেভ হয়ে গোঁফ-দাড়ি কেটে মানুষ হয়ে যাও।

মেহেরবান বলল, সেই সময়টা সম্ভবত এসে পড়েছে, যখন আমি মানুষ হব, মানুষের কাতারে শামিল হব এবং নিজের প্রতিশোধ নেব। আমি আমার গুরুর কাছে যে-বিদ্যা অর্জন করেছি, তার মাধ্যমে আমি অবগতি লাভ করেছি যে, ইরানের আকাশে সেই তারকা উদিত হয়ে গেছে, যার অকল্যাণ সম্রাটকে, সম্রাটের উপদেষ্টাবৃন্দকে এবং দেশের ধনিক শ্রেণী ও নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে।

অনারব যুবক বলল, তোমার বিদ্যা তোমাকে সঠিক তথ্যই দিয়েছে। সম্রাট, তার পারিষদ ও ধনিক-বণিক শ্রেণী ধ্বংসের দিকে ছুটে চলছে।

মেহেরজান বলল, তাদের অপকর্মের পরিণতি এরূপই হওয়ার কথা ছিল। এখন আমি তোমাদেরকে কিছু কথা বলতে চাই।

বলো।

আগে তোমার নাম বলো।

আমার নাম ফায়রোজান।

ফায়রোজান– ফায়রোজান...। মেহেরজান নামটা কয়েকবার উচ্চারণ করল। কী যেন একটা হিসাব কষল। তারপর ফায়রোজানের প্রতি তাকিয়ে বলল, আমি তো তোমার নাম ফাররুখযাদ ঠিক করেছিলাম। সে যা হোক, ফায়রোজানও ফা দিয়ে শুরু, ফাররুখযাদও ফা দিয়ে শুরু। উভয়ের মাথা একই। শোনো ফায়রোজান, গতকাল তুমি যে-আরব দুহিতার প্রতি তাকাচ্ছিলে, তার সঙ্গে তোমার ভালবাসা হয়ে গেছে। তুমি মেয়েটিকে ভালবেসে ফেলেছ। কিন্তু তুমি তার ভাবনা ছেড়ে দাও। অন্যথায় তুমি এমন বিপদে পড়ে যাবে যে, তোমার জীবন বিপন্ন হয়ে যাবে।

সত্য কথা হলো, ফুলকলিটির প্রতি আমার এমন ভালবাসা জন্মে গেছে যে, ওর জন্য আমি জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত আছি।

তবে সাবধান থেকো। আমি যতটুকু জানি ও বুঝি, নক্ষত্রের অকল্যাণ ঠেকানো যায় না।

ঠিক এ-সময় ইসলামি বাহিনীটিতে তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। বাহিনী ছাউনি তুলে রওনা হতে শুরু করেছে। উট, ঘোড়া ও সৈনিকরা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। ফায়রোজান বলল, মুসলমানরা এখান থেকে রওনা হয়ে গেছে। কিন্তু তারা জানে না, ইরানি সৈন্যরা তাদের জন্য ওঁৎ পেতে আছে। যখনই সুযোগ পাবে, আক্রমণ করে বসবে। আর সেটিই হবে আমার ভাগ্যপরীক্ষার উপযুক্ত সময়।

কার বাহিনী মুসলমানদের জন্য ওঁৎ পেতে আছে?

ইয়ায্দাজার্দ-এর এক উপদেষ্টা খোরযাদ-এর।

ও এখানে এল কীভাবে?

ইয়ায্দাজার্দ মারাদে অবস্থান করছেন। তিনি কাশান থেকে তবিলন পর্যন্ত কয়েকটি ইরানি বাহিনী ছড়িয়ে রেখেছেন। মুসলমানদের বৃহৎ যে-বাহিনীটি তবিলনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তার উপর আক্রমণ করতে ওদের সাহস হয়নি। উলটো কয়েকটি বাহিনী ইসলামি বাহিনীর ভয়ে তবিলনে সরে এসে জড়ো হয়েছে। বোধহয় এই একটি ইউনিটই খোরযাদ-এর আওতার মধ্যে রয়ে গেছে।

কিন্তু ইয়ায্দাজার্দ ছন্নছাড়া হলো কীভাবে?

আমি মাদায়েনে উপস্থিত ছিলাম। সে-সময় শুনেছি মুসলমানরা ইরানে আক্রমণ করেছে। এই সংবাদে ইরানিদের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। সমস্ত দরবারি ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল। সেনাবাহিনীর দুজন কর্নেল ছিল রুস্তম ও ফিরোজ। দুজনই অতিশয় সাহসী ও বীর ছিল। দুজনের মাঝে খানিক বিরোধ ছিল। অন্যান্য দরবারিরা তাদের মাঝে মিলমিশ করিয়ে দিল। ইয়ায্দাজার্দ ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ফৌজ আসতে শুরু করল। মাদায়েনের ছাউনিগুলো সৈন্যদের দ্বারা কানায়-কানায় ভরে গেল।

আমি সে-সময়ই জানতে পেরেছি, মুসলমানরা কাদেসিয়ায় এসে পড়েছে। গোয়েন্দারা তথ্য সংগ্রহ করেছে, ইসলামি বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা বেশি নয়– মাত্র বিশ হাজার। ইয়ায্দাজার্দ নিজ বাহিনীর পরিসংখ্যান নিয়ে জানতে পারলেন, এক লাখ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ রুস্তমকে এই বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। কিন্তু যদিও তিনি বীর সেনানী ছিলেন এবং তার কাছে মুসলমানদের সাতগুণ বেশি সৈন্য ছিল, তথাপি কেন যেন তিনি রওনা হচ্ছিলেন না। ইয়ায্‌দাজার্‌দ যখন তাকে রওনা হতে চাঁপ দিলেন, তখন তিনি বললেন, আমার পরামর্শ হলো, হয় আরবদের সঙ্গে সন্ধি করে ফেলুন, না হয় যুদ্ধকে এত দীর্ঘায়িত করুন, যাতে আরবরা বিতৃষ্ণ হয়ে ফিরে যেতে কিংবা আমাদের সঙ্গে সন্ধি করে যুদ্ধের ইতি টানতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইয়ায্‌দাজার্‌দ তার সব কটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আদেশ দিলেন, আরবদের উপর আক্রমণ করে-করে তাদেরকে নিঃশেষ করে ফেলো। অগত্যা রুস্তম দেড় লাখ সৈন্য নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন এবং সাবাত নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করলেন।

একদিন শুনলাম, মুসলমানদের কয়েকজন দূত এসেছে। ইয়ায্‌দাজার্‌দ জাঁকজমক করে দরবার সাজালেন। আমিও দরবারে গেলাম। ইসলামি দূতরা গায়ে জুব্বা পরে এবং কাঁধে চাদর ঝুলিয়ে দরবারে প্রবেশ করল। তাদের পিঠে ঢাল আর ঢালের সঙ্গে বাঁধা একটি করে তরবারি। হাতে চামড়ার তৈরি চাবুক। তারা অত্যন্ত নির্ভীকচিত্তে দরবারে প্রবেশ করল। তাদের এই ভাবগতিতে পরিষদবর্গ খুবই প্রভাবিত হলো। দোভাষীর মাধ্যমে আলোচনা শুরু হলো। ইয়ায্‌দাজার্‌দ দূতদের বললেন, তোমরা আমাদের রাজ্যের উপর আক্রমণ করেছ কেন?

এক আরব বললেন, আমাদের নবী (সা.) যখন দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, তখন তোমাদের রাজা খসরু পারভেজ সেই আমন্ত্রণপত্রটি ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলেছিল আর এই দুঃসাহস দেখিয়েছিল যে, বলেছিল, সেই আরবি নবীকে গ্রেফতার করে আমার কাছে প্রেরণ করো। কিন্তু মহান আল্লাহ আপন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে দেখালেন। খসরু পারভেজ আপন পুত্র শায়রুবিয়ার হাতে নিহত হলো। তারপর যখন নবীজি (সা.) মৃত্যুবরণ করলেন এবং হযরত আবুবকর (রা.) খলীফা নিযুক্ত হলেন, তখন আরবের মূর্তিপুজারিরা বিদ্রোহ করে বসল। ইরান সরকার সেই বিদ্রোহীদের মদদ জোগাল, ইরান সম্রাট আরব রাজ্যকে দখল করতে চাইল। কিন্তু তার আগেই বিদ্রোহীরা দমিত হয়ে গেল। ইরানিদের এমন আচরণ আমাদেরকে এই দেশটির উপর আক্রমণ করতে বাধ্য করেছে। এবার বলো, তুমি কী চাও?

এই আরব দূত হলেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত নু'মান ইবনে মুকরিন (রা.)। তিনি আপন ধর্ম ইসলামের সৌন্দযের বিবরণ দিলেন এবং বললেন, আমরা চাই তোমরা অগ্নিপূজা পরিত্যাগ করে সেই আল্লাহর সম্মুখে অবনত হও, যিনি এক এবং যিনি জগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তোমরা মুসলমান হয়ে যাও।

ইয়ায্দাজার্দ ক্ষেপে উঠে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন, আমরা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করতে পারব না।

আরব দূত বললেন, তাহলে তোমরা আমাদের যিম্মি হয়ে যাও– আমাদেরকে জিযিয়া দাও। তার বিনিময়ে আমরা তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করব।

মুসলমান দূতের এই প্রস্তাব ইয়ায্দাজার্দ-এর আত্মমর্যাদায় প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানল। বললেন, জিযিয়া দিয়ে আমরা তোমাদের গোলাম হতে রাজী নই।

আরব দূত খাপ থেকে তরবারিটা বের করে বললেন, তাহলে এবার এই তরবারিই আমাদের ও তোমাদের মাঝে মীমাংসা করবে।

একথা শুনে ইয়ায্দাজার্দ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন এবং বললেন, আমি রুস্তমকে পাঠিয়ে দিয়েছি। সে কাদেসিয়ায় তোমাদেরকে দাফন করবে।

আরব বললেন, খুব তাড়াতাড়িই তোমরা জানতে পারবে, কাদেসিয়ায় কারা কাদেরকে দাফন করেছে।

ইয়ায্দাজার্দ আরব দূতদের অপদস্থ করতে এক মুষ্ঠি মাটি সংগ্রহ করিয়ে সেগুলো প্রতিনিধিদলের প্রধান আসিম ইবনে আমর-এর মাথায় রেখে দিলেন। কিন্তু সকলকে বিস্মিত করে দলনেতা হেসে বললেন, ইয়ায্দাজার্দ, তুমি তোমার দেশের মাটি আমার হাতে তুলে দিয়েছ। এটি বিজয়েরই শুভলক্ষণ।

আরবরা চলে গেলে ইয়ায্দাজার্দ রুস্তমের নিকট দূত প্রেরণ করলেন এবং কালবিলম্ব না করে আক্রমণ করতে আদেশ দিলেন। রুস্তম সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করল। কিন্তু মুসলমানরা এমন বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবেলা করল যে, ইরানিদের লাশের সারি বিছিয়ে দিল। এক পর্যায়ে সোনাপতি রুস্তম মারা গেল এবং ইরানিরা পরাজিত হলো।

এই পরাজয়ের সংবাদ মাদায়েন পৌঁছুলে নগরীতে মাতম শুরু হয়ে গেল।

পরাজিত হয়ে ইরানিরা বাবেল এসে সমবেত হলো। মুসলমানরা এগিয়ে গিয়ে বাবেলে আক্রমণ করল এবং এটিও জয় করে নিল। তারপর কুসির উপর আক্রমণ হলো এবং সেটিও তাদের পদানত হলো।

মাদায়েনে একের-পর-এক পরাজয়ের খবর আসতে লাগল এবং ইরানিদের মনোবল ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে লাগল। নেতৃস্থানীয় ও বিত্তশালী ব্যক্তিরা মুসলমানদের ভয়ে কাঁপতে শুরু করল। দেশের পারিষদবর্গ, এমনকি ইয়ায্‌দাজার্‌দ পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠলেন।

মুসলমানরা বহিরাশের উপর আক্রমণ করল। ইরানিরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। তারা উক্ত নগরীতে কয়েক মাস পর্যন্ত অবরুদ্ধ থেকে অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে ময়দানে বেরিয়ে এল। মুসলমানরা তাদের দেখেই ছুটে গেল এবং তাদেরকে মুলা-গাজরের মতো কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেলল। বহিরাশেরও জয় হলো।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ বহিরাশেরের পরাজয়ের সংবাদ শুনে কেঁপে ওঠলেন। এবার তিনি নিশ্চিত বুঝে ফেললেন, তাঁর রাজ্য ও রাজত্বের পতন অনিবার্য। তিনি রাজপরিবারের সদস্যদেরকে মালামাল ও ধনভাণ্ডারসহ হুলওয়ান পাঠিয়ে দিলেন এবং পরে একদিন নিজেও হুলওয়ান পালিয়ে গেলেন। মুসলমানরা ঘোড়ার পিঠে করে সাঁতার কেটে দজলা নদী পার হয়ে মাদায়েনের উপর আক্রমণ চালিয়ে সেটিও জয় করে নিল। সেই সময় থেকে ইয়ায্‌দাজার্‌দ যাযাবরের জীবন-যাপন করছেন।

মেহেরজান বলল, সে এই পরিণতিরই উপযুক্ত ছিল। সে ও তার উপদেষ্টারা আমার সঙ্গে যে-আচরণ করেছে, তা ছিল যারপরনাই হিংস্রতা। সাজা এ-যাবত যা পেয়েছে, সেই হিংস্রতার তুলনায় তা অনেক কম। এবার আমি তার থেকে প্রতিশোধ নেব, এমন প্রতিশোধ, যা দ্বারা অন্যরা শিক্ষা নেবে।

ইতিমধ্যে ইসলামি সেনা-ইউনিটটি অনেকখানি পথ এগিয়ে গেছে। এখন ধুলোবালি ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না– কোনো উট-ঘোড়া বা কোনো আরোহী কিছুই না।

ফায়রোজান বলল, এবার আপনার কাহিনী শোনান।

মেহেরজান বলল, শোনাব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার কাহিনী শুনে তুমিও প্রভাবিত হবে।

মেহেরজান নড়েচড়ে বসল। ফায়রোজান উন্মুখ হয়ে তার প্রতি তাকিয়ে রইল।

পনেরো.

মেহেরজান বলতে শুরু করল–

আমি সায়েরজানের অধিপতি– মানে অধিপতি ছিলাম। আমার বয়স যখন বারো কি তেরো বছর, তখন পিতামাতা দুজনই মারা গেলেন। আমি ধনী পিতার সন্তান ছিলাম। আব্বাজানের আয়-রোজগার অনেক ছিল। খুব বিলাসিতা করে চলতাম। ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর আগে পুরানদখত ইরানি সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন। একবার তিনি সায়েরজান এলেন। আমি তাঁকে তার মর্যাদা অনুপাত স্বাগত জানালাম। তাঁর জন্য লোকালয়ের বাইরে তাঁবুর নগরী তৈরি করলাম এবং যথাযোগ্য আপ্যায়ন করলাম।

পুরানদখত মহিলা ছিলেন বটে; কিন্তু ছিলেন অত্যন্ত চতুর, চৌকস ও বিচক্ষণ। তিনি আমাকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করলেন এবং তাঁর উপদেষ্টাদের মধ্যে শামিল করে নিলেন। তাতে আমি খুবই আনন্দিত হলাম।

পুরানদখত-এর ইচ্ছা ছিল, তিনি সায়েরজানে তিনদিন মাত্র অবস্থান করবেন। কিন্তু একে তো স্থানটা ছিল আনন্দদায়ক, তদুপরি আমার সযত্ন আতিথেয়তা তাকে মুগ্ধ করে তুলল। তাই তিনি তিন দিনের স্থলে এক সপ্তাহ অবস্থান করলেন। দূর-দূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিপতিরাও তাঁর সাক্ষাতে আসতে শুরু করল। তিনি যেমন ছিলেন রূপসী, তেমনি ছিলেন যুবতী। কিছু লোক তো এসেছিল সম্পূর্ণ বিনা প্রয়োজনে– শুধু তাঁর চেহারা দেখতে। অনেকে এসেছে আপনজনদের জন্য সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে।

একদিন শারাফের এক অধিপতি এল। মাঝবয়সী পুরুষ। কন্যা গুলনারও তার সঙ্গে ছিল। মেয়েটি অতিশয় রূপসী ছিল। এই অধিপতির নাম ছিল জাওয়াশের। সে সোজা আমার কাছে চলে এল এবং আমারই বাড়িতে এসে ওঠল। আমি তার এত খাতির-যত্ন করলাম যে, লোকটি আমার প্রতি কৃতজ্ঞতাভারে নুয়ে পড়ল। জোশনশাহ্ নামক এক উপদেষ্টার পরামর্শে পুরানদখত তার জমিদারির কিছু অংশ জব্দ করে নিল এবং তার পুরো জমিদারিকে একোয়ার করে নিতে চাইল। ঘটনাক্রমে সে-সময় জোশনশাহ পুরানদখত-এর সঙ্গে ছিল না। জাওয়াশের আমার কাছে আবেদন জানাল, আমি যেন সুপারিশ করে তার জমিদারিটা উদ্ধার করে দেই।

জাওয়াশের-এর পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল, আমার সুপারিশে তার কাজ হয়ে যাবে। পুরানদখত যেহেতু আমার প্রতি আন্তরিক ছিলেন, তাই আমিও এমনটিই মনে করতাম। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিলাম, তার আগে জাওয়াশের-এর

সঙ্গে তার মেয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা পাকাপাকি করে নিতে হবে। তাই প্রথম আলাপেই আমি তাকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিলাম না।

বাস্তব কথা হলো, কদিনে গুলনারের প্রতি আমার এমন প্রীতি-ভালবাসা জন্মে গেছে যে, তাকে ছাড়া আমার বেঁচে থাকা কঠিন মনে হচ্ছিল।

আমিও যুবক ছিলাম এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলাম। গুলনার প্রায়ই আমার কাছে এসে বসত এবং হেসে-হেসে কথা বলত।

একদিন সে আমার কাছে এল এবং বলল, তুমি তো আব্বাজানের জায়গিরের ব্যাপারে সুপারিশটা করলে না!

আমি তার চাঁদসুন্দর মুখের প্রতি তাকিয়ে বললাম, তুমি তো সে-ব্যাপারে আমাকে কোনো আদেশ করনি।

গুলনার টানাটানা ডাগর চোখ দুটো তুলে আমার প্রতি তাকিয়ে বলল, আব্বাজান তো বলেছিলেন।

আমি বললাম, হ্যাঁ, বলেছিলেন বটে; কিন্তু...।

সে বলল, কিন্তু কী?

আমি বললাম, আমি তোমার আদেশের অপেক্ষায় ছিলাম।

গুলনার বলল, কেন? আমার অপেক্ষা কেন?

আমি বললাম, তুমি কি বিষয়টা সাফ-সাফ শুনতে চাও?

গুলনার সরল কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ।

আমি বললাম, শোনো গুলনার, সত্য ও বাস্তব কথা হলো, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি। তোমার আদেশ পালনে আমি খুব আনন্দ অনুভব করব।

গুলনার হেসে ফেলল। বলল, এ তো আমি প্রথম দিনই বুঝে ফেলেছি।

আমি বললাম, বুঝবারই কথা। এবার বলো, তুমি আমাকে ভালবাস কি-না।

গুলনার বলল, না-ই যদি হবে, তা হলে তোমার সঙ্গে আমি এত তাড়াতাড়ি এত অকৃত্রিম হলাম কীভাবে?

তার এই উত্তর শুনে আমি যারপরনাই প্রীত ও আনন্দিত হলাম। বললাম, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তোমার পিতার জমিদারি তার হাতে ফিরে আসবে। কিন্তু বলো, আমি তোমাকে পাব কীভাবে?

গুলনার বলল, আব্বাজানও তোমাকে খুব পছন্দ করেন। তুমি তার জমিদারি ফিরে পাওয়ার আদেশ জারি করাও। তারপর তার কাছে প্রস্তাব নিয়ে যাও।

আমি সঙ্গে-সঙ্গে পুরানদখত-এর নিকট যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। ঘটনাক্রমে ইতিমধ্যে জাওয়াশেরও এসে পড়ল। জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে?

আমি বললাম, আপনার জমিদারির ব্যাপারে আলাপ করতে পুরানদখত-এর কাছে।

তিনি বললেন, যাও, আমি তোমাকে পুত্রের মতো মনে করি।

প্রত্যুত্তরে অলক্ষ্যে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আপনি আমাকে আপনার পবিারভুক্ত করে নেবেন।

জাওয়াশের বললেন, অবশ্যই। তোমাকে প্রথমবার দেখেই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।

আমি তার কৃতজ্ঞতা আদায় করে পুরানদখত-এর নিকট চলে গেলাম। তার কাছে জোরালো ভাষায় সুপারিশ করলাম। তিনি আমার সুপারিশ গ্রহণ করে নিলেন এবং তৎক্ষণাৎ জাওয়শেরের জমিদারি প্রত্যার্পণের আদেশ জারি করে দিলেন। আমি জাওয়াশেরকে ডেকে পুরানদখত-এর সামনে হাজির করলাম। পুরানদখত জমিদারি প্রত্যার্পণের আদেশনামা তার হাতে তুলে দিলেন। জাওয়াশের অতিশয় আনন্দিত হলেন।

এক সপ্তাহ বেড়ানোর পর পুরানদখত চলে গেলেন। জাওয়াশেরও গুলনারকে নিয়ে চলে গেল। আমি গুলনারের বিরহে কাতর হয়ে ওঠলাম। তার স্মরণ আমাকে কষ্ট দিতে শুরু করল।

দিনকয়েক পর আমি শারাফ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এমন সময় সায়েরজানের দূত বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসে হাজির হলো। আমার আনন্দের সীমা রইল না। বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক হলো। আমি কাঙ্খিত দিনটির অপেক্ষায় প্রহর গুণতে লাগলাম এবং বিয়ের প্রস্তুতি শুরু করে দিলাম।

কিন্তু হঠাৎ একদিন জোশনশাহর দূত এসে আমাকে ধমকাতে শুরু করল। বলল, গুলনারের ভাবনা ছেড়ে দাও; ওকে আমি বিয়ে করব।

জোশনশাহ বৃদ্ধ মানুষ। গুলনার তার নাতনির বয়সের মেয়ে। আমার খুব রাগ ওঠল যে, কবরে পা ঝুলিয়ে বসে আছে আর নাতনির বয়সী একটি মেয়েকে বিয়ে করার সখ দেখাচ্ছে। তবে আমি এ-ও জানতাম, লোকটির অনেক দাপট ও প্রতাপ আছে এবং সম্রাটের বিশেষ সহচর। আমাকে ও জাওয়াশেরকে দেখে নেওয়া তার পক্ষে কঠিন কিছু নয়। ইচ্ছে করলে

গুলনারকে জোরপূর্বক তুলে নেওয়ার শক্তিও তার আছে। পাশাপাশি এতে আশঙ্কাও জাগল যে, লোকটি জাওয়াশেরকেও হুমকি দিতে পারে, যার ফলে বাধ্য হয়ে তিনি গুলনারকে তার হাতে তুলে দিতে পারেন। এই চিন্তায় আমি অস্থির হয়ে ওঠলাম। কিন্তু পরদিনই জাওয়াশের গুলনারকে নিয়ে এসে হাজির হলেন। নির্ধারিত তারিখের আগেই আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।

আমি খুবই আনন্দিত হলাম এবং সুখে-শান্তিতে দিনযাপন করতে লাগলাম। আমাদের জীবন এত সুখময় হয়ে উঠল যে, কখন দিন এল আর কখন রাত এল টেরই পেতাম না। এবার আমি বুঝলাম, গুলনার আমাকে ভালইবাসত না, আমার জন্য পাগলপারাও ছিল।

একদিন শারাফ থেকে দূত এসে সংবাদ জানাল, পুলিশ জাওয়াশেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। এই অপ্রীতিকর সংবাদে আমরা যারপরনাই ব্যথিত হলাম। আমাদের সুখ-শান্তি মুহূর্তমধ্যে উবে গেল। গুলনার কাঁদতে শুরু করল। আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম এবং আশ্বস্ত করলাম, মাদায়েন গিয়েই আমি তোমার বাবাকে ছাড়িয়ে আনব।

আমি পরদিনই মাদায়েনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম। আমার পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা ছিল, পুরানদখত আমার সুপারিশে জাওয়াশেরকে অবশ্যই মুক্ত করে দেবেন। কিন্তু মাদায়েন পৌঁছে জানতে পারলাম, পুরানদখত ক্ষমতাচ্যুত হয়ে গেছেন এবং ইয়ায্‌দাজার্‌দ সিংহাসন দখল করেছেন। আমি মনে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলাম। আমার সব আশা-ভরসা ধূলিসাত হয়ে গেল। চিন্তায় চোখের ঘুম উড়ে গেল। রাতে এক মুহূর্তের জন্যও দু-চোখের পাতা এক করতে পারলাম না।

পরদিন খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, পুরানদখতের ক্ষমতাচ্যুতির পেছনে জোশনশাহর হাত ছিল এবং ঘটনাটি ঘটেছে গুলনারকে কেন্দ্র করে। আমি সব বুঝে ফেললাম। কিন্তু তথাপি কয়েকজন দরবারি ও উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং কথা বললাম। আমি দেখলাম, লোকগুলো পুরোপুরি বদলে গেছে। এমন হয়ে গেছে, যেন আমার সঙ্গে তাদের কোনোদিনই কোনো আলাপ-পরিচয় ছিল না। আমি ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করলাম; কিন্তু সফল হলাম না। কয়েক দিন চেষ্টা করার পর আমি ব্যর্থ হয়ে শেরমান ফিরে এলাম। এসেই আমাকে এমন একটি বেদনাদায়ক সংবাদ শুনতে হলো, যা শুনবার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমার ভৃত্য-কর্মচারীরা জানাল, তিন দিন আগে

একজন দূত এসে আপনার গ্রেফতারির সংবাদ শুনিয়ে ম্যাডামকে বলল, আপনি তাকে যেতে বলেছেন। পিতার ঘটনায় তিনি এমনিতেই দুঃখভারাক্রান্ত ছিলেন। তার উপর এই সংবাদে আরও ব্যথিত হয়ে ওঠলেন। অবশেষে তিনি উক্ত দূতের সঙ্গে চলে গেছেন।

এমন একটি দুঃখজনক সংবাদ শুনে আমি চৈতন্য হারিয়ে ফেলার উপক্রম হলাম। সারাটা রাত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কাটালাম। সকাল হতেই আবার মাদায়েনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম। সেখানে পৌঁছেই সোজা জোশনশাহর বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। গুলনার ওখানেই ছিল। আমাকে দেখেই আমার মনের মানুষটি ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি তাকে বললাম, চলো। ঠিক তখন জোশনশাহও লোকজন নিয়ে এসে গুলনারকে উদ্দেশ করে বলল, চলো।

জোশনশাহ তার লোকদের ইশারা দিতেই তারা গুলনারকে আমার থেকে আলাদা করে ফেলল। তারা আমাকে এলোপাতাড়ি বেদম প্রহার করতে শুরু করল। পিটিয়ে তারা আমার গায়ের চামড়া ছিলে ফেলল। আমি চৈতন্য হারিয়ে ফেললাম।

রাতে যখন আমার সংজ্ঞা ফিরে এল, তখন দেখলাম, আমি কোনো একটি কুঠুরিতে পড়ে আছি। আমি অনুভব করলাম, আমার শরীরের প্রতিটি জোড়া ব্যথা করছে। রাতটা আমি নিরতিশয় অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কাটালাম।

ভোর হতেই উঠে কোনোমতো পা টেনে-টেনে রাজপ্রাসাদে গিয়ে পৌঁছুলাম। দরবারিদের বখরা দিলাম। তারা আমাকে ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর কাছে পৌঁছিয়ে দিল। আমি কেঁদে-কেঁদে আমার দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনের কাহিনী শোনালাম। তিনি খুব প্রভাবিত হলেন। তিনি তখনই জোশনশাহকে ডেকে পাঠালেন। সে গুলনারকেসহ এসে হাজির হলো। দুজন নির্জনে কথা বললেন। ফল উলটো ফলল। ইয়ায্‌দাজার্‌দই জানেন জোশনশাহ সম্রাটকে কী বোঝাল যে, কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসেই তিনি আমাকে গালাগাল করতে শুরু করলেন এবং ভৃত্যদের আদেশ দিলেন, একে বাঘের খাঁচায় ঢুকিয়ে দাও।

ভৃত্যরা আমাকে রাতে একটি বাঘের পিঞ্জিরায় ঢুকিয়ে দিল। আমাকে দেখামাত্র বাঘ হালুম করে ওঠল। কিন্তু বোধহয় সে-সময় তার পেটটা ভরা ছিল; তাই তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করল না। আমি জীবন থেকে নিরাশ হয়ে পড়লাম। আমি হতাশ চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, খাঁচাটির

উপর অংশে কতটুকু ফাঁকা জায়গা আছে। ভাবলাম, যদি ওখানে উঠে বসে থাকি, তাহলে হয়ত রক্ষা পাব। আমি গ্রিল বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করলাম। বাঘ দেখে ফেলল। শিকার হাতছাড়া হয়ে যেতে দেখে প্রাণীটি দাঁড়িয়ে গেল এবং এমন ভয়ানক এক হাঁক দিল যে, আমি কেঁপে ওঠলাম। আমার দেহের রক্তগুলো যেন শুকিয়ে গেল। আমি গায়ের শক্তি হারিয়ে ফেলতে শুরু করলাম। কিন্তু তারপরও আমি সাহস করে চড়তে থাকলাম।

আমার প্রাণটা দেহ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এল। বাঘটা এগিয়ে এসে পাঞ্জা দ্বারা গ্রিলের রড ধরে ঝটকা টান দিল। হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে আমি পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলাম। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখলাম, বাঘটা আমার সোজা নিচে দাঁড়িয়ে লোলুপ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। আমার ভয় বাড়তে থাকল। আমি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করছিলাম, মৃত্যু আমার হাতকয়েক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তবু আমি সাহস হারালাম না এবং গ্রিল বেয়ে উপরে মাচানটার নিকটে পৌঁছে গেলাম। বাঘটা রাগে-ক্ষোভে ও ব্যর্থতায় দাঁত কড়মড় করে হালুম-হালুম করতে লাগল। খাঁচাটির চালে একস্থানে কতটুকু ফাঁক ছিল। আমি সেই ফাঁক দিয়ে চালের উপরে উঠে গেলাম। আমি কিছু সময় চালের উপরে বসে থেকে শক্তি-সাহস সঞ্চয় করে নিলাম। তারপর আরেক দিক দিয়ে নিচে নেমে এলাম।

এখন আমার মাদায়েনে থাকা আর মৃত্যুর মুখে অবস্থান করা সমান কথা। তাই আমি ওখান থেকে চলে এলাম। ভোর পর্যন্ত হাঁটতে থাকলাম। দিনের বেলা একটি বনে লুকিয়ে থাকলাম আর মনে-মনে প্রতিশোধের প্রত্যয় নিলাম। জোশনশাহ ও ইয়ায্দাজার্দকে হাজারও অভিশাপ দিলাম। দুর্বল ও মজলুমদের অভিশাপ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করবার থাকে না।

অবশেষে আমি এই পাহাড়ে এসে আত্মগোপন করলাম। একদিন কূপের পাড়ে দাঁড়িয়ে পানিতে তাকাতে দেখলাম, আমার মাথার সবগুলো চুল সাদা হয়ে গেছে। আমি বুঝে ফেললাম, ভয় ও চিন্তায় চুলগুলো পেকে গেছে।

এই হলো আমার কাহিনী।

ফায়রোজান বলল, সত্যিই আপনার কাহিনী খুবই বেদনাদায়ক। এমন লোকদের পরিণতি এ-ই হওয়া উচিত ছিল। তোমাকে যারা এত অত্যাচার-নির্যাতন করল, আজ তারা ছন্নছাড়া জীবন-যাপন করছে।

মেহেরজান বলল, এখন আমি মানুষ হব। মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হব এবং শত্রু থেকে ভয়ানক প্রতিশোধ নেব।

মেহেরজান উঠে দাঁড়াল। একদিকে হেঁটে চলে গেল। ফায়রোজানও চলে গেল।

ষোলো.

আমের ও তাঁর বাহিনী পাহাড়ের পাদদেশ ত্যাগ করে গন্তব্য অভিমুখে এগোতে শুরু করেছেন। তিনি আহনাফ ইবনে কায়সের বাহিনীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হতে চাচ্ছেন। একস্থানে পৌঁছার পর দেখতে পেলেন, সম্মুখে একটি পাহাড় তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর কোনো পথপ্রদর্শক ছিল না। তারাও কেউ পথ চেনে না।

আমের পাহাড়ের নিচে বনের মধ্যে ছাউনি ফেললেন। সঙ্গীদের আদেশ দিলেন, তোমরা জঙ্গলে ছড়িয়ে যাও এবং খোরাসানের কোনো নাগরিক পেলে ধরে নিয়ে আসো, যাতে তাদের দ্বারা পথের সন্ধান নিতে পারি।

কমান্ডারের আদেশ পেয়ে মুসলমানরা জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ল। কয়েকজন পাহাড়ের উপর উঠে গেল। দিনভর ঘোরাফেরা করে তারা সন্ধ্যায় খালিহাতে ফিরে এল– কাউকে পেল না। রাতটা তারা ওখানেই কাটিয়ে দিল। তারা রাতে খানিক শীত অনুভব করল। তাই তাপের জন্য বিভিন্ন স্থানে আগুন জ্বালাল। সকালে ফজর নামায আদায় করে কিছু লোক জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ল, কিছু জঙ্গলের বাইরে বেরিয়ে গেল। দুপুরের আগমুহূর্তে আরও একশো মুজাহিদ এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। এরা কুফা থেকে এসেছে। এরাও আমেরের ইউনিটের সঙ্গে যোগ দিল। এবার বাহিনীর সাহস আরও বেড়ে গেল। এখন তারা অকুতোভয়। যে-কোনো মুহূর্তে শত্রুর মধ্যে ঢুকে পড়তে তারা প্রস্তুত।

বস্তুত মুসলমান মৃত্যুকে ভয় করে না। তারা আল্লাহ পাকের বিধান জানে, মানুষ যেখানেই থাকুক মৃত্যু তার সময়মতো তাদের ধরবেই। মুসলমান বিশ্বাস করে, মৃত্যুর সময় এসে পড়লে তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো সুযোগ মানুষের থাকে না যদিও তারা দুর্ভেদ্য দুর্গে লুকিয়ে থাকে।

অল্প কজন মুসলিম সৈনিকের আগমনে আমেরের সৈন্যরা যারপরনাই আনন্দিত হলো। তারা মেহমানদের নিয়ে দুপুরের আহার করল। তারা ছিল বিভিন্ন গোত্রের লোক। সবাই টগবগে তরুণ ও যুবক। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে জিহাদে এসেছে।

দুপুরের সময় কয়েকজন মুসলমান দুজন খোরাসানিকে ধরে আনল এবং আমেরের সম্মুখে হাজির করল। আমের এমন একজন মুসলমানকে ডেকে পাঠালেন, যার ফার্সি ভাষা জানা ছিল। তাকে দোভাষী বানিয়ে কথোপকথন শুরু করলেন।

আমের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা?

তারা উত্তর দিল, এখান থেকে খানিক দূরে নিমরোজ নামক একটি লোকালয় আছে। আমরা ওখানকার বাসিন্দা।

তা বসতি ছেড়ে তোমরা এখানে এলে কেন?

আমর ভেড়া-বকরি পালম করি। ঘাস খাওয়ানোর জন্য পশুগুলোকে বনে নিয়ে আসি আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাই। এখন ফিরিয়ে নিতে এসেছি।

তা হলে তো তোমাদের আরও লোকজন এসব বনে থেকে থাকবে।

হ্যাঁ, অনেক রাখাল এখানে আসে। তারা বেশিরভাগ গোলাম হয়ে থাকে। অনেকে বেতন দিয়ে চাকর রাখে। আমরা পালের মালিক। এই মুহূর্তে বহু রাখাল বনে আছে।

কিন্তু আমরা তো কাউকে দেখলাম না।

সম্ভবত আপনাদেরকে দেখে তারা পাহাড়ে উঠে কোথাও লুকিয়ে আছে।

তোমরা কি তবিলনের রাস্তাটা চেন?

হ্যাঁ, চিনি। আমরা প্রায়ই পশুপাল নিয়ে তবিলন যাই।

আমরা তবিলন যাব; কিন্তু পথটা জানা নেই। আমরা চাই, তোমরা আমাদেরকে পথটা দেখিয়ে নিয়ে যাও।

তাতে আমাদের কোনো সমস্যা ছিল না; কিন্তু...।

কিন্তু তোমাদের রাজা ইয়ায্দাজার্দ তোমাদেরকে বারণ করে দিয়েছেন যে, মুসলমানদের পথপ্রদর্শন করো না, না?

ব্যাপার তা নয়। তবিলনের পথে আমাদের কয়েকটি পশুপাল ছড়িয়ে রয়েছে। মুসলমানরা আমাদের ভেড়া-বকরিগুলো ধরে যবাই করে ফেলবে।

এই ভূখণ্ড এখন যুদ্ধকবলিত দেশ। আমরা এই দেশের যে-কোনো বস্তু-সম্পদ ছিনিয়ে নিতে পারি। কিন্তু আমাদেরকে পথপ্রদর্শনের বিনিময়ে আমরা তোমাদের পশুপালগুলোকে রেহাই দেব।

আমরা শুনেছি, মুসলমান প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূর্ণ করে। আপনি যদি আমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, তা হলে আমরা আপনাদের রাহবরি করব এবং তবিলন পৌঁছিয়ে দেব।

এটি আমার ও প্রত্যেক মুসলমানের ওয়াদা। কোনো মুসলমান যখন কারও সঙ্গে কোনো ওয়াদা দেয়, তা হলে সেটি প্রত্যেক মুসলমানের ওয়াদা বলে বিবেচিত হয়।

ঠিক সে-সময় এক মুসলমান অপর একজন খোরাসানিকে ধরে নিয়ে এল। বলল, এই লোকটি একটি পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে অবলোকন করছিল। খুব সম্ভব সে গণনা করছিল, আমাদের ইউনিটে কতজন মুসলমান আছে। আমি দূর থেকে দেখে পা টিপে-টিপে তার কাছে চলে গেলাম। আমি যখন তাকে গ্রেফতার করলাম, তখন সে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। লোকটি গোয়েন্দা।

আমের খানিক রাগত স্বরে বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক; তুমি কি গোয়েন্দা?

এই খোরাসানি আরবি জানে না। কিছু না বোঝায় সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। সে আরও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠল। এই ভয়ে কাঁপতে শুরু করল যে, মুসলমানরা তাকে মেরে ফেলে কি-না।

আমের ফার্সিজানা আরব লোকটিকে বললেন, একে জিজ্ঞেস করো, এ কে এবং এর কাছে কোনো তথ্য আছে কি-না।

দোভাষীর মাধ্যমে তার সঙ্গে কথোপকথন শুরু হলো। খোরাসানি বলল, আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। আপনি যদি আমাকে জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করেন, তা হলে সেই তথ্য আপনাকে বলে দেব।

তুমি যদি সঠিক তথ্য প্রদান কর, তাহলে ওয়াদা দিচ্ছি, আমি তোমাকে ছেড়ে দেব। কিন্তু যদি ভুল তথ্য দাও, তা হলে অবশ্যই মেরে ফেলব।

পবিত্র আগুনের কসম, আমি সত্য বলব।

সে-যুগে ইরানের সকল মানুষ আগুনের পুজারি ছিল। অনেকে আগুনের সঙ্গে তারকাপূজাও করত। তাদেরকে বলা হতো মজুসি। তারা দুই খোদায় বিশ্বাসী ছিল। একজনের নাম আহরামান, যাকে অকল্যাণের খোদা মনে করা হতো। একজনের নাম ইয়ায্দান, যাকে কল্যাণের খোদা বলা হতো।

আমের বললেন, সত্য বললে আমি তোমাকে ছেড়ে দেব। বলো, তোমার কাছে কী তথ্য আছে?

খোরাসানি বলল, আমি গোয়েন্দা নই– রাখাল। আপনাদেরকে দেখে আমি আমার পশুগুলোকে গোপন স্থানে হাঁকিয়ে দিয়ে আপনাদের তথ্য জানতে এসেছি। ইয়ায্দাজার্দ-এর এক সহচরের নাম খোরযাদ। তিনি

বাহিনী নিয়ে এসে পড়েছেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আরবদের দেখেছ? আমি তাঁকে আপনাদের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, দেখে আসো তো তাদের সংখ্যা কত? তাই আমি একটি পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে আপনাদের সংখ্যা অনুমান করছিলাম। সেই অবস্থায় আপনার লোক আমাকে ধরে নিয়ে এল।

খোরযাদের সঙ্গে কতজন সৈন্য আছে?

দুই হাজার বা তার চেয়ে কিছু বেশি হবে।

বাহিনীটি আমাদের থেকে কত দূরে আছে?

একেবারে কাছে। এই যে সম্মুখে কতগুলো টিলা-টিপি দেখা যাচ্ছে, এগুলোই তাদের ও আপনাদের মাঝে প্রতিবন্ধক।

খোরাসানি টিলাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল। আমের সেদিকে চোখ তুলে তাকালেন। তিনি দেখলেন, মজুসি বাহিনী পাহাড় থেকে নিচে অবতরণ করছে। সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, ওহে মজুসি, তুমি সঠিক তথ্য দিয়েছ; আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম।

তখনই আমের দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন, ওহে মুসলিম সৈনিকরা, তোমরা আপন-আপন অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যাও। শত্রুবাহিনী এগিয়ে আসছে। আমি ওদের প্রতিহত করব।

মুসলিম সৈনিকরা ঝটপট অস্ত্রসজ্জিত হয়ে গেল।

সতেরো.

ফায়রোজান মেহেরজানকে সত্যিই বলেছিল যে, খোরযাদ বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে। পাহাড়ের উপর এই যে বাহিনীটি আত্মপ্রকাশ করল, এটিই খোরযাদ-এর বাহিনী। খোরযাদ ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর সহচর ও বড় মাপের একজন জাগিরদার। সকল দরবারি তাকে সমীহ করে চলে। নিজের বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য তার বেজায় দম্ভ ছিল। ছিলও খুব দুঃসাহসী ও নির্ভীক। ইয়ায্‌দাজারদকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিল, সে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে-করে তাদেরকে অস্থির করে তুলবে, যাতে তার আক্রমণ-অভিযানে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলমানরা খোরাসান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

বিপরীতে ইয়ায্‌দাজার্‌দও তাকে ওয়াদা দিয়েছিলেন, যদি সে মুসলমানদেরকে খোরাসান থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়, তাহলে

আপন ছোট শাহজাদিকে তার কাছে বিয়ে দেবেন। এই শাহজাদি মেয়েটি ছিল অত্যন্ত রূপসী। রূপের কারণে তার নামটা ভুলে গিয়ে তাঁকে 'রূপকন্যা' বলেই ডাকত সবাই। খোরযাদ তার প্রতি আসক্ত ছিল।

কিন্তু যখন সে কাশান ও তবিলনের মাঝামাঝি স্থানে গিয়ে পৌঁছুল এবং আহনাফ ইবনে কায়স-এর বাহিনীকে দেখল, তখন তার সাহস পানি হয়ে গেল। ফলে ইসলামের বীর সৈনিকদের উপর আক্রমণ করা ও গেরিলা হামলা চালানো তার পক্ষে সম্ভব হলো না। সে পাহাড়ের পেছনে গিয়ে লুকিয়ে থাকল।

কিন্তু এবার যখন আমের-এর সেনা-ইউনিটটিকে দেখল, তখন তাদের সংখ্যার স্বল্পতা অনুভব করে আক্রমণের প্রস্তুতি নিল। তার সঙ্গে দু-হাজারেরও বেশি সৈন্য ছিল। পক্ষান্তরে মুসলমানদের সেনাসংখ্যা মাত্র তিনশো পঞ্চাশ।

মজুসি দ্রুতপায়ে পাহাড় থেকে অবতরণ করছিল। সে চাচ্ছিল, মুসলমানরা সতর্ক হয়ে অস্ত্রসজ্জিত হওয়ার আগেই তাদের অবস্থানের জায়গায় পৌঁছে গিয়ে আক্রমণ করবে এবং তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে-না-হতেই তাদের নিঃশেষ করে ফেলবে।

সে-যুগের মুসলমানরা সৈনিকের জীবন-যাপন করত। তাদের হাতে সব সময় অস্ত্র থাকত। যদি কখনও অস্ত্র খুলে রাখতে হতো, তখনও এত সতর্ক ও চৌকস থাকত, যাতে প্রয়োজনের সময় কয়েক মিনিটের মধ্যে সশস্ত্র হয়ে যেতে পারে।

আমেরের বাহিনী অত্যল্প সময়ের মধ্যে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ছাউনির সেই দিকটিতে সমবেত হতে লাগল, যেদিক থেকে মজুসিরা আসছিল।

মজুসি সৈনিকরা দ্রুতপায়ে পাহাড় থেকে অবতরণ করছিল এবং খানিক দূরে মাঠে গিয়ে সমবেত হতে শুরু করল। খোরযাদের পরিধানে রেশমি পোশাক। গায়ে সোনা-জহরতের অলংকার। মাথায় হিরা-জহরতখচিত সোনার মুকুট। তার ঘোড়ার সাজ-সরঞ্জামও সোনা-রুপার তৈরী। তার ঠাঁট-বাট অন্য সকলের চেয়ে আলাদা। দূর থেকে দেখেই বোঝা যায়, ইনিই এই বাহিনীর সেনাপতি। বাহিনীর সম্মুখভাগের অংশটির সঙ্গে সেও ময়দানে নেমে এল।

বিপরীতে আমেরও তাঁর বাহিনীর কাছে পৌঁছে গেলেন। তিনি মুসলিম সৈনিকদের উদ্দেশ করে বললেন, ইসলামের বীর সৈনিকগণ, যেসব মজুসি এখনও পাহাড়ের উপর রয়েছে, তাদের উপর তির ছোঁড়।

কমান্ডারের আদেশ শোনামাত্র মুসলমানরা দ্রুত কাঁধের ধনুকগুলো হাতে নিয়ে নিল এবং তূনীর থেকে তির বের করল। তারা ধনুকে তির সংযোজন করে ছুঁড়তে শুরু করল। দেখতে-না-দেখতে তিরের বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। পাহাড়ের উপর থেকে যেসব মজুসি নিচে অবতরণ করছিল, এই তির তাদের মাথা ও বুকে গিয়ে বিদ্ধ হলো। বহু শত্রুসেনা আহত হয়ে চিৎকার জুড়ে দিল এবং পাহাড় থেকে নিচে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

তাদের নিকটবর্তী সৈন্যরা যখন সঙ্গীদেরকে আক্রান্ত হতে ও চিৎকার করতে দেখল, তখন তারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং পালটা আক্রমণের জন্য হাতে নিল। কিন্তু তাতে তির সংযোজন করতে-না-করতেই মুসলমানরা দ্বিতীয়বারের মতো তির ছুঁড়ল। তাতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে বহু মজুসি আর্তচিৎকার জুড়ে দিল এবং হুমড়ি খেয়ে-খেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

খোরযাদ মোড় ঘুরিয়ে দেখল। মুসলমানদের প্রতি তার ক্ষোভ আরও বেড়ে গেল। সে তার সৈনিকদেরকে উদ্দেশ করে বলল, ইরানি সিংহরা, হিংস্র আরবরা তোমাদের ভাইদেরকে তিরের আঘাতে হতাহত করছে। তাদের প্রতিশোধ নিতে তোমরা বীরত্বের সঙ্গে আক্রমণ চালাও এবং একজন আরবকেও জীবিত পালাতে দিয়ো না।

সঙ্গীদের শোচনীয় পরিণতি দেখে মজুসিরা নিজেরাও ক্ষোভের আগুনে জ্বলছিল। তারা স্রোতের মতো মুসলমানদের দিকে ধেয়ে গেল। তাদের বান এত তীব্রবেগে ছুটে গেল, যেন এই স্রোত মুসলমানদেরকে খড়ের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আমের যখন শত্রুবাহিনীকে ধেয়ে আসতে দেখলেন, তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে বললেন

'ইসলামের সৈনিকগণ, মজুসিরা তোমাদের সংখ্যা কম দেখে তোমাদের উপর আক্রমণ করতে ছুটে আসছে। তোমরা ধনুকগুলো কাঁধে ঝুলিয়ে নাও আর বর্শাগুলো হাতে নিয়ে শক্তপায়ে নিজ-নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকো। ভেবো না, শত্রুর সংখ্যা বেশি। তোমরা এর চেয়েও বেশিসংখ্যক শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হয়েছ। সংখ্যার আধিক্যের সঙ্গে বীরত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা রাখো এবং মৃত্যুকে উপেক্ষা করে যুদ্ধ চালিয়ে যাও। মহান আল্লাহ বেশিসংখ্যক লোকের উপর কমসংখ্যক লোককে জয়ী করার ক্ষমতা রাখেন।

'আল্লাহ তোমাদের দেখছেন। তোমাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত রাখা হয়েছে। হুররা তোমাদের স্বাগত জানাতে জান্নাতের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে

আছে। তোমরা শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো এবং তাদের সারিগুলো ছিন্নভিন্ন করে দাও। তাদেরকে তোমাদের তরবারির ক্ষমতা দেখাও। আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ো।'

বক্তব্য শেষ করেই আমের তিনবার আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিলেন। তৃতীয় ধ্বনির জবাবে মুসলমানরাও আকাশ-বাতাস মুখরিত করে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলল।

এতক্ষণে মজুসিরা মুসলমানদের নিকটে এসে পৌঁছে গেছে। তারা তরবারি উঁচিয়ে এমনভাবে ছুটে এসেছে যেন, এসেই আক্রমণ চালিয়ে মুসলমানদেরকে খতম করে ফেলবে। তাদের ঊর্ধ্বে তুলে-ধরা খাপখোলা তরবারিগুলোর ধেয়ে আসার দৃশ্যটি ছিল খুবই ভয়ানক।

কিন্তু মুসলমানদের উপর এর কোনোই ক্রিয়া পড়ল না। যেইমাত্র তারা চলে এল, অমনি মুসলমানরা উচ্চৈঃস্বরে তাকবির ধ্বনি তুলে উলটো তাদের উপর বর্শার আক্রমণ চালাল। আক্রমণটা এত তীব্র হলো যে, ধেয়ে-আসা-বাহিনীটি না শুধু থমকেই দাঁড়াল বরং তাদের বহু লোক আহত হয়ে লুটিয়ে পড়ল। অসংখ্য মজুসি সৈনিক মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল।

মজুসিরা অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিয়ে মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সচেষ্ট হলো। তারা তরবারি দ্বারা বর্শার আক্রমণ ঠেকানোর চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু মুসলমানরা বর্শার আঘাতে তাদের ঝাঁজরা করে দিল। আহতরা মাটিতে পড়ে কাতরাতে ও চিৎকার করতে লাগল।

মজুসিরা যখন দেখল যে, মুসলমানদের বর্শা তাদের খুব ক্ষতিসাধন করছে, তখন তারাও বর্শা বের করে নিল এবং অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে আক্রমণ করল। বর্শায়-বর্শায় সংঘাত শুরু হলো। দুই বর্শার আঘাতে আগুনের ফুলকি নির্গত হতে শুরু করল। উভয় পক্ষই আহত হতে লাগল। মুসলমানরাও মজুসিদের বর্শার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

মুসলমানদের জোশ বেড়ে গেল। তারা বর্শা ফেলে দিয়ে তরবারি হাতে নিয়ে তীব্রতার সঙ্গে আক্রমণ চালাল। মজুসিরা বর্শা দ্বারা তার মোকাবেলা করল। মুসলমানরা তরবারি দ্বারা বহু মজুসির বর্শা কেটে ফেলল।

মজুসিরা ঘাবড়ে গেল। তারাও বর্শা ফেলে দিয়ে তরবারি হাতে নিল এবং আক্রমণ চালাল। তারা চিৎকার করতে-করতে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু মুসলমানরা আক্রমণের তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দিল। আবেগতাড়িত হয়ে যেসব মজুসি সম্মুখে এগিয়ে গেল, মুসলমানরা তাদেরকে আহত করে পেছনে সরে যেতে বাধ্য করল।

মজুসিরা ধারণা করেছিল, মুসলমানরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। তাই আক্রান্ত হওয়ামাত্র তারা ধরাশায়ী হয়ে যাবে। কিন্তু যখন মুসলমানরা কল্পনাতীত বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে তাদের মোকাবেলা করল এবং তরবারি চালিয়ে তাদের হত্যা করতে শুরু করল, তখন তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল এবং বুঝে ফেলল, মুসলমানদেরকে সহজে কুপোকাত করা সম্ভব নয়।

ইরানিরা সংখ্যায় মুসলমানদের কয়েক গুণ বেশি ছিল। তাই তারা নিশ্চিত ছিল যে, মুসলমানরা অনায়াসে খতম হয়ে যাবে। কিন্তু এখন মুসলমানরা যে-শান আর বীরত্বের সঙ্গে লড়ছে, তাতে তারা বুঝে নিল যে, মুসলমানরা অন্তত নিজেদের সমানসংখ্যক শত্রুসেনাকে হত্যা না করে পরাজয় বরণ করবে না।

ইরানিরা জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল না। তাই তারা পিছু হটতে শুরু করল।

খোরযাদ তার সৈনিকদের কাপুরুষতা দেখে হুংকার ছেড়ে বলল, ইরানি সিংহরা, এই মুসলমানরা তোমাদেরকে দাস আর তোমাদের নারীদেরকে দাসী বানাতে এসেছে। তোমরা আত্মমর্যাদার পরিচয় দাও। ওদেরকে শেষ করে ফেলো।

খোরযাদের ভাষণে মজুসিদের মনে আত্মমর্যাদা জেগে ওঠল। সাহস সঞ্চয় করে তারা জোরদার আক্রমণ চালাল। মুসলমানরা দৃঢ়তা ও বীরত্বের সঙ্গে তাদের মোকাবেলা করল। তারপর পালটা আক্রমণ চালিয়ে মজুসিদের সারির মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং পরম সাহসিকতা ও বীরত্বের সঙ্গে তরবারি চালাতে লাগল। তারা মজুসি সৈনিকদের মেরে-কেটে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

মুসলমানরা নিরতিশয় উদ্দীপনা ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করছিল। তাদের তরবারিগুলো দক্ষতার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছিল। শত্রুসেনাদের যাকেই আঘাত হানছে, সে-ই নিহত কিংবা আহত হচ্ছে।

মজুসিরাও মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারাও উদ্দীপ্ত হয়ে আক্রমণ করছিল। কিন্তু মুসলমানরা তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে নিজেদেরকে রক্ষা করছিল। ফলে মুসলমানদের কম ক্ষতি হচ্ছিল আর মজুসিরা একের-পর-এক হতাহত হচ্ছিল।

যেহেতু মজুসিদের সংখ্যা ছিল খুব বেশি। তাই তারা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। সেই তুলনায় মুসলমানের সংখ্যা সামান্য। তাই তাদের পক্ষে বেশি দূর পর্যন্ত ছড়ানোর সম্ভব হয়নি। খোরযাদ যখন দেখল, যুদ্ধ দীর্ঘতার

রূপ ধারণ করছে, তখন তিনি কৌশল হিসেবে বাহিনীর একটি ইউনিটকে মুসলিম মহিলাদের ছাউনির দিকে পাঠিয়ে দিল।

মুসলিম বাহিনীর কমান্ডার আমের বিষয়টি দেখে ফেললেন। সে-সময় সাফওয়ান তাঁর কাছে ছিল। তিনি তাকে বললেন, পঞ্চাশজন মুজাহিদ নিয়ে তুমি মহিলাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করো।

সাফওয়ান চোখ তুলে তাকাল। দেখল, একদল মজুসি সৈন্য তাদের নারীক্যাম্পের দিকে ধেয়ে আসছে। সাফওয়ান অস্থির হয়ে ওঠল এবং পঞ্চাশজন মুজাহিদ নিয়ে দ্রুতগতিতে মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য চলে গেল।

আঠারো.

মুসলিম মহিলারা ছাউনির বাইরে একধারে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখছিল। মুসলমানরা মজুসিদের অভ্যন্তরে ঢুকে গিয়েছিল। মজুসিরা হই-হুল্লোড় করছিল। তরবারিগুলো উত্তোলিত হচ্ছিল ও কাজ করে যাচ্ছিল। এক-একটি মাথা কেটে-কেটে ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। মুসলিম মহিলারা বুঝতে পারছিল না, কারা জয়লাভ করছে– মুসলমান, না মজুসি।

মহিলাদের মধ্যে যে-কজন তরুণী-যুবতী ছিল, উদ্দীপনায় তাদের মুখমণ্ডল লাল হয়ে ওঠছিল। তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদগ্রীব হয়ে ওঠল। সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ ও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে আফীরা। সে এক মেয়েকে উদ্দেশ করে বলল, বলো সালমা, তোমার ইচ্ছা কী?

সালমা বলল, তোমার মুখ দেখে আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। আমি দেখতে পাচ্ছি, আমাদের সব কটি মেয়েই চরমভাবে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত। কিন্তু এখনও সেই সময়টি আসেনি যে, আমরা মেয়েরা যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপ দেব। ওই দেখো না, আমাদের পুরুষ যোদ্ধারা কীরূপ দৃঢ়তা ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করছে। আল্লাহ না করুন, যদি তারা পিছপা হতে শুরু করে, তাহলে ইশাআল্লাহ আমরা ইয়ারমুক যুদ্ধের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেব।

আফীরা কিছু বলতে চাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ দেখল, মজুসি সৈন্যরা তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। সে বলল, আল্লাহ মঙ্গল করুন, ওরা তো এদিকেই ছুটে আসছে!

সালমাও দেখছিল। ক্যাম্পের সকল নারী দেখল, একদল ইরানি সৈন্য তাদের ক্যাম্পের দিকে ছুটে আসছে। সালমা বলল, হ্যাঁ, মজুসিরা আমাদের দিকেই আসছে। এবার আমাদেরকে নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্যান্য নারীরাও কানাঘুষা শুরু করে দিল। মজুসিরা দ্রুতগতিতে তাদের দিকে ছুটে আসছে। আফীরার হৃদয়সাগরে জোশ এল। সে তাকবীরধ্বনি দিয়ে ওঠল। বলল, ওহে আদনান গোত্রের নারীগণ, মজুসিরা তোমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ওরা মনে করছে, আমরা অবলা নারী আর অবুঝ কিশোরী যে, ওদের তরবারি দেখলে আমরা ভয় পেয়ে যাব। কিন্তু ওরা জানে না, আমরা আরবকন্যা। ওরা জানে না, আমরা মরতে জানি- ডরতে জানি না। তোমরা নিজেদের সম্ভ্রম ও ইসলামের মর্যাদা রক্ষার খাতিরে হাতে অস্ত্র তুলে নাও এবং তরবারি ও খঞ্জরের আগা দ্বারা দুশমনদের স্বাগত জানাও।

ক্যাম্পের সকল নারী সক্রিয় হয়ে ওঠল। তারা যার-যার অস্ত্র হাতে তুলে নিল এবং নির্ভীক চিত্তে মারতে ও মরতে প্রস্তুত হয়ে গেল।

মজুসিরা দ্রুতগতিতে এগিয়ে নারীক্যাম্পের নিকটে চলে এল। তাদের পরিকল্পনা ছিল, এসেই তারা প্রথমে ক্যাম্পটি ঘিরে ফেলবে। কিন্তু তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগে-আগেই ক্যাম্পের বীরাঙ্গণা মহিলারা খঞ্জর ও তরবারি দ্বারা তাদের উপর আক্রমণ করে বসল এবং প্রথম আক্রমণেই কয়েকজন মজুসিকে আহত করে ফেলল। মজুসিরা তাদের বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখে হতবাক্ হয়ে গেল।

আফীরা কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করল-

'ওহে অগ্নিপূজক শেয়ালের দল, আমরা আদনান বংশের নারী। আমরা ইসলামের সৈনিক। তোমরা আমাদের থেকে দূরে সরে যাও। অন্যথায় আমরা তোমাদেরকে ছিঁড়ে ফেলব।'

আফীরা ও অন্য সকল নারী উদ্দীপ্ত হয়ে পুনর্বার আক্রমণ করল এবং এবারকার আক্রমণও সফল হলো। এবারও তাদের আক্রমণে বহু শত্রুসেনা আহত হলো।

এই মজুসি সেনা-ইউনিটটির কমান্ডার হলো ফায়রোজান। সে আফীরাকে উদ্দেশ করে বলল, ওহে আরবের চাঁদ, তোমার মতো দুহিতাদের কাজ যুদ্ধ করা নয়। তোমরা পুরুষের চোখে ও হৃদয়ে বাস করবার মতো নারী।

আফীরা ফায়রোজানের কথা বুঝল না। সে খঞ্জর হাতে নিয়ে তার দিকে ছুটে গেল।

ঠিক তখন এক দিকে থেকে আল্লাহু আকবার ধ্বনি ভেসে এল। সাফওয়ান পঞ্চাশজন সৈন্য নিয়ে মেয়েদের সাহায্যে এসে পৌঁছেছে। তারা মজুসিদের উপর এইজন্য ক্ষুব্ধ যে, লোকগুলো পুরুষদের ছেড়ে মহিলাদের

উপর আক্রমণ করতে এসেছে। সাফওয়ান এসেই জোরদার আক্রমণ চালিয়ে নির্বিচারে মজুসিদের হত্যা করতে লাগল।

মজুসিদের এই ইউনিটটিতে আড়াইশো সৈনিক ছিল। তাদের মোকাবেলায় মুসলমানরা এক-পঞ্চমাংশ। কিন্তু এই ক্ষুদ্র বাহিনীটি মজুসিদের উপর এমন জোরদার আক্রমণ চালাল যে, তারা প্রতিরোধ লড়াই লড়তে বাধ্য হলো। সংহারী আক্রমণের সাহসই পেল না।

আফীরা ফায়রোজানের উপর আক্রমণ করল। ফায়রোজান তরবারি দ্বারা আফীরার খঞ্জরের আঘাত প্রতিহত করল। সে তরবারি দ্বারা খঞ্জরটি দ্বিখণ্ডিত করার চেষ্টা করল। আফীরা বিষয়টি বুঝে ফেলল। সে দ্রুততার সঙ্গে ফায়রোজানের প্রতি এগিয়ে গেল। ফায়রোজান সঙ্গে-সঙ্গে পেছনে সরে গেল। বলল, আরব দুহিতা, অথচ এমন শক্ত বাহু!

কয়েকজন সৈনিক আফীরা ও ফায়রোজানের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল। কিন্তু আফীরা ক্ষ্যাপা সিংহীর রূপ ধারণ করে এক সৈনিকের উপর আক্রমণ করল এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার বুকে খঞ্জর সেঁধিয়ে দিল যে, লোকটি আক্রমণ কিংবা আত্মরক্ষা কোনেটিরই সুযোগ পেল না। লোকটি দীর্ঘ এক আর্তচিৎকার দিয়ে লুটিয়ে পড়ল। আফীরা দ্রুত খঞ্জরটা বের করে আনল।

অন্যান্য নারীরাও অনবরত আক্রমণ চালাতে থাকল। যেহেতু সাফওয়ান ও তার সঙ্গীরা এসে পড়েছিল এবং তারা প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল, তাই মজুসি সৈনিকরা মুসলিম নারীদের উপর আক্রমণ করার কোনোই সুযোগ পাচ্ছিল না।

ঘটনাক্রমে সাফওয়ান লড়তে-লড়তে আফীরার কাছে এসে পৌঁছুল। সে দেখল, মেয়েটি জোশ ও জয্বার অগ্নিমূর্তি ধারণ করে আছে। বলল, আফীরা, আমি তোমাকে ও সকল নারীকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এবার তুমি সবাইকে নিয়ে পেছনে সরে যাও।

আফীরা উচ্চকণ্ঠে বলল, ওহে আরব নারীরা, আমাদের পুরুষ সৈনিকরা রণাঙ্গন সামলে নিয়েছেন। এখন আর আমাদের প্রয়োজন নেই। তোমরা পেছনে সরে যাও।

মুসলিম নারীরা একজন-একজন ও দুজন-দুজন করে রণনীতি অনুসারে পেছনে সরে গেল। সাফওয়ান ও তার সঙ্গীরা মজুসিদের কচুকাটা করতে লাগল। তারা শত্রুসেনাদের লাশের সারি বিছিয়ে দিল। লাশের-উপর-লাশ ফেলে দিল।

মজুসি সৈনিকরাও মোমের পুতুল ছিল না। তারাও অতিশয় বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করছিল। কিন্তু যে-জোশ ও জয্বা মুসলমানদের মাঝে ছিল, তা তাদের মাঝে ছিল না। সেজন্য মুসলমানরা হত্যা করছিল আর তারা নিহত হচ্ছিল।

ফায়রোজান দেখল, তার সৈনিকদের সংখ্যা প্রতি মুহূর্তে কমে যাচ্ছে। সে শঙ্কিত হয়ে পড়ল, যদি যুদ্ধের এই ধারা অব্যাহত থাকে, তা হলে তার ইউনিটের একজন সৈনিকও জীবিত থাকবে না। তাই সে রণেভঙ্গ দিয়ে পেছনে সরে যাওয়ার সংকেত দিল। তার ইউনিটের অবশিষ্ট সৈন্যরা পিছু হটতে শুরু করল। মুসলমানরা বুঝে ফেলল, তাদের শত্রুসেনারা পিছপা হচ্ছে। মজুসিরা তাদের মর্যাদা ও সম্ভ্রমে আঘাত হেনেছে। তাই শত্রুসেনাদেরকে নিরাপদে ফিরে যেতে তাদের আত্মমর্যাদা তাদেরকে অনুমতি দিল না। তাই ধাওয়া করে পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদেরকে কচুকাটা করল। একজন মজুসি সৈনিককেও জীবন নিয়ে পালাতে দিল না।

ঊনিশ.

খোরযাদ ও তার সৈনিকদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, গুটিকতক মুসলমানকে পিষে ফেলতে তাদের সময় লাগবে না। সেজন্যই তারা তাদের উপর অতিশয় উদ্দীপনার সঙ্গে আক্রমণ চালিয়েছিল। কিন্তু যখন মুসলমানরা যারপরনাই দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করল এবং মজুসিদের লাশ দ্বারা মাঠ ভরে ফেলল, তখন তারা শিউরে ওঠল। এমন এক পরিস্থিতিতে মুসলিম বাহিনীর কমান্ডার আমের খোরযাদ-এর দিকে ধেয়ে গেলেন। খোরযাদ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে গেল। তার পলায়নে তার সৈনিকরা– যারা আগে থেকেই হীনবল ছিল– পালাতে শুরু করল।

মুসলমানরা তাদেরকে অনায়াসে জীবন রক্ষা করে পালাবার সুযোগ দিতে রাজী ছিল না। তাই তারা তাদের ধাওয়া করল এবং হত্যা করতে থাকল। তারা অনেক দূর পর্যন্ত এই ধাওয়া অব্যাহত রাখল।

মজুসিরা পলায়ন শুরু করেছিল বিশৃঙ্খলভাবে। যদি এখানেও শৃঙ্খলা বজায় রাখত, তাহলে এত ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতো না। একের-পর-এক লাশ পড়তে থাকল। আড়াই হাজার সৈনিকের মধ্যে মাত্র পাঁচশো সৈনিক জীবন নিয়ে পালাতে সক্ষম হলো। প্রাণ হারাল দেড় হাজারেরও বেশি সৈনিক। মুসলমান শহীদ হয়েছে এগারোজন আর আহত হয়েছে

একান্নজন। এর জন্য তারা আল্লাহ্ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করল। তারপর তারা দুশমনের ফেলে-যাওয়া-অস্ত্র ও ঘোড়া ইত্যাদি কুড়োতে ময়দানে ছড়িয়ে পড়ল। নিহতদের মাঝে মৃতের ভান ধরে কোনো মজুসি লুকিয়ে আছে কিনা তা-ও তদন্ত করে দেখল।

সাফওয়ান দেখল, এক স্থানে একজন লোক পড়ে আছে। তার চোখ দুটো খোলা। কিন্তু তাকে দেখেই সে চোখ বন্ধ করে ফেলল। সাফওয়ান লোকটির কাছে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামল এবং খঞ্জর বের করে লোকটির দিকে এগিয়ে গেল। লোকটি হাতজোড় করে আরবিতে বলল, আমাকে দয়া করো।

তুমি কে? সাফওয়ান জিজ্ঞেস করল।

লোকটি উত্তর দিল, আমি খোরাসানি। আমার নাম জামাসপ। আমি জ্যোতিষী। এদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করতে আসিনি। খোরযাদ আমাকে জোর করে এনেছিল। আপনি যদি আমাকে বিশ্বাস করেন আর আমাকে বেঁচে থাকতে দেন, তাহলে হয়ত আপনার অনেক উপকার হবে।

আমি তোমাকে মুক্ত করে দিতে পারি।

আমি মুক্তি চাই না। আমি জ্যোতিষী। আমি আপন বিদ্যা দ্বারা জানতে পেরেছি, সমগ্র ইরান মুসলমানদের দখলে এসে পড়বে। ইয়ায্দাজার্দ নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে। আমি আপনার সঙ্গে থেকে আপনার সেবা করতে চাই।

যদি এই মতলব থাকে যে, আমাদের সঙ্গে থেকে গোয়েন্দাগিরি করবে, তাহলে তোমার পরিণতি ভালো হবে না।

যদি তেমন কোনো প্রমাণ পান, তাহলে আমাকে হত্যা করে ফেলবেন। আমি পবিত্র নক্ষত্রদের শপথ করে বলছি, আমার অন্তরে আপনার মঙ্গল ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

আমি তোমাকে বিশ্বাস করলাম।

আমি এখনই কিছু বলব না। কিন্তু আপনি অতিশীঘ্র জানতে পারবেন, আমি আপনার ও আপনার জাতির জন্য কী করছি।

ওই দেখো, আমাদের কমান্ডার এদিকে আসছেন।

জামাসপ উঠে দাঁড়িয়ে গেল। আমের ওখানে এসে পৌঁছুলেন। জামাসপ তাঁকে সালাম দিল। সাফওয়ান বলল, এই লোকটি জ্যোতিষী। খোরযাদ একে জোরপূর্বক সঙ্গে এনেছে। আমি একে নিরাপত্তা দিয়েছি।

আমের বললেন, তুমি যখন নিরাপত্তা দিয়েছ, আমিও দিলাম। তুমি যেখানে খুশি চলে যেতে পার।

সাফওয়ান বলল, এ আমাদের সঙ্গে থাকতে চায়।

আমের বললেন, যদি সদুদ্দেশ্যে থাকতে চায়, তা হলে আমি একে স্বাগত জানাচ্ছি। আর উদ্দেশ্য যদি খারাপ হয়, তাহলে শুনে রাখো, মুসলমান অত্যন্ত চতুর ও দূরদর্শী। আল্লাহ আমাদেরকে মানুষের ষড়যন্ত্র জানিয়ে দিয়ে থাকেন।

জামাসপ বলল, আমি জানি, মুসলমান ওয়াদা পূরণ করে থাকে। আপনি আমাকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। আমি আপনাকে এই অধিকার দিচ্ছি যে, যদি আপনি আমার কোনো আচরণ আপত্তিকর মনে করেন কিংবা কোনো কারণে আপনার মনে সন্দেহ জাগ্রত হয় যে, আমি গোয়েন্দাগিরি করছি, তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে হত্যা করে ফেলুন।

আমের বললেন, আমি আমাদের বিধান অনুযায়ী কাজ করব। ইসলাম আমাকে এই অনুমতি দেয় না যে, শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে আমি কাউকে শাস্তি দেব। তবে অপরাধের উপযুক্ত প্রমাণ পেলে আমি তোমাকে রেহাই দেব না। যাহোক, এখন তুমি সাফওয়ানের সঙ্গে থাকতে চাইলে আমার পক্ষ থেকে অনুমতি আছে।

জামাসপ বলল, আমি আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করছি।

জামাসপ সাফওয়ানের সঙ্গে চলে গেল। মুসলমানরা রণাঙ্গন থেকে ঘোড়া, অস্ত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র কুড়িয়ে এনে একত্রিত করল। সাফওয়ান জামাসপকে নিয়ে তাঁবুতে চলে গেল। তাকে তাঁবুতে রেখে নিজে নারীক্যাম্পের দিকে গেল। আফীরা তার অপেক্ষা করছিল। এবার তাকে দেখে মুচকি হেসে বলল, এসেছ মুজাহিদ সাহেব?

এসেছি। এসেছি বলেই তো রক্ষা পেয়েছ। অন্যথায়...।

অন্যথায় কী হতো?

কী হতো? সেই জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হতো, যে বলেছিল, তুমি কোনো এক পাহাড়ি অঞ্চলে অপহৃতা হবে। কোনো ইরানি তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

ও তুমি এখনও স্বপ্নে ওসব দেখছ! আচ্ছা, দেখতে থাকো।

তা-ই যদি ঘটত, তা হলে আমি অস্থির হয়ে উঠতাম এবং সবকিছু ভুলে গিয়ে তোমার অনুসন্ধানে নেমে পড়তাম।

আফীরা চমৎকার একটা হাসি দিল। তার শুভ্র দন্তরাজির চমক থেকে বিদ্যুত ঝিলিক দিয়ে ওঠল। বলল, ওহ হো, তা তো বটেই। বীর-বাহাদুরদের কাজই তো এই।

আচ্ছা, আমার বীরত্বে কি তোমার এখনও সন্দেহ আছে?

আফীরা মুচকি হেসে বলল, একদম না।

সাফওয়ান নিজের ডান হাতটা আফীরার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, নাও, আমার আঙুলের কব্জা থেকে তরবারিটা আলাদা করো দেখি।

আফীরা বলল, এ-ও একটি বিষয় না-কি?

আফীরা সাফওয়ানের আঙুলের কব্জা থেকে তরবারিটা ছাড়ানোর চেষ্টা করল; কিন্তু পারল না। হাতের আঙুলগুলো যেন তরবারির বাঁটের সঙ্গে লেপটে আছে। আফীরা কোনোমতেই ছাড়াতে পারল না। বিস্মিত চোখে সাফওয়ানের প্রতি তাকিয়ে বলল, ব্যাপারটা কী?

সাফওয়ান বলল, ছাড়াও না।

কীভাবে ছাড়াব? তোমার আঙুলগুলো তো বাঁটের সঙ্গে এঁটে আছে!

আমিও অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু ছাড়াতে পারলাম না। মনে করেছিলাম, তুমি হয়ত পারবে। কিন্তু তুমিও ব্যর্থ হলে।

কিন্তু আঙুলগুলো বাঁটের সঙ্গে লেগে গেল কীভাবে?

আমি এত পরিমাণ রক্ত ঝরিয়েছি যে, হাতের আঙুলগুলো তরবারির হাতলের সঙ্গে লেপটে গেছে।

আচ্ছা, তুমি কোথাও আঘাত-টাঘাত পেয়েছ নাকি? আমার তো তেমন কিছুই মনে হচ্ছে। এই রক্ত তোমার নিজরে না তো?

এই সন্দেহের ভিত্তি কী?

তোমার পোশাকে স্থানে-স্থানে রক্তের ছোপ জমে আছে।

এগুলো সেই দুশমনদের রক্ত, আমি যাদেরকে হত্যা করেছি।

আফীরা বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে সাফওয়ানের প্রতি তাকাল।

ইতিমধ্যে আমের এসে উপস্থিত হলেন। তিনি সাফওয়ানকে উদ্দেশ করে বললেন, ব্যাপার কি, এখনও তুমি তরবারিটা কোষে ঢোকাওনি?

আফীরা বলল, ওনার হাতের আঙুলগুলো তরবারির হাতলের সঙ্গে এমনভাবে লেগে আছে যে, কোনোমতেই ছাড়ানো যাচ্ছে না।

আমের বললেন, তাই নাকি, দেখি!

তিনিও ছাড়ানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। বললেন, জোশের অবস্থায় দীর্ঘ সময় যুদ্ধ করলে এমনই হয়। আফীরা, তুমি পানি গরম করে আনো। গরম পানি ঢাললে আস্তে-আস্তে ছেড়ে যাবে।

আফীরা সঙ্গে-সঙ্গে পানি গরম করতে চলে গেল। আমের সেখান থেকে

নিজ তাঁবুতে ফিরে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আফীরা গরম পানি নিয়ে এল। সে সাফওয়ানের আঙুলে পানি ঢালল। ধীরে-ধীরে আঙুলগুলো নরম হয়ে এল এবং হাতল আলাদা হয়ে গেল। আফীরা মনকাড়া দৃষ্টিতে সাফওয়ানের প্রতি তাকিয়ে বলল, কেমন একটা মজার ঘটনা ঘটে গেল, না?

সাফওয়ান বলল, আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। আঙুলগুলো হাতলের সঙ্গে জোড়া লেগেই থাকে কিনা। কিন্তু অলৌকিক ক্ষমতা কাজ করে ফেলেছে।

মানে? আফীরা সাফওয়ানের প্রতি তাকিয়ে বলল।

ভালো বোঝ কিংবা মন্দ; আসল কথাটা বলে ফেলি। তোমার আঙুলের ছোঁয়া আমার রক্তপ্রবাহের গতি বাড়িয়ে দিয়েছিল, যার ফলে আমার আঙুলগুলোতে দ্রুতগতিতে রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল আর তাতেই হাতলটা আলাদা হয়ে গেছে।

আফীরা লজ্জা পেল। অলক্ষ্যে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল— 'দুষ্টু'।

সাফওয়ান আফীরার লাজরক্তিম মুখপানে তাকিয়ে বলল, যাহোক, সরকারের পক্ষ থেকে উপাধি একটা পেলাম।

আফীরা চোখ তুলে সাফওয়ানের প্রতি তাকাল। লজ্জায় চেহারাটা তার লাল হয়ে গেছে। মুহূর্তমধ্যে মনোহারী চোখ দুটো নত হয়ে গেল। সাফওয়ান তার অবনত লাজুক চোখের দিকে তাকাল এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে দাঁড়িয়ে থাকল। ক্ষণকাল পর বলল, আমি গেলাম আফীরা।

আফীরা কিছু বলতে পারল না। চোখ দুটো নত করেই বসে রইল। সাফওয়ান মোড় ঘুরিয়ে তার মুখপানে একপলক দৃষ্টিপাত করেই চলে গেল।

বিশ.

খোরযাদ পরাজয়বরণ করল। সে তার অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে পালিয়ে পাহাড়ে উঠে গেল। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সৈন্যরা এসে-এসে তার কাছে সমবেত হতে থাকল। সে ভাবল, ধাওয়া করতে মুসলমানরা এখানেও চলে আসতে পারে। তাই পর্যবেক্ষণের জন্য কয়েক ব্যক্তিকে একটি চটানের উপর বসিয়ে দিল। তাদেরকে বলে দিল, যদি মুসলমানদের আসতে দেখ, তা হলে দৌড়ে এসে আমাকে সংবাদ দিয়ো।

কিন্তু মুসলমানরা পাহাড়ের উপর তাকে ধাওয়া করেনি।

যখন এসে-এসে তার সকল সৈন্য সমবেত হলো, তখন খোরযাদ

তাদের গণনা করল। মাত্র পাঁচশো সৈনিক পাওয়া গেল। দেড় হাজারেরও বেশি সৈন্য মুসলমানদের হাতে মারা গেছে। এত অধিক সংখ্যক সৈন্যের প্রাণহানিতে খোরযাদ যারপরনাই ব্যথিত হলো। পরক্ষণে যখন তার মাথায় এ-ভাবনা উদিত হলো যে, আমার এতগুলো সৈনিককে হত্যা করেছে মাত্র গুটিকতক মুসলমান, তখন রাগে-ক্ষোভে তার মাথায় আগুন ধরে গেল। বলল, আমি একথা স্বীকার করতে রাজি নই যে, মুসলমানরা বাহাদুর। সত্য কথা হলো, আমার সৈনিকরা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি। অন্যথায় একজন মুসলমানেরও জীবনে রক্ষা পাওয়া কথা ছিল না।

ফায়রোজান খোরাযাদের পাশে দণ্ডায়মান ছিল। সে বলল, সত্যিই যদি আমাদের সৈনিকরা সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিত, তাহলে একজন মুসলমানও বেঁচে থাকত না আর আরবের সেই চাঁদটিও হাতে এসে পড়ত, আমি যার কথা বলেছিলাম। মেয়েটিকে দেখলে আপনি অবাক্ হয়ে যাবেন।

খোরযাদ বলল, আমি-না তোমাকে আরব নারীদের উপর অভিযান চালাতে পাঠিয়েছিলাম!

হ্যাঁ, আমি গিয়েছিলাম। হতভাগী আরব নারীরাও পুরুষদেরই মতো যোদ্ধা ও সাহসিনী। ওরা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। আমি যে-রূপসীটির সন্ধানে ছিলাম, সেও খঞ্জর হাতে নিয়ে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হলো। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, তার খঞ্জর আমার তরবারিটি ভেঙে ফেলেছে। কিন্তু তারপরও আমি তাকে কাবু করতে পারতাম। কিন্তু ইতিমধ্যে কপালপোড়া মুসলমান পুরুষ সৈন্যরা এসে পড়ল। তাদের সঙ্গে পেরে না উঠে আমার সঙ্গীরা পালিয়ে গেল আর মেয়েটি হাতে এসেও ফস্কে গেল।

তুমি উক্ত আরব মেয়েটির রূপ-সৌন্দর্যের এত প্রশংসা করেছ যে, আমার মনে ওকে একনজর দেখার আগ্রহ জন্মে গেছে।

সত্য কথা বলতে কী, মেয়েটি শুধু দেখারই যোগ্য নয়– বরং পূজনীয়াও বটে।

কিন্তু তাকে পাওয়ার উপায় কী?

আমি তাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করব। এই মুহূর্তে আপনার সেনাসংখ্যা অপর্যাপ্ত। চলুন, মারাদশাহজাহানে গিয়ে শাহেনশাহর নিকট থেকে সাহায্য নিয়ে আরব মুসলমানদের পিছু নিই। যখন সুযোগ পাব, পরীটিকে তুলে আনব।

তুমি ঠিক বলেছ। চলো রওনা হই। কিন্তু প্রশ্ন থাকে, তুমি এই যুদ্ধ সম্পর্কে শাহেনশাহকে কী বলবে?

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আপনার ও আপনার সহকর্মীদের এত প্রশংসা করব যে, শাহেনশাহ খুশি হয়ে যাবেন।

আমি তা-ই চাই।

খোরযাদ ও ফায়রোজান অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে রওনা হলো। তবিলনে আহনাফ ইবনে কায়েস অবস্থান নিয়ে আছেন, তা তাদের জানা আছে। তাই তাদের সোজাপথে সফর করার সাহস হলো না। মারাদশাহজাহান পৌঁছুবার জন্য তারা দীর্ঘ এক ঘোরাপথ ধরল। বেশ কদিন বিভিন্ন পাহাড়ের মধ্য দিয়ে পথ চলল। একপর্যায়ে পাহাড়ের ভেতর থেকে বের হয়ে খোলা মাঠে চলতে শুরু করল। অবশেষে একদিন মারাদশাহজাহানে পৌঁছে গেল।

সম্রাট ইয়ায্‌দাজার্‌দ এখানে অবস্থান করছেন। তার কাছে ৩০ হাজারেরও বেশি সৈন্য আছে। যুদ্ধের সরঞ্জাম ও রসদও আছে পর্যাপ্ত। একটি সুরম্য প্রাসাদে অবস্থান করছেন তিনি। সৈন্যরা নগরীর বাইরে একস্থানে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছে।

খোরযাদ ও ফায়রোজানও নগরীর বাইরে ছাউনি ফেলল। কিন্তু মুসলমানদের হাতে পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে তারা সম্রাটের কাছে যাওয়ার সাহস পেল না। কী জবাব দেবে তারা সম্রাটকে। এমনও হতে পারে, সম্রাট তাদের প্রতি নাখোশ হয়ে তাদেরকে হত্যা করে ফেলবেন।

ঘটনাক্রমে একদিন ইয়ায্‌দাজার্‌দ নগরীর বাইরে বেরিয়ে এলেন। তার এই আগমন ছিল আকস্মিক। খোরযাদ ও ফায়রোজান তাঁবুর বাইরে একটি রেশমি শামিয়ানার নিচে বসে কথা বলছে।

ঠিক এ-সময়ে ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর বাহন এদিক দিয়ে পথ অতিক্রম করতে লাগল। দেখে তারা দুজন উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাল। ইয়ায্‌দাজার্‌দ ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার ছিলেন। তিনি ঘোড়া থামিয়ে খোরযাদ-এর প্রতি বিস্মিত চোখে তাকালেন এবং বললেন, তুমি!

খোরযাদ দু-হাত একত্রিত করে অনুনয়ের সুরে বলল, গোলাম শাহেনশাহর দরবারে হাজিরা দিতে এসেছে।

তা তুমি কবে এসেছ?

খোরযাদ ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর ভয়ে মিথ্যা বলল– গতকাল মহারাজ।

এতক্ষণে আমার সঙ্গে দেখা করলে না কেন?

এই তো প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে শাহেনশাহ নিজেই এসে পড়লেন।

এই একটু আগে গোয়েন্দারা সংবাদ দিয়েছে, মুসলমানরা তবিলন থেকে হেরাতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। হেরাতের গভর্নরের প্রতনিধিদল সাহায্যের জন্য এসেছে। আমি কিছু সৈন্য হেরাত পাঠাতে এসেছি। এই লোকটি কে?

এ ফায়রোজান। বহিরাশেরে এর জমিদারি আছে।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ খানিক চিন্তা করে বললেন, এ-ই সেই লোক নাকি, যাকে পূর্ব শাহজাহানে জায়গির দান করা হয়েছিল?

ফায়রোজান বলল, শাহেনশাহ ঠিকই ধরেছেন। অধম সেই লোকই।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ খোরযাদকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যে-অভিযানে গিয়েছিল, তার খবর কী?

খোরযাদ বলল, সে-প্রসঙ্গে একান্তে কথা বলব। ফায়রোজানও সেই অভিযানে আমার সঙ্গে ছিল।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ বললেন, আচ্ছা, তোমরা দুজন আমার সঙ্গে আসো।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর বাহন এগোতে শুরু করল। এরা দুজনও ঘোড়ায় চড়ে বসল। কিন্তু সম্রাটের ভয়ে দুজনেরই বুক দুরু-দুরু করছে। চেহারার রং ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী যুবক। সুঠাম দেহ। গায়ে রেশমি পোশাক ও মহামূল্যবান অলংকার। মাথায় মুক্তাখচিত মুকুট। তবে দাড়ি মুন্ডিত হওয়ার কারণে চেহারায় কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই। পুরুষের মুখে দাড়ি না থাকলে চেহারা প্রভাবদীপ্ত হয় না।

সঙ্গে বাহিনীর প্রধান সেনাপতিও উপস্থিত। তিনিও আপন পদমর্যাদা অনুপাতে রেশমের পোশাক ও সোনার অলংকার পরিহিত। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তিনি এক অফিসারকে ইঙ্গিত করলেন। অফিসার এগিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। সেনাপ্রধান তাকে বললেন, শাহেনশাহ আদেশ করেছেন, তুমি দশ হাজার সৈন্য নিয়ে এই মুহূর্তে হেরাত রওনা হয়ে যাও এবং হেরাতের বাহিনীকে সহযোগিতা করো।

অফিসার আজ্ঞে জি হুজুর বলে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং সম্রাটকে অভিবাদন জানিয়ে পেছনে ফিরে গেল। সম্রাট ইয়ায্‌দাজার্‌দ বাহিনীকে দেখতে-দেখতে অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে গেলেন এবং নগরীতে ফিরে এলেন।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ প্রাসাদে পৌঁছে গেলেন। অন্য সকলে বাইরে রয়ে গেল। কিন্তু খোরযাদ ও ফায়রোজান সম্রাটের সঙ্গে মহলে প্রবেশ করল।

প্রাসাদে প্রবেশ করে সম্রাট নিজ আসনে উপবেশন করলেন। তার

সিংহাসনের সম্মুখে মনোরম একটি ঝরনা। ঝরনার চারদিকে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ফুলের সমারোহ।

তিনি উপবেশন করতে-না-করতে রাজপরিবারের নারীরা এসে হাজির হলো। প্রতিজন নারী অতিশয় মূল্যবান পোশাক ও অলংকার পরিহিত। দেখতে যেন সব কজনই পরী।

বিশেষ করে একটি তরুণীকে চাঁদের টুকরো বলে মনে হলো। এটি ইয়ায্দাজার্দ-এর ছোট মেয়ে। মেয়েটিকে দেখামাত্র খোরযাদ ও ফায়রোজানের চোখ আটকে গেল। দুজন অপলক চোখে মেয়েটির প্রতি তাকিয়ে রইল।

ইয়ায্দাজার্দ বললেন, ওই যুদ্ধের কাহিনীর শোনাও।

ফায়রোজান বলল, মহারাজ, আমরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালিয়েছি। ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছে। আমরা মুসলমানদেরকে পরাস্ত করে ফেলেছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে তাদের সাহায্য এসে পড়ল। ফলে আমরা পিছপা হতে বাধ্য হলাম। মহারাজ, আমরা ওই মুসলমানদের সঙ্গে এক রূপসী মেয়েকে দেখেছি, যার জবাব বোধ হয় বর্তমান পৃথিবীতে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ইয়ায্দাজার্দ চকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েটি কি খুব বেশি সুন্দরী?

খোরযাদ মুখ খুলল। বলল, এত সুন্দরী যে, চাঁদও তার মোকাবেলায় মূল্যহীন।

ইয়ায্দাজার্দ জরুরি সব কথা ভুলে গেলেন। বললেন, ওই মেয়েটি আমার চাই।

ফায়রোজান বলল, আলবত। অবশ্যই আসবে। আমাকে কিছু সৈন্য দিন।

ইয়ায্দাজার্দ বললেন, সৈন্য যত প্রয়োজন নিয়ে নাও।

ফায়রোজান বলল, বেশি নয়– মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য চাই।

ইয়ায্দাজার্দ বললেন, আমি আজই প্রধান সেনাপতিকে আদেশ দিয়ে দিচ্ছি। সে তোমাকে পাঁচ হাজার সৈন্য দিয়ে দেবে।

ফায়রোজান বলল, তা হলে আমি কালই রওনা হয়ে যাব।

ইয়ায্দাজার্দ কয়েকটি মেয়েকে ইশারা করলেন। তারা উঠে দাঁড়াল।

তাদের পোশাক তাদের দেহবল্লরিকে পুরোপুরি আবৃত করতে পারছিল না। তারা নাচতে শুরু করল।

কয়েকটি মেয়ে মদ পরিবেশনে আত্মনিয়োগ করল। নাচ ও মদের আসর জমে ওঠল।

একুশ.

রণাঙ্গন ত্যাগ করে আমের দু-মাইল পথ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে একস্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। কারণ, রণাঙ্গনে বহুসংখ্যক মজুসির লাশ পড়ে ছিল। সেগুলো পঁচে-গলে পরিবেশ দূষিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। মুসলমানরা তাদের শহীদদের লাশগুলোকে জানাযা পড়িয়ে যত্নের সঙ্গে দাফন করে ফেলেছে।

এখন আমের যে-স্থানটিতে ছাউনি ফেলেছেন, সেটির অবস্থান পাহাড় থেকে সামান্য দূরে একটি কূপের পাড়ে। কয়েকজন মুসলমান গুরুতর আহত হয়েছিল। তাদের মাঝে সফর করার শক্তি নেই। তাই আমের যাত্রাবিরতি দিতে বাধ্য হলেন। বাহিনীতে দুজন ডাক্তার আছেন, যারা শল্যবিদ্যায়ও পারদর্শী। তারা আহতদের ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগ করে পট্টি বেঁধে দিলেন। মহিলারা তাদের সেবা-যত্নের দায়িত্ব পালন করছে।

কূপের সন্নিকটে একটি বাগান আছে। তাতে নানা প্রকার ফল রয়েছে। তবে বেশিরভাগ ফল হলো আঙুর। লতায় থোকা-থোকা কাঁচা-পাকা আঙুর ঝুলছে। মাঝে-মধ্যে মনকাড়া ফুলের বাহার। কোনো এক সমাজপতি বাগানটির মালিক। তত্ত্বাবধানের জন্য কয়েকজন মালি নিয়োজিত থাকে। কিন্তু এখন নেই। তারা মুসলমাদের ভয়ে পালিয়ে গেছে। এখন বাগানটি লা-ওয়ারিশ পড়ে আছে।

একদিন আফীরা আরও কয়েকটি আরব মেয়ের সঙ্গে উক্ত বাগানে প্রবেশ করল। তারা আঙুরের মনোলোভা থোকাগুলো দেখল। আঙুর গাছের লতা-পাতার ফাঁক গলে নিচের দিকে ঝুলে থাকা আঙুরের থোকাগুলোও তাদের চমৎকৃত করল। কিন্তু তাদের একজনও আঙুর সম্পর্কে অবহিত ছিল না। সবাই বিস্মিত হলো যে, এগুলো কী জিনিস!

আফীরা সেখান থেকে সরে ফুলগাছের সারির মধ্যে ঢুকে পড়ল। মেয়েটি ফুল ছিঁড়ে-ছিঁড়ে মাথার চুলে সারি বেঁধে একদিক থেকে আরেকদিক পর্যন্ত আটকে নিল। ফুলগুলো তার রূপ-সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলল।

ঘটনাক্রমে হঠাৎ সাফওয়ান সেখানে এসে হাজির হলো। রূপরানিকে দেখামাত্র তার চোখ আটকে গেল। এই মুহূর্তে আফীরাকে তার আপাদমস্তক একটি রূপ বলেই মনে হলো। সাফওয়ান মেয়েটির প্রতি অপলক চোখে তাকিয়েই রইল। আফীরা তার আগমন টের পেল না। কিছুক্ষণ পর সাফওয়ান বলল, উহ ফুলের রানি!

কানে শব্দ ঢোকামাত্র আফীরা সহসা চকিত হয়ে ওঠল। মোড় ঘুরিয়ে সাফওয়ানকে দেখে বলল, আচ্ছা, চোরের মতো এসে পড়েছ এখানে!

চোর তো আমার আগেই এসেছে। আমি হলাম পুলিশ; চোর ধরতে এসেছি।

আচ্ছা পুলিশ সাহেব, এসেছ ভালো করেছ। আমরা এই বাগানে বিস্ময়কর ধরনের কিছু ছড়া ও থোকা ঝুলতে দেখেছি। কী এগুলো?

সাফওয়ান মুচকি হেসে বলল, সেকথা পরে বলব। আগে বলো, তুমি ফুল চুরি করেছ কেন?

তুমি আমাকে চোর বলেছ। চোরের কাজই তো চুরি করা।

এই ফুলগুলো আজ প্রকৃত মর্যাদা লাভ করেছে। চোরের চুরির অপরাধ এইজন্য লঘু হয়ে গেল যে, চোরাই মাল সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

আফীরা তার চিত্তহারী চোখ দুটো তুলে সাফওয়ানের মুখপানে তাকাল। মেয়েটি বুঝতে পারল না সাফওয়ানের মতলব কী! ফুলচুরিতে তার এত আপত্তি কেন?

সাফওয়ান বলল, বলার চেয়ে বরং ভালো হবে আমার সঙ্গে এস দেখিয়ে দিই।

আফীরা চলো বলে সাফওয়ানের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল। দুজন একটি নালার কাছে পৌঁছে গেল। নালায় স্বচ্ছ পানি প্রবাহিত হচ্ছিল। সিসার মতো স্বচ্ছ পানির মধ্য দিয়ে নালার তলার মাটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। সাফওয়ান বলল, একটুখানি ঝুঁকে দেখো, ফুলগুলো তোমাকে কী বানিয়ে দিয়েছে!

আফীরা নালার পাড়ে দাঁড়িয়ে ভেতরে ঝুঁকে দেখল। চুলেবাঁধা ফুলগুলো তার গোলাপি গণ্ডদ্বয়কে রূপের মূর্তি বানিয়ে দিয়েছে। সে লজ্জা পেয়ে গেল। মাথা তুলে সাফওয়ানের প্রতি তাকিয়ে বলল, তুমি খুব... হয়ে গেছ।

আমি খুব দুষ্টু হয়ে গেছি, না? তুমি তো আমাকে এই উপাধিই দিয়েছ।

দেব না? তুমি তো তেমনই।

কেমন?

আফীরা লাজুক কণ্ঠে বলল, দুষ্টু।

সাফওয়ান বলল, যদি আমি এসে না পড়তাম, তাহলে সেদিন কিন্তু খবর হয়ে যেত। ইরানি লোকটা তোমাকে নির্ঘাত ধরে নিয়ে যেত।

বরং বলো, তোমার এসে পড়ায় লোকটা রক্ষা পেয়ে গেছে। অন্যথায় আমার খঞ্জরের আঘাতে তাঁর খঞ্জর ভেঙে গিয়েছিল। তুমি যদি আরেকটু পরে আসতে, তাহলে এসেই দেখতে আমার খঞ্জর ওর বুকে সাঁতার কাটছে।

সেই মুহূর্তটিতে আমি তোমাকে দেখেছিলাম। সত্যিই তুমি প্রতিশোধপরায়ণা আহত সিংহীর রূপ ধারণ করেছিলে।

ঠিক এমন সময় একদিক থেকে একটা খসখস শব্দ দুজনের কানে ভেসে এল। উভয়েই চোখ তুলে তাকাল। জামাসপ খানিক দূর দিয়ে পথ অতিক্রম করছিল।

আফীরা বলল, এই ইরানিটা এখানে এসে পড়ল কীভাবে?

সাফওয়ান বলল, ভয় পেয়ো না। এ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

আফীরার মনে জোশ এসে পড়ল। তার সুন্দর মুখাবয়বে লালিমা ছড়িয়ে পড়ল। বলল, যেন জগতে তুমিই একমাত্র বীরপুরুষ।

তাতে কোনো সন্দেহ আছে নাকি? সেদিন দেখনি, আমার পাঞ্জাটা কীভাবে তরবারির বাঁটের সঙ্গে আটকে গিয়েছিল?

প্রথমে বুঝতে পারিনি। তবে পরে বুঝেছি।

আমি তোমার কোনো বানানো কথা শুনতে চাই না।

আফীরা মুচকি হেসে বলল, গাছ থেকে কটা ফুল ছিঁড়লাম আর দেখে তুমি ভয় পেয়ে গেছ! কত বড় বীর পুরুষ তুমি! আচ্ছা, এসব বাদ দাও। তুমি কি জান এই ইরানিটা কে এবং এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন?

আমি তার জীবন ক্ষমা করে দিয়েছি। আমাদের কমান্ডারও নিরাপত্তা দান করেছেন।

তারপর সাফওয়ান পুরো ঘটনা শোনাল। জামাসপকে যুদ্ধের মাঠে কী অবস্থায় কীভাবে পেল এবং তার সঙ্গে কী কথাবার্তা হলো, সব আফীরাকে জানাল।

আফীরা জিজ্ঞেস করল, এ-কদিনে লোকটি কীরূপ প্রমাণিত হয়েছে?

অফাদারই মনে হচ্ছে।

আচ্ছা আস, এবার চলো যাই।

এই শান নিয়ে ফিরতে চাও তাঁবুতে?

শান আবার বদলে নিতে হবে নাকি? সমস্যা মনে করছ?

আশঙ্কা আছে, এই অবস্থায় দেখলে তোমার উপর কারও চোখ পড়ে যেতে পারে।

আফীরা চুল থেকে ফুলগুলো খুলে-খুলে আঁচলে নিয়ে নিল। দুজন হাঁটতে শুরু করল। আফীরা নারীক্যাম্পে চলে গেল আর সাফওয়ান তার তাঁবুতে ফিরে এল।

সেদিনই সাফওয়ান যখন জোহর নামায পড়ে ফিরে এল, তখন জামাসপ বলল, আরব ভাই, আজ ফুলের কেয়ারিতে দাঁড়িয়ে আপনি যে-মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছিলেন, কে ও?

ও আমাদের বাহিনীর কমান্ডারের কন্যা।

জামাসপ চুপ হয়ে গেল। কিন্তু তার চোখ দুটো বলছিল, সে কিছু বলতে চাচ্ছিল।

সাফওয়ান জিজ্ঞেস করল, তুমি মেয়েটির ব্যাপারে কিছু জান নাকি?

না, আমি তার সম্পর্কে কিছু জানি না। মানে, এর আগেও মেয়েটিকে এক-দুবার দেখেছি।

কিন্তু তোমার চোখ বলছে, তুমি ওর সম্পর্কে কিছু জান কিংবা কিছু বলতে চাচ্ছ।

না, ওর সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। তবে কিছু বলতে চাচ্ছি।

বলো, কী বলতে চাচ্ছ।

আগে একটি কথা বলুন।

কী কথা?

আপনার সঙ্গে কি মেয়েটির সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে?

না। আমার ও তার সাক্ষাত ঘটেছে এক বিস্ময়কর পন্থায় যুদ্ধে আসার পথে।

সাফওয়ান জামাসপকে সংক্ষেপে আফীরার সঙ্গে সাক্ষাতের কাহিনী শোনাল। জামাসপ বলল, আপনি যদি মন্দ না ভাবেন, তাহলে একটি কথা বলতে চাই।

মন্দ ভাবব কেন, বলুন।

মেয়েটি খুবই সুন্দরী। আপনার উপযোগী। কিন্তু...।

কিন্তু কী?

এক দুরাচার ইরানি এর পিছু নিয়েছে।

কে সেই নরাধম? সাফওয়ান ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং বিস্মিত হলো।

এক মারযুবান্। তার নাম ফায়রোজান। লোকটি এই যুদ্ধে শুধু এজন্য অংশ নিয়েছিল যে, সুযোগ পেলে একে তুলে নিয়ে যাবে।

তুমি বিষয়টি কীভাবে জেনেছ?

এর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আমি মিথ্যা বলেছিলাম যে, আমাকে যুদ্ধে জোরপূর্বক নিয়ে আসা হয়েছে। আসল কথা হলো, আমি মেয়েটিকে ওই বজ্জাতের হাত থেকে রক্ষা করতে আপনা থেকেই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। আর এখনও এখানে এইজন্য অবস্থান নিয়েছি যে, নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও মেয়েটিকে রক্ষা করব।

সাফওয়ানের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল।

জামাসপ বলল, কমান্ডার আসছেন; তাকে এসব কিছু বলবেন না।

জামাসপ চলে গেল। কমান্ডার আমের এসে উপস্থিত হলেন এবং সাফওয়ানের কাছে বসে কথা বলতে শুরু করলেন।

বাইশ.

কয়েক দিন অবস্থান করে আমের তবিলনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। এ-কদিনে আহত মুজাহিদরা সেরে উঠেছে এবং তাঁদের মাঝে সফরের শক্তি ফিরে এসেছে। জামাসপ-এর এই অঞ্চল সম্পর্কে ভালো জানাশোনা আছে বিধায় সে মুজাহিদ কাফেলাটিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সে-যুগের মুসলমানরা এত সরল-সহজ হতো যে, অমুসলিমদেরকে অল্পতেই বিশ্বাস করে ফেলত। তারা কখনও এই ভয় করত না যে, ওরা ধোঁকা দিতে পারে। সাধারণত হতোও এমন যে, যাদেরকে তারা বিশ্বাস করত, তারা ধোঁকা দিতও না। তার উল্লেখযোগ্য কারণ এই ছিল যে, মুসলমানরা যাদেরকে পথপ্রদর্শন কিংবা চরবৃত্তির দায়িত্ব প্রদান করত, তাদেরকে তাদের দাবির চেয়েও বেশি সম্মানি-পারিশ্রমিক দিত। এর বাইরে পুরস্কার-উপঢৌকনও দিত। এই উদারতা ও মহানুভবতার ফলে তারা মুসলমানদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকত। ফলে স্বজাতির কোনো প্ররোচনার শিকার হয়ে মুসলমানদের ধোঁকা দিত না।

অবশ্য কখনও-কখনও এর ব্যতিক্রম ঘটনাও ঘটত। কিন্তু ব্যতিক্রমিভাবে যারা এই বিশ্বাসঘাতকতা করত, শেষ পর্যন্ত তারা রক্ষা পেত না। মুসলমানরা যখনই তাদের প্রতারণা টের পেত, সঙ্গে-সঙ্গে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করব। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, মুসলমানরা ভুল করে ফেললেও মহান আল্লাহর দয়া ও সাহায্য তাদের সঙ্গে থাকত। ফলে আল্লাহর দয়া ও সাহায্যে তারা প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যেত।

জামাসপের কোনো লোভ ছিল না। আমের কয়েকবারই তাকে কিছু দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে এই বলে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে যে, আমি কোনো স্বার্থের জন্য মুসলমানদের সঙ্গে এসে যোগ দেইনি। আপন জাতির বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করাই আমার উদ্দেশ্য।

জামাসপ স্বজাতির বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করতে এসেছে এমন কথা শুনে সাফওয়ান আরও বিস্মিত হলো। লোকটির কথাবার্তা তার কাছে

বিস্ময়কর ঠেকল। তার মনে পড়ে গেল, লোকটি বলেছিল, নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে হলেও সে আফীরাকে রক্ষা করবে। আর এখন কিনা বলছে, কোনো লোভে বা স্বার্থে সে মুসলমানদের সঙ্গ নেয়নি। বরং তার মন চাচ্ছে, সে স্বজাতির বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করবে।

সাফওয়ান ভাবতে শুরু করল, লোকটির মন এমনটি চাচ্ছে কেন। কেনইবা সে নিজের জীবন দিয়ে হলেও আফীরাকে রক্ষা করতে চাচ্ছে। তার অন্তরে ভাবনা জাগল, লোকটি আফীরাকে ভালবাসছে না তো আবার! কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই এই সন্দেহ দূর হয়ে গেল যে, না, লোকটি তো বৃদ্ধ। গোঁফ-দাড়ি সাদা হয়ে গেছে। আর আফীরা সতেরো বছরের টগবগে যুবতী। এর সঙ্গে তো ওর কোনোই মিল খাওয়ার কথা নয়।

একদিন সাফওয়ান জামাসপকে জিজ্ঞেস করল, আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই; উত্তর দেবে কি?

জামাসপ বলল, জানা থাকলে অবশ্যই দেব।

সাফওয়ান বলল, তোমার কথাবার্তা আমাকে বিস্মিত করে তুলেছে। আমি ভেবে কোনোই কুল পাচ্ছি না। আমি জানতে চাই, নিজের জীবন দিয়ে তুমি আফীরাকে হেফাযত করতে চাচ্ছ কেন?

আফীরা কে?

যে-মেয়েটি সম্পর্কে আমার সঙ্গে কথা বলেছিলে, তার নাম আফীরা।

ও আচ্ছা। তা তুমি কি সত্য-সত্যই জিজ্ঞেস করছ?

হ্যাঁ, এ-বিষয়েও নিশ্চিন্ত থাকো যে, যদি তুমি সত্য-সত্য বলে দাও, তাহলে তোমার প্রতি আমি সন্তুষ্টই হব– কোনো অবস্থাতেই রুষ্ট হব না। তুমি মনের আসল কথা ব্যক্ত করো।

তুমি রুষ্ট হলেও আমার কোনো পরোয়া নেই। প্রথমত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যখন তুমি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছ, তখন গুরুতর কোনো অপরাধ ছাড়া আমাকে হত্যা করবে না। আর যদি করও, তাতেও আমার কোনো আক্ষেপ থাকবে না। কারণ, আমার জাতি আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। আমি কঠিনপ্রাণ মানুষ ছিলাম বলে বেঁচে গেছি। নিজের জীবনের প্রতি আমি নিজেই অতিষ্ঠ। জীবনের প্রতি আমার কোনোই মায়া নেই। তুমি যদি আমাকে হত্যা করেও ফেল, তাহলে তা আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ বলে বিবেচিত হবে।

জামাসপের এসব কথায় সাফওয়ানের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। বলল,

এটা সত্য কথা যে, মুসলমান সেই সময় পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করে থাকে, যে-পর্যন্ত না প্রতিশ্রুত ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

আমি পবিত্র তারকারাজির কসম খেয়ে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমি আপনাকে কিংবা অন্য কোনো মুসলমানকে ধোঁকা দেব না।

আমার অন্তরও এর সাক্ষ্য প্রদান করছে।

যা হোক, আমি তোমাকে আফীরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

আমি ওই মেয়েটিকে মাত্র তিনবার দেখেছি। প্রথমবার দেখামাত্র আমার অন্তর সাক্ষ্য দিয়েছিল, মেয়েটি সহজ-সরল ও নিষ্পাপ। ফলে পিতা কন্যাকে যেমন ভালবাসে, আমার অন্তরেও তার প্রতি তেমন ভালবাসা জাগ্রত হয়ে গেছে। দ্বিতীয়বার যখন দেখেছি, তখন ফায়রোজান তাকে দেখছিল। সে আমাকে বলেছে, সে মেয়েটির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে এবং যেভাবে হোক তাকে তুলে আনবার চেষ্টা করবে। আফীরার প্রতি আমার মমতা ও সমবেদনা জেগে গিয়েছিল। ফলে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, বজ্জাত লোকটির কবল থেকে মেয়েটিকে রক্ষা করতে প্রয়োজনে আমি জীবনের বাজি লাগাব।

এবার আমি নিশ্চিত হয়েছি।

সবে তো আমার কথায় নিশ্চিন্ত হয়েছ। আসল এতমিনান তো তখন হবে, যখন আমি কাজ দ্বারা নিজের কথার প্রমাণ দেব।

আল্লাহ্ করুন সেই সময়টি না আসুক।

আমি তোমাকে এখনও বলিনি যে, জ্যোতির্বিদ্যায়ও আমার দখল আছে। তুমি যখন মেয়েটির নাম বলেছ, তখন এই বিদ্যা দ্বারা আমি তার কিছু অবস্থা জেনে নিয়েছি। তথ্য পেয়েছি, তার নক্ষত্র চক্রের মধ্যে আসছে। মেয়েটি কোনো কঠিন এক বিপদে নিপতিত হতে যাচ্ছে। তবে তার জীবনের কোনো ঝুঁকি নেই।

সাফওয়ান ভাবনায় পড়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে পরে বলল, আফীরার সঙ্গে যখন আমার প্রথমবার সাক্ষাত হয়েছিল, তখন ঘটনাক্রমে এক বৃদ্ধা ওখানে এসেছিল। সেও সে-কথাই বলেছে, যা তুমি বলেছ।

তা হলে তো আমি নিশ্চিত হলাম যে, আমার বিদ্যা আমাকে সঠিক তথ্যই দিয়েছে।

জামাসপ চলে গেল এবং কিছু ভাবতে লাগল। তার ঐকান্তিক কামনা, আফীরা কোনো বিপদে নিপতিত না হোক। সে মেয়েটির নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করল।

বাহিনী এগিয়ে চলছে। আমের ও তাঁর সঙ্গীরা নিশ্চিত ছিলেন, আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) তাঁর সৈন্যদেরসহ তবিলন অবস্থান করছেন। কিন্তু তবিলন পৌঁছে জানতে পারলেন, তিনি হেরাত চলে গেছেন।

বিরামহীন পথ চলায় মুসলমানরা খানিক পরিশ্রান্ত হয়ে ওঠেছিল। কয়েকজন মুজাহিদ কমান্ডার আমেরের নিকট আবেদন জানালেন, আমাদেরকে কিছু সময় বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ দিন।

আমের যদিও চাচ্ছিলেন, যত দ্রুত সম্ভব আহনাফ বাহিনীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবেন, কিন্তু তাঁর আমীরুল মুমিনীনের এই আদেশটিও মনে আছে যে, সঙ্গীদের আরাম-আয়েশের প্রতি লক্ষ্য রেখো। তাই তিনি ওখানেই ছাউনি ফেললেন।

তবিলনের উপর মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। নগরীর নিরাপত্তা ও সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা জন্য পঞ্চাশজন মুসলমান সেখানে অবস্থান করছিল। তারা আমের ও তার সঙ্গীদেরকে স্বাগতম জানাল।

একদিন সাফওয়ান নারীক্যাম্পে গেল। আফীরা যেন তার অপেক্ষা প্রহর গুণছিল। কিন্তু বলল, আজ কেন এসেছ এখানে?

আমি আপনা থেকে আসিনি। এখানে কে যেন আমাকে স্মরণ করেছে আর নিজের অজান্তে চুম্বকের টানে এসে পড়েছি।

খুব পাজি হয়ে গেছ তুমি!

তা না হয় হয়েছি। কিন্তু একটি আশঙ্কা আমার মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। হৃদয়টা কেমন যেন দুরু-দুরু করছে।

কী আশঙ্কা?

মনে আছে, তোমার সঙ্গে আমার প্রথমবার যখন দেখা হয়েছিল, তখন এক বৃদ্ধা কী বলেছিল?

হ্যাঁ, মনে আছে।

আমি যে-ইরানির জীবনভিক্ষা দিয়েছি, তার নাম জামাসপ। লোকটি জ্যোতিষীও। সেও তোমার ব্যাপারে ঠিক সে-কথাটিই বলেছে, যা মহিলা বলেছিল।

বলতে দাও, আমি এসবের তোয়াক্কা করি না।

আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করুন।

এ-সময় আরও কয়েকটি মেয়ে এসে পড়ল। সাফওয়ান সেখান থেকে চলে গেল।

তবিলনে কয়েক দিন অবস্থান করে আমের আবার যাত্রা শুরু করলেন। জামাসপ পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব পালন করছে। এবার পাহাড়ি অঞ্চল শুরু হয়েছে। কোথাও মরু গলিপথ, কোথাও ভয়ংকর পাকডন্ডি অতিক্রম করতে হচ্ছে।

আল্লাহ-আল্লাহ করে পার্বত্য এলাকা অতিক্রম করে বাহিনীটি একটি খোলা মাঠে এসে পৌঁছেছে এবং সম্মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণে মাইলকয়েক পথ অতিক্রম করেছে তারা। হঠাৎ দেখতে পেল সম্মুখে একস্থানে ধূলি উড়ছে। তারা দাঁড়িয়ে গেল এবং কারা আসছে বুঝবার জন্য ওদিকে তাকিয়ে থাকল।

ধূলির ঝড়টি এগিয়ে আসছে। মুসলমানরা নিশ্চিত, কোনো সেনাবাহিনী তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। হেরাত ওখান থেকে বেশি দূরে নয়। আমের তার সৈন্যদেরকে আদেশ প্রদান করলেন, তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। মুসলমানরা অস্ত্র সংবরণ করে প্রস্তুত হয়ে গেল।

অল্পক্ষণ পই ধূলিঝড়ের আঁচল বিদীর্ণ হলো এবং তার মধ্য থেকে একটি বাহিনী বেরিয়ে এল। রোদের কিরণে তাদের অস্ত্রগুলো চিকচিক করতে শুরু করল। মুসলমানরা দেখল, ওরা আরব মুজাহিদ। আমের বললেন, আরে, ওরা তো আমাদেরই ভাই। মুসলমানরা খুশিতে বাগবাগ হয়ে উঠল এবং আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে উল্লাস প্রকাশ করল। জবাবে আগন্তুক কাফেলাটিও তাকবীরধ্বনি তুলল।

মুসলমানদের দুটি বাহিনী পরস্পর মিলিত হলো। একে-অপরকে সালাম করল। আমের আগন্তুকদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এখানে কেন?

বাহিনীর কমান্ডার উত্তর দিলেন, আমরা তথ্য পেয়েছি, আজ হেরাতের মজুসিরা হামলা করবে। আমাদের কমান্ডার আহনাফ ইবনে কায়েস আমার সঙ্গে দুশো সশস্ত্র মুজাহিদের একটি ইউনিট প্রেরণ করে আদেশ দিয়েছেন, যেন আমরা ঘোড়ায় চড়ে এমনভাবে আসি, যার ফলে দুশমন মনে করে মুসলমানদের সাহায্য এসেছে।

হেরাত বাহিনীর জন্য সাহায্য এসে পৌঁছেছে বোধ হয়।

হ্যাঁ, গতকাল মারাদশাহ থেকে পাঁচ হাজার সহযোগী সৈন্য এসে পৌঁছেছে।

এখন আমরা একটি কৌশল অবলম্বন করতে পারি। আগে আমরা ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে যাই। তোমরা আমাদের পরে এসো।

এ-পদ্ধতিই ভালো হবে। কারণ, আপনার সঙ্গে নারী-শিশুও আছে।

আপনার বাহিনীকে দেখে মুসলমান-মজুসি উভয় পক্ষই মনে করবে, সহযোগী বাহিনী এসেছে। আর এটি সত্যও। আমরা দুপুরের পরে যাব।

হেরাত এখান থেকে কত দূর?

সামনেই হেরাত। বেশির-চেয়ে-বেশি তিন মাইল হবে।

আমের বললেন, আচ্ছা, আমি রওনা হয়ে যাই।

আগন্তুক বাহিনীর কমান্ডার তাঁকে আল্লাহ হাফেজ বলে বিদায় জানালেন।

আমের ও তাঁর সঙ্গীরা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। নারী-শিশুদের বাহন এবং উটগুলোকেও দ্রুততার সঙ্গে হাঁকিয়ে নেয়া হলো। এখন তাদের ও হেরাতের মধ্যখানে কয়েকটি বাগান মাত্র। এগুলো অতিক্রম করে যেতেই হেরাতের বাড়ি-ঘর চোখে পড়তে শুরু করল।

হেরাতের নিম্ন এলাকয় এক মাঠে উত্তপ্ত রোদের মধ্যে তারা অস্ত্রের ঝলকানি দেখতে পেল। আমের বললেন

'ইসলামের বীর সিংহরা, মনে হচ্ছে, মজুসিরা আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে। যুদ্ধ চলছে। তোমাদের ভাইয়েরা লড়াই করছে। মজুসিদের সাহায্য এসে পড়েছে। মুসলমানরা সংখ্যায় কম মনে করে ওরা হামলা করে দিয়েছে। কিন্তু ওরা জানে না, মুসলমানদের একজন সাহায্যকারী আছেন। আল্লাহ কখনও তার বান্দাদের অপদস্থ হতে দেন না। তিনি অদৃশ্য থেকে মুসলমানদের সাহায্য করে থাকেন।

'ওহে আল্লাহর সৈনিকগণ, তোমরা আল্লাহর সঙ্গে একটি সওদা করেছ। তোমরা তোমাদের জীবনকে জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছ। জান্নাত তরবারির ছায়ার নিচে। সম্মুখে অনেকগুলো তরবারি ঝিকমিক করছে। তোমরা উচ্চৈঃস্বরে তাকবীরধ্বনি তুলে ঘোড়া হাঁকিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো।'

মুসলমানরা আসমান-জমিন প্রকম্পিত করে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলল এবং দ্রুতগতিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে রণাঙ্গনের নিকটে পৌঁছে গেল। আমের বললেন, মুসলমানগণ, তোমরা তরবারি হাতে নাও এবং অগ্নিপূজকদের উপর আক্রমণ চালাও।

মুসলমানরা পুনরায় আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে তরবারি উঁচু করে ঘোড়ার বাগ ঢিলা করে দিল।

তাঁদের তাকবীরধ্বনিতে সমগ্র রণময়দান কেঁপে ওঠল। হেরাতের দুর্গের পাঁচিলে দাঁড়িয়ে যেসব মজুসি হল্লা করে-করে সঙ্গীদের উৎসাহিত করছিল,

মুসলমানদের এই তাকবীরধ্বনি তাদেরও কানে গিয়ে ধাক্কা দিল। তারা আমেরের বাহিনীটিকে আসতে দেখল। তারা ম্লানকণ্ঠে বলল, হতভাগা মুসলমানদেরও সাহায্য এসে পড়েছে!

তারা পূর্বাপেক্ষা আরও জোরে চিৎকার জুড়ে দিল। তারা মজুসিদের সাহস বাড়ানোর চেষ্টা করল।

আমের ও তার সঙ্গীরা ময়দানে পৌঁছেই জোরদার আক্রমণ শুরু করে দিল। তাদের শিশু ও নারীদের বাহন মাঠের একধারে দাঁড়িয়ে রইল।

আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.)-এর সঙ্গীরা অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করছিল। তাঁরা মজুসিদের সারির মধ্যে এবং মজুসিরা তাঁদের সারির মধ্যে ঢুকে গেল। তাঁরা পরম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল।

সময়টা ছিল দুপুরবেলা। রণাঙ্গনের সর্বত্র রোদ ছড়িয়ে রয়েছে। এই রোদের মধ্যে তরবারিগুলো চিকচিক করছিল। ঘোরতর লড়াই চলছিল।

আমের বাহিনীর তাকবীরধ্বনি আহনাফ ইবনে কায়েস ও তাঁর সঙ্গীদেরও কানে পৌঁছেছে। আহনাফ ধরে নিয়েছিলেন, তাঁরই প্রেরিত ইউনিটটি পরিকল্পনা অনুসারে তাকবীরধ্বনি দিয়ে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অন্যান্য মুসলমানরা মনে করেছে, সাহায্য এসেছে। তাদের সাহস বেড়ে গেল এবং অধিক বীরত্বের সঙ্গে আক্রমণ চালাল।

আমের ও তার সঙ্গীরা এমন জোরদার আক্রমণ করল যে, মজুসিরা তা প্রতিহত করতে পারল না। তাঁরা পরম বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে তরবারি চালাতে লাগল এবং প্রাণহানি ঘটাতে শুরু করল। যাকেই সামনে পাচ্ছে, অবলীলায় তাকেই হত্যা করে ফেলছে। শত্রুসেনারা যেন জীবন দিতেই তাদের তরবারির আওতায় আসছে। মজুসিদের হাতে ঢাল-তরবারি সবই আছে। কিন্তু তাদের সব অস্ত্রই যেন অকেজো হয়ে গেছে।

আমেরের বাঁ-হাতে পতাকা, ডান হাতে তরবারি। প্রতিটি আক্রমণেই তিনি পতাকাটিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরছেন। ফলে পতাকাটি পত্‌পত্‌ করে উড়ছে আর তিনি জোরদার আক্রমণ করে-করে মজুসিদের মস্তক উড়িয়ে দিচ্ছেন। তাঁর নিরাপত্তার জন্য দু-জন মুসলমান তাঁর সঙ্গে আছে। কোনো শত্রুসেনা তাঁর উপর আক্রমণ চালালে তারাও ঢাল দ্বারা তা প্রতিহত করছে এবং পালটা আক্রমণ চালিয়ে তাকে হতাহত করছে।

সাফওয়ান এত উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে যে, ক্ষোভে তার চেহারা লাল হয়ে গেছে। সে অতিশয় শক্তিমত্তা ও বীরত্বের সঙ্গে আক্রমণ করছে এবং

প্রতিটি আক্রমণে কমপক্ষে একজন করে মজুসিকে হত বা আহত করছে।

আমেরের প্রতিজন সৈনিক পরম বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করছে। তাদের প্রত্যেকের ঐকান্তিক কামনা, কীভাবে বেশি-বেশি শত্রুসেনাকে হত্যা করে বিজয় অর্জন করা যায়।

মজুসিরাও কম সাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছে না। তাদের তরবারিগুলোও জোরে-শোরে সঞ্চালিত হচ্ছে। অত্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ চলছে। মুসলমানরা সত্যিকার অর্থেই মরণপণ যুদ্ধ লড়ছে। তারা লাশের-উপর-লাশ বিছিয়ে চলেছে।

চব্বিশ.

মজুসিরা সংখ্যায় বেশি আর মুসলমানরা অনেক কম। তাই মজুসিরা আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত ছিল যে, তারা মুসলমানদেরকে মেরে-পিষে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু মুসলমানরা যখন প্রবল উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং পরম সাহসিকতা, দৃঢ়তা ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই শুরু করল, তখন তারা টের পেল যে, তাদের ধারণা সঠিক ছিল না।

মুসলমানরা মজুসিদের প্রায় সবগুলো সারি ভেঙে দিয়েছে। তারা প্রতিপক্ষের যোদ্ধাদের হতাহত করে-করে সারিগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগল।

মজুসিদের সারিগুলো অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। তাদের সারিগুলো যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ততদূর পর্যন্ত লড়াই চলছে। উভয় পক্ষের তরবারির ঝনঝন শব্দে রণাঙ্গন ভয়ে যেন কাঁপছে।

ঘোরতর যুদ্ধ চলছে। মজুসিরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। একদল মজুসি পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে-করে তাদের যোদ্ধাদেরকে উৎসাহিত করছে। হাজার-হাজার ঘোড়ার হ্রেষারবে পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠেছে। সব মিলে রণাঙ্গনে রোজ কেয়ামতের বিভীষিকা বিরাজ করছে।

মুসলমানদের মুখে কোনো সাড়া নেই। তারা তাদের সবটুকু শক্তি যুদ্ধে ব্যয় করছে এবং দাঁতে দাঁত পিষে পূর্ণ জোশ ও ক্ষোভের সঙ্গে জোরদার আক্রমণ করে-করে মজুসিদের হত্যা করছে। মুসলমানদের তরবারির কোপে মজুসিদের মাথাগুলো দেহ থেকে এমনভবে ছিঁড়ে পড়ছে, যেন লাঠির খোঁচার বৃন্তচ্যুত হয়ে গাছ থেকে টুপটুপ করে পাকা আম মাটিতে পড়ছে। তবে এমন নয় যে, শুধু মজুসিরাই নিহত হচ্ছে। তারাও কিছু-কিছু মুসলমানকে শহীদ করছে। তবে যেহেতু মুসলমান কঠিনপ্রাণ মানুষ এবং

রণবিদ্যায় পারদর্শী, তাই ঢাল-তরবারি দ্বারা দুশমনের আক্রমণ প্রতিহত করে ফেলছে। দু-চারজন যারা আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে, তারা শহীদ হয়ে যাচ্ছে।

যুদ্ধ এত ঘোরতর রূপ লাভ করেছে যে, একটি মাথা দেহচ্ছিন্ন হয়ে অনেকগুলো কর্তিত মাথার উপর গিয়ে পড়ছে। এক-একটি হাত কর্তিত হয়ে সজোরে নিক্ষিপ্ত হয়ে আরেকজনের গায়ে গিয়ে আঘাত হানছে যে, তার আঘাতে লোহার আঘাতের মতো সে-ও আহত হয়ে যাচ্ছে।

মাথাকাটা দেহগুলো গোড়াকাটা গাছের মতো ধপাস-ধপাস করে লুটিয়ে পড়ছে এবং সেগুলো থেকে এমনভাবে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, যেন রক্তভর্তি মশকের মুখ খুলে দেওয়া হয়েছে। অধিক রক্তপ্রবাহের কারণে রণাঙ্গনের মাটি ভিজে পিচ্ছিল হয়ে গেছে। এখন বেশিরভাগ মানুষ ও ঘোড়া পিছলে যাচ্ছে। আর পিছল খেয়ে যে একবার পড়ে যাচ্ছে, তার আর উঠে দাঁড়ানো কপালে জুটছে না। কারও-না-কারও তরবারি তার ইহলীলা সাঙ্গ করে দিচ্ছে। শুধু এটুকুই নয় যে, মাটিতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, বরং সর্বত্র মাথার উপর রক্তের বৃষ্টিও চলছে। তরবারিগুলো যখন হত্যা করে উপরের দিকে উত্থিত হচ্ছে, তখন চারদিক বৃষ্টির মতো রক্তফোঁটা ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই রক্ত যোদ্ধাদের পোশাক, মুখমণ্ডল ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে রঞ্জিত করে দিচ্ছে।

কাপুরুষ ও নবীন যোদ্ধারা এই ভয়ানক দৃশ্য দেখে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। তবে সাহসী ও অভিজ্ঞদের জোশ-জয্‌বা ও সাহস আরও বেড়ে গেছে। তারা পূর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষিপ্রতা ও সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করছে।

মজুসিদের সংখ্যা ত্রিশ হাজারের কম নয়। ত্রিশটি ইরানি পতাকা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। একজন মুসলমানের মোকাবেলায় তিজন করে মজুসি সৈন্য। তাছাড়া দশ হাজার সৈন্য পেছনে রিজার্ভ রয়ে গেছে, যারা ইঙ্গিত পেলেই ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। প্রয়োজনে যুদ্ধে অংশে নেওয়ার মতো সৈন্য দুর্গে আছে পঞ্চাশ হাজার।

কিন্তু তারপরও প্রতিপক্ষের এই সৈন্যাধিক্যে মুসলমানদের কোনোই পরোয়া নেই। তারা অত্যন্ত নির্ভীক মনে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এবং ক্ষিপ্রগতিতে আক্রমণ চালিয়ে-চালিয়ে মজুসিদের হত্যা ও জখম করছে। একাধিক শত্রুসেনাকে হত্যা না করে কোনো মুসলমান শহীদ হচ্ছে না। এক-একজন মুসলমানের বিনিময়ে দশ থেকে পনেরো জন মজুসি সৈন্য জীবনদান করছে।

মজুসিরাও যখন তাদের কোনো সৈন্য মারা যাচ্ছে, তাতে তারা অধিক প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠছে এবং পূর্বাপেক্ষা অধিক উদ্দীপনার সঙ্গে আক্রমণ চালাচ্ছে। কিন্তু মুসলমানদের প্রবল প্রতিরোধ তাদের উত্তেজনার জোয়ারকে স্তিমিত করে দিচ্ছে।

মুসলমানদের হাত-পা দুটি করে, মজুসিদেরও দুটি করে। মুসলমানদের কাছেও তরবারি, মজুসিদের কাছেও তরবারি। বরং মুসলমানদের তরবারি ছোট ও হালকা; কিন্তু মজুসিদের তরবারি লম্বা ও ভারী। তাদের ঢাল মুসলমানদের ঢাল অপেক্ষা চওড়া ও মজবুত। ইরানিরা শক্তিশালী দেহের অধিকারী; কিন্তু মুসলমানরা ক্ষীণকায় ও দুর্বল। কিন্তু তথাপি মজুসিরা মরছে বেশি, মুসলমান শহীদ হচ্ছে কম। মজুসিদের কমান্ডাররা ভেবে কূল পাচ্ছে না, এমনটি কেন হচ্ছে! তারা বিস্ময়ে হতবাক্।

তার একটিই কারণ। তা হলো, মুসলমান মৃত্যুকে ভয় করে না। তারা জানে, মৃত্যু একটি অবধারিত বিষয়। শাহাদাতের মৃত্যুর চেয়ে সৌভাগ্যের মৃত্যু দ্বিতীয়টি আর নেই। মুসলমান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে শাহাদাতবরণ করলে সঙ্গে-সঙ্গে জান্নাতে পৌঁছে যাওয়া যায়। আর জান্নাত এমন একটি আবাস, যেখানে কোনো দুঃখ-কষ্ট বা পেরেশানি নেই। সেটি শুধুই শান্তি আর শান্তির জায়গা। যে-ব্যক্তি জান্নাত পেয়ে গেল, সে জীবনের সকল সুখ-আনন্দ পেয়ে গেল। শহীদ যখন জান্নাতের সুখ-আনন্দ পেয়ে যাবে, তখন সে বারবার শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে।

এর বিপরীতে মজুসিদের এমন কোনো বিশ্বাস ছিল না। তারা পরকাল বিশ্বাস করে না। তারা অগ্নি ও তারকার পুজারি। তারা আল্লাহর অবাধ্য। মৃত্যুর পর তাদের কোনো আশা-ভরসা নেই। তাই তারা জীবন দিতে ও মৃত্যুকে বরণ করে নিতে ভয় পায়।

যাহোক, মুসলমানরা মজুসিদের হতাহত করে চলছিল। যুদ্ধ করতে-করতে জোহরের সময় হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে মুসলিম বাহিনীর কয়েকজন সৈন্য একদিকে সরে গেল। তাঁরা তায়াম্মুম করে আযান দিল। আযান শুনেই মুসলিম বাহিনীর অর্ধেক সৈন্য ময়দান থেকে সরে গিয়ে নামাযের প্রস্তুতি নিল। বাকি অর্ধেক যুদ্ধে রত রইল।

মুসলমানদের সেনাসংখ্যা কমে যাওয়ায় মজুসিরা মনে করল, এই তো সুযোগ। তারা জোরদার আক্রমণ চালাল। কিন্তু মুসলমানরা জগদ্দল

পাথরের মতো অবিচলই রইল এবং বীরত্বের সঙ্গে পালটা আক্রমণ চালাল। মজুসিরা কয়েক পা পিছনে সরে গেল। এই আক্রমণেও তাদের বহু সৈন্য মারা গেল।

যেসব সৈন্য নামায পড়তে সরে গিয়েছিল, তারা এক রাকাত নামায পড়ে তাড়াতাড়ি রণাঙ্গনে ফিরে এল আর এতক্ষণ যারা ময়দানে ছিল, তারা পেছনে সরে গিয়ে অবশিষ্ট এক রাকাতে শরীক হয়ে গেল। তারাও এক রাকাত আদায় করে অস্ত্রসংবরণ করে ময়দানে ফিরে এসে এমনভাবে আক্রমণ চালাল, যেন তারা নতুন প্রাণ নিয়ে এসেছে। তারা জোরদার আক্রমণ চালিয়ে শত্রুসেনাদেরকে খর-কুটা ও শসা-খিরার মতো কাটতে শুরু করল। লাশের-উপর-লাশ ফেলে দিল এবং রক্তের নদী বইয়ে গেল।

এত রক্তপাত দেখে মজুসিরা ভয় পেয়ে গেল। তারা পিছু হটতে শুরু করল। তাদের কমান্ডাররা তাদেরকে যুদ্ধে দৃঢ়পদ থাকতে আহ্বান জানাল, আত্মমর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিল, ইয়ায্দাজার্দ-এর ভয় দেখাল এবং নিজেরাও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মজুসিরা আত্মসংবরণ করে ফিরে এল। তাদের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি হলো। মুসলমানরা তাদের আক্রমণ প্রতিরোধে সর্বশক্তি ব্যয় করল। কিন্তু ব্যর্থ হলো। তারা কয়েকপা পেছনে সরে এল।

এমন সময় আল্লাহু আকবার ধ্বনি উত্থিত হলো। মুসলমানদের যে-সেনাদলটি আমেরের মুখোমুখি হয়েছিল, তারা এসে পৌঁছেছে। এখনও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি বলে বাহিনীটি একদম তরতাজা। এসেই তারা এমন জোদরার আক্রমণ চালালো যে, মজুসিদের সকল সৈন্য ভয়ে কেঁপে ওঠল। আবার মারমার-কাটকাট শুরু হয়ে গেল। মজুসিরা পুনরায় পিছপা হতে শুরু করল।

তাদের কমান্ডাররা আবারও হুংকার ছাড়ল এবং তাদের মাঝে উত্তেজনা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করল। কিন্তু কুপিতে তেল না থাকলে যেমন সলিতার আগুন আস্তে-আস্তে নিভে যায়, তেমনি এবার অগ্নিপুজারি সৈন্যদেরও জোশ-জয্বা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এখন তাদের মাঝে মোকাবেলার কোনোই সাহস অবশিষ্ট নেই। তাদের তরবারি অকর্মা হয়ে গেছে এবং তারা ঢালগুলো হাতে নিয়ে নির্জীবের মতো দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু মুসলমানরা তাদেরকে ছাড়বে কেন। তাদের ভেড়া-বকরির মতো যবাই করতে শুরু করল।

মজুসিরা সাহস হারিয়ে পালাতে শুরু করল। তারা দুর্গের দিকে মুখ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। কিন্তু যখন দুর্গের নিকটে গিয়ে পৌঁছুল, অমনি মুসলমানরা তাদের পথ আটকে দিল। তারা দুর্গে ঢুকতে পারল না। মুসলমানরা সেখানেও লাশের স্তূপ জমিয়ে তুলল।

আমের ও সাফওয়ান লড়াই করতে-করতে এদিকে চলে এসেছিলেন। তারাই মজুসিদের দুর্গে প্রবেশের পথ আটকে দিয়েছেন।

পঁচিশ.

যুদ্ধের এক শোচনীয় পর্যায়ে মজুসিরা ধরে নিয়েছিল, রণাঙ্গন ত্যাগ করে দুর্গে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত আর কোনো উপায় নেই। তাই তারা দুর্গের দিকে ছুটে গেল। কিন্তু আমেরের যোদ্ধারা তাদেরকে দুর্গের কাছেও ভিড়তে দিল না। তাতে তারা বিচলিত ও হতাশ হয়ে পড়ল। তাদের কমান্ডাররা যখন দেখল যে, মুসলমানরা তাদের ও দুর্গের মাঝে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে ফেলেছে, তখন তারা ভয়ে কেঁপে ওঠল।

কমান্ডাররা চোখ তুলে তাকাল। দেখল, অল্প কজন মুসলমান এই প্রতিরোধটা গড়ে তুলেছে। তখন তারা হাঁক দিয়ে বলল, বীর সৈনিকগণ, ভয়ের কোনো কারণ নেই। ওরা অল্প কজন শত্রুসেনা মাত্র। ওরা ঘটনাক্রমে এদিকে এসে পড়েছে। ওদেরকে হত্যা করে তোমরা পথ তৈরি করে নাও।

মজুসিরা ভালোভাবেই জানত যে, জীবনে রক্ষা পেতে হলে দুর্গে ঢুকে পড়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। তাই তারা তীব্রবেগে আমেরের সঙ্গীদের উপর আক্রমণ চালাল। মুসলমানরাও শক্তপায়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে শুরু করল। লড়াই ঘোরতর রূপ ধারণ করল। প্রবলবেগে তরবারি পরিচালিত হতে লাগল। লাশ পড়তে লাগল, রক্তের বৃষ্টি ঝরতে লাগল এবং ডাক-চিৎকারে কানের পর্দা ফেটে যেতে শুরু করল।

আমেরের হাতে ইসলামি পতাকা ছিল। তিনি পতাকাটি উঁচিয়ে ধরেই আক্রমণ করছেন এবং প্রতিটি আক্রমণে কমপক্ষে একজন করে মজুসিকে হত্যা করছেন। সাফওয়ান ও আরও কয়েকজন মুসলমান তাঁর সঙ্গে ছিল। তারা তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে এবং যুদ্ধও করছে। আমেরের সঙ্গীরা পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছে। চতুর্দিক থেকে মজুসিরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে এবং তাদের উপর তরবারির বৃষ্টিবর্ষণ করছে। শাণিত তরবারিগুলো

তাদের উপর আঘাত হানছে এবং তারা দৃঢ়তার সঙ্গে আঘাত প্রতিহত করছে। অতিশয় ঘোরতর যুদ্ধ চলছে।

আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) দূর থেকে আমেরের পতাকা দেখে ফেলেছেন। তিনি বিস্মিত হলেন যে, ওদিকে মুসলমান গেল কোথা থেকে! তিনি তার সঙ্গীদের বললেন, ইসলামের বীর সৈনিকগণ, কিছু মুসলিম সৈনিক দুর্গের সম্মুখে মজুসিদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। আমি বুঝতে পারছি না, ওরা ওখানে গেল কীভাবে। তোমরা ছুটে যাও এবং ওদের সাহায্য করো।

একদল মুসলিম সৈনিক ওদিকে ছুটে গেল। কিন্তু বিপুলসংখ্যক মজুসি সৈন্য তাদের ও আমেরে মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। মুসলমানরা তাদের উপর আক্রমণ করে বসল এবং তীব্র আক্রমণে তাদের মেরে-কেটে হটিয়ে সামনের দিকে এগোতে শুরু করল।

মজুসি বাহিনী তাদেরও উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাতে পুনরায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। তারপর মানুষ নিহত হতে, লাশ পড়তে ও রক্ত ঝরতে শুরু করল। হট্টগোল আরও বেড়ে গেল।

মুসলমানরা মজুসিদের সারিগুলো চিরে ভেদ করে তাদের সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে যেতে চেষ্টা করছে। কিন্তু মজুসিরা পায়ে-পায়ে তাদেরকে প্রতিহত করছে।

আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) অস্থির ও বিচলিত মনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি আমেরের সঙ্গীদের পরিণামচিন্তায় ব্যাকুল। এক সময় তিনি সশব্দে বলে উঠলেন, তোর জন্য আমার আক্ষেপ হয় ওহে ইবনে কায়েস। তোর মুসলমান ভাইয়েরা শত্রুর হাতে অবরুদ্ধ আর তুই কিনা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিস। কী উত্তর দিবি তুই কাল হাশরে আল্লাহর সমীপে?

তিনি এগিয়ে চললেন। তাঁর নিজস্ব ইউনিটটি তাঁর পেছনে প্রস্তুত দণ্ডায়মান ছিল। তারাও তাঁর পেছনে-পেছনে এগিয়ে চলল। মজুসিদের নিকটে পৌঁছে তারা এমন তীব্রতার সঙ্গে আক্রমণ চালাল যে, সামনের দিককার সৈন্যদেরকে ঠেলে পেছনের সৈন্যদের উপর ফেলে দিল। তারপর নিজেদের রক্তপিপাসু তরবারিগুলো দ্বারা অগণিত মজুসিকে হত্যা করে তাদের সারিগুলো চিরে ভেদ করে দ্রুতগতিতে এগোতে শুরু করল।

এদের এমন দুঃসাহসী আক্রমণে যেসব মুসলিম সৈন্য পূর্ব থেকে যুদ্ধ জড়িয়ে ছিল, তাদের উদ্দীপনা বেড়ে গেল। তারা পূর্বাপেক্ষা অধিক বীরত্বের সঙ্গে সিংহের মতো শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের

আক্রমণের ধারা-ই বলছিল যে, তারা শত্রুসেনাদের কুপোকাত করে আপন ভাইদের সঙ্গে মিলিত হতে উদগ্রীব।

আমের অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। তাঁর তরবারি যে-মজুসিরই উপর আঘাত হানছে, তাকেই যমের হাতে তুলে দিচ্ছে। মজুসিরা চাচ্ছে, তাঁকে হত্যা করে তাঁর সঙ্গীদেরকে তাড়িয়ে দেবে এবং দুর্গে ঢুকে জীবন রক্ষা করবে।

একপর্যায়ে কয়েকজন মজুসি আমেরের উপর আক্রমণ চালাল। তাদের একজনকে তিনি হত্যা করে ফেললেন আর একজনকে সাফওয়ান মৃত্যুর কোলে তুলে দিল। কিন্তু দুজন মজুসির তরবারি আমেরের গায়ে আঘাত হানল। আমের একটির আঘাত নিজের তরবারিতে নিয়ে নিলেন বটে; কিন্তু অপরটি তার কাঁধে গিয়ে বসে গেল। তাতে কাঁধের অনেকখানি জায়গা কেটে গভীর ক্ষত হয়ে গেল। আমের ঝট করে এক মজুসির উপর আক্রমণ চালালেন এবং তাকে মেরে ফেললেন। অপরজনের মাথাটা উড়িয়ে দিল সাফওয়ান। কিন্তু আমেরের জখম থেকে খুনের ফোয়ারা ফুটতে শুরু করল। তিনি সাফওয়ানকে বললেন, বৎস, পতাকাটি হাতে নাও। আমি জখমের কষ্ট অনুভব করছি। আল্লাহ আমাকে শাহাদাতের নেয়ামত দান করতে পারেন।

সাফওয়ান ঝটপট পতাকাটি হাতে নিয়ে নিল এবং ক্ষিপ্তমনে ও ক্ষিপ্রগতিতে আক্রমণ করে কয়েকজন মজুসিকে হত্যা করে ফেলল আর অবশিষ্টদেরকে তাড়িয়ে দিল। সে এক মুসলমানকে বলল, ভাই, কমান্ডারের ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে দাও; আমি মজুসিদের প্রতিহত করি।

মুসলমান সৈনিক নিজের মাথার পাগড়িটি ছিঁড়ে তাড়াতাড়ি করে আমেরের জখমে পট্টি বেঁধে দিল। সাফওয়ান মজুসিদের প্রতিহত করতে ও লড়তে থাকল। একজন মজুসিকেও আর সে কাছে ভিড়তে দিল না।

কমান্ডার আমের আহত হওয়ায় সাফওয়ান পূর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষিপ্ত ও ক্ষিপ্র হয়ে ওঠল। নিজের নিরাপত্তার চিন্তা বাদ দিয়ে সে অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে আক্রমণ করছে। সাফওয়ান এখন বেপরোয়া লড়াকু। প্রতিটি আক্রমণে এক-দুজন শত্রুসেনাকে হত বা আহত করছে। তার দুঃসাহসী আক্রমণের ফলে যে-ই তার নাগালে আসছে, সে-ই প্রাণ হারাচ্ছে।

একবার সে একদল শত্রুসেনার উপর আক্রমণ চালাল। বিক্রমি আক্রমণ চালিয়ে মজুসি সৈনিকদের হত্যা করতে লাগল। কিন্তু এক

সুযোগে দুজন মজুসি তার উপর আক্রমণ করে বসল। এই আক্রমণ সম্পর্কে উদাসীন ছিল সে। ঘটনাক্রমে তার এক সঙ্গী বিষয়টি দেখে ফেলল। সে ছুটে এসে একজনের উপর আক্রমণ চালিয়ে তার মাথাটা উড়িয়ে দিল। অপরজনকে সাফওয়ান ঠিকানা লাগিয়ে দিল।

সাফওয়ানের সঙ্গী বলল, সাবধানতা অবলম্বন করো যুবক। এই মুহূর্তে তুমি বাহিনীর কমান্ডার। তুমিও যদি আক্রান্ত হও– আহত বা নিহত হও, তাহলে বাহিনী সংকটে পড়ে যাবে। আমরা প্রশ্নের সম্মুখীন হবো। আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.)-এর কাছে আমাদের কোনো জবাব থাকবে না।

এবার সাফওয়ান আত্মসংবরণ করে হামলা শুরু করল। কিন্তু তারপরও মাঝে-মধ্যে উদাসীন হয়ে যাচ্ছে এবং হঠাৎ সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করে শত্রুসেনাদের হতাহত করছে।

সাফওয়ান প্রবল উদ্দীপনার বশবর্তী হয়ে আমেরের কথা ভুলে গিয়েছিল। এবার হঠাৎ তাঁর কথা মনে পড়ল। তাই লড়াই করতে-করতে তাঁর কাছে পৌঁছে গেল। দুজন মুসলমান তাঁকে নিরাপত্তা দিচ্ছে– তারা কোনো মজুসিকে কাছে ঘেষতে দিচ্ছে না।

আমের দুর্বল হয়ে পড়েছেন। ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। সাফওয়ান আলতোভাবে তাঁকে ঘোড়া থেকে নামাল এবং তার চারপাশে দুজন মুসলমানের পাহারা লাগিয়ে দিল। তাদের বলে দিল, যেন কাউকে তার কাছে আসতে না দেয়। তারপর সেখান থেকে সরে সে পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হলো।

এখনও ঘোর যুদ্ধ চলছে। হাত-পা ও মাথা কর্তিত হচ্ছে। লাশের-গায়ে-লাশ পতিত হচ্ছে। রক্তের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে এবং যোদ্ধাদের পোশাক রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে।

মজুসিরা আমেরের সঙ্গীদেরকে হত্যা করে দুর্গে প্রবেশ করার চেষ্টা করছিল আর মুসলমানরা মজুসিদের হটিয়ে তাদের ভাইদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টায় রত ছিল। তাই উভয়পক্ষে মরণপণ যুদ্ধ চলছে। একপক্ষ অপরপক্ষকে সরাতে ও কুপোকাত করতে সর্বশক্তি ব্যয় করছে।

অবশেষে মুসলমানদের চাঁপ প্রবল হয়ে ওঠল। তাদের দুঃসাহসী আক্রমণ মজুসিদের পা উপড়ে দিল। ফলে যে যেদিকে পথ দেখল, মুখ তুলে পালাতে শুরু করল। একটি দল দুর্গের দিকে ছুটে গেল। হেরাতের

ফটক খোলা ছিল। তারা দুর্গে প্রবেশ করতে উদ্যত হলো। পাঁচিলের উপর যেসব মজুসি ছিল, তারা চিৎকার করে-করে তাদেরকে দুর্গে প্রবেশের আহ্বান জানাতে লাগল।

আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.)-এর কয়েকটি ইউনিট আমেরের সঙ্গীদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তারা যখন দেখল, মজুসিরা দুর্গে ঢুকে যাচ্ছে, তখন তারা ওদের পিছনে ছুটে গিয়ে ওদের হতাহত করতে-করতে তারাও দুর্গে ঢুকে গেল।

দুর্গে মজুসি বাহিনী ছিল। তারা মুসলমানদের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে গেল। দুর্গের আঙিনায় ঘোরতর লড়াই শুরু হয়ে গেল। তা দেখে দুর্গের বাসিন্দারা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠল। তারা এমন বিকট শব্দে ডাক-চিৎকার শুরু করে দিল যে, তাতে শুধু দুর্গই কেঁপে ওঠল না, দুর্গের বাইরের লোকেরাও বুঝে ফেলল দুর্গের ভেতরে কিছু একটা হচ্ছে।

দুর্গে এখনও মজুসিদের পলায়ন অব্যাহত রয়েছে। মুসলমানরা তাদেরকে ধাওয়া করে-করে হত্যা করছে। আহনাফ (রা.) আমেরের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। আমেরের প্রহরীরা তাকে জানাল, সাফওয়ান বাহিনী নিয়ে দুর্গে ঢুকে পড়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে আহনাফ (রা.) তাঁর বাহিনীটি নিয়ে ছুটে গেলেন এবং দুর্গের ভেতরে ঢুকে পড়লেন। ওখানে যুদ্ধ চলছিল। আহনাফ ও তাঁর সঙ্গীরা এমন তীব্র আক্রমণ চালালেন যে, মজুসিরা দিক-দিশা হারিয়ে ফেলল। বহু খোরাসানি মারা গেল।

এবার মজুসিরা ভয়ে তটস্থ হয়ে ওঠল। এখন না তাদের দুর্গের ভেতরে আশ্রয় আছে, না দুর্গের বাইরে। মুসলমানদের রক্তপিপাসু তরবারিগুলো তাদের রক্তপানের জন্য সবখানেই উপস্থিত। সংখ্যার আধিক্য তাদের কোনোই কাজে এল না। এখন তারা যেদিকেই তাকাচ্ছে, মৃত্যু ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তাদের আর এখন আত্মসমর্পণ ছাড়া কোনো পথ খোলা নেই। মজুসিরা অস্ত্র ফেলে দিল এবং নিরাপত্তা-নিরাপত্তা বলে চিৎকার জুড়ে দিল। মুসলমানরা রক্তপাত বন্ধ করে তাদের গ্রেফতার করতে শুরু করল।

ছাব্বিশ.

ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর হেরাতের উপর মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। দুর্গের মজুসিরা যারপরনাই চিন্তিত ও বিষণ্ন হয়ে পড়ল।

বিশেষ করে মহিলারা বেশি চিন্তিত হয়ে ওঠল। কারণ, তারা তাদের নেতৃস্থানীয়দের মুখ থেকে শুনেছে, মুসলমান যে-নগরী বা দুর্গ জয় করে নেয়, তারা সেখানকার পুরুষদেরকে হত্যা করে ফেলে আর নারীদেরকে দাসী বানায়।

কিন্তু তারা জানত না যে, এই তথ্য সঠিক নয়। এ শুধুই অপপ্রচার ও মিথ্যা প্রোপাগান্ডা। ইসলাম ও মুসলিম জাতির মর্যাদা বিনষ্টের জন্য এই আধুনিক যুগে যেমন অপপ্রচার চালানো হচ্ছে, তেমনি প্রাচীন যুগেও এমনটি করা হতো। ইরানের মজুসিরাও সেই একই পন্থা অবলম্বন করেছিল। তাদের নেতারা তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে, মুসলমান একটি জংলি জাতি আর ইসলাম একটি অচল ধর্ম।

অথচ বাস্তবতা ছিল পুরোপুরি তার বিপরীত। কোনো রাজ্য জয় করার পর মুসলমান গণহত্যা চালিয়ে সেখানকার পুরুষদেরকে হত্যা করেছে– ইতিহাসে এমন কোনো প্রমাণ নেই। বরং তাদের রীতি ছিল পরাজিত জাতির যারা জিযিয়া দিতে সম্মত হতো, তাদেরকে আপন বাস্তুভিটায় যথারীতি বহাল রাখত। আর যারা জিযিয়া আদায়পূর্বক মুসলমানদের বশ্যতা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাত, তাদেরকে দেশান্তর করে দিত। মহিলাদের যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তাদের থেকে পণ আদায় করে মুক্ত করে দিত। আর যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, তাদেরকে দাসী বানানো হতো। কিন্তু এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি যে, মুসলমান পরাজিত জাতির মহিলাদের সম্ভ্রমহানি করেছে। তারা আল্লাহকে ভয় করত এবং এ-কাজটিকে ঘৃন্যতম পাপ মনে করত। তারা পরিপূর্ণরূপে ইসলামের বিধান মেনে চলত।

আইনের পরিভাষায় এ-জাতীয় অপরাধকে 'যুদ্ধাপরাধ' বলা হয়। ইসলামের আইনে 'যুদ্ধাপরাধ' অত্যন্ত ঘৃণ্য অপরাধ। ইসলাম মুসলমানদেরকে এই অপরাধের কাছে ঘেষবারও অনুমতি দেয় না। যুদ্ধাপরাধ সে-যুগেও করেছে অমুসলিমরা, আজও করছে তথাকথিত সভ্য অমুসলিম জাতিঘোষ্ঠী। ইসলামের অনুসারী মুসলমান এই অপরাধ থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

মুসলমানরা ইরানি মহিলাদেরকে অভয় দিল, সান্ত্বনা দিল। কিন্তু হেরাতের কম মানুষই আরবি জানত। বিশেষ করে মহিলারা মোটেও জানত না। তাদেরকে উদ্দেশ করে মুসলমানরা কী বলল, তা তারা বুঝল

না। তবে তারা মুসলমানদের আচরণে বুঝে নিল, তারা তাদের সঙ্গে কঠোর বা মানবতাবিরোধী আচণ করতে চাচ্ছে না। কিন্তু তাতেও তাদের ভয় দূর হলো না।

আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) শুনেছেন, তাঁদের একটি সহযোগী ইউনিট এসেছে এবং সেই ইউনিটের কমান্ডার আমের যুদ্ধে আহত হয়েছেন। তিনি সর্বাগ্রে তাকে দেখতে রওনা হলেন। পথে সাফওয়ানের সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। সাফওয়ানকে তিনি চিনতেন। তিনি সাফওয়ানকে আগ বাড়িয়ে সালাম দিলেন। সাফওয়ান সালামের উত্তর দিল।

আহনাফ (রা.) বললেন, তুমিও এসেছ সাফওয়ান!

সাফওয়ান বলল, জি, আমি কমান্ডার আমেরের সঙ্গে এসেছি। তিনি যুদ্ধে আহত হয়েছেন।

আহনাফ (রা.) বললেন, সম্ভবত তিনি তাঁর পতাকাটি তোমাকে দিয়েছিলেন।

সাফওয়ান বলল, জি, আহত হয়ে যখন তিনি দুর্বলতা অনুভব করলেন, তখন তিনি পতাকাটি আমার হাতে অর্পণ করেছিলেন।

এক আরব বলল, কমান্ডার সাফওয়ান এই পতাকার ছায়ায় ভীষণ রক্তক্ষয় করেছেন। পতাকাটি হাতে পাওয়ার পর তার জোশ ও সাহস কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। ইনি শত্রুসেনাদের লাশের স্তূপ জমিয়ে তুলেছেন।

আহনাফ (রা.) বললেন, দেখতে হবে না ছেলেটা কার! আয্রা গোত্রের উসাইদ-এর পুত্র এ। তিনিও বীর ছিলেন, এও বীর হয়েছে। আচ্ছা, চলো, তোমাদের কমান্ডারকে দেখে আসি।

আমের এখনও দুর্গের বাইরে মাটিতে পড়ে আছেন। আহনাফ (রা.) সাফওয়ানের সঙ্গে সেখানে পৌঁছে গেলেন। আমের-এর চোখ দুটো বোজা। আহনাফ (রা.) পাশে দাঁড়িয়ে সালাম দিলেন। আমের চোখ খুলে তাকালেন। সাফওয়ান বলল, সেনাপতি আহনাফ এসেছেন।

আমের কোনো ভূমিকা ছাড়াই জিজ্ঞেস করলেন, দুর্গ কি জয় হয়েছে?

আহনাফ (রা.) উত্তর দিলেন, আল্লাহর ফজলে দুর্গ জয় হয়েছে।

আমের বললেন, আলহামদুলিল্লাহ।

আহনাফ (রা.) কয়েকজন মুসলমানকে উদ্দেশ করে বললেন, একে তুলে দুর্গের ভেতরে নিয়ে যাও আর ডাক্তার আবু আবদুল্লাহকে এক্ষুণি ডেকে চিকিৎসা করাও।

কয়েকজন মুসলমান আমেরকে তুলে নিয়ে গেল। একজন ডাক্তার আবু

আবদুল্লাহকে ডাকতে চলে গেল। আহনাফ (রা.) সাফওয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, আমের কি একা এসেছে?

না, তার কন্যা আফীরাও সঙ্গে এসেছে।

কোথায় মেয়েটি?

আমাদের বাহিনীতে বেশ কজন নারী ও শিশু এসেছে। তাদেরকে রণাঙ্গনের এক কিনারায় দাঁড় করিয়ে আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। সম্ভবত এখনও তারা ওখানেই আছে।

আহনাফ (রা.) এক অশ্বারোহীকে আদেশ করলেন, তুমি রণাঙ্গনের কিনারায় ছুটে যাও। ওখানে কয়েকটি মাহমাল পাবে। সেগুলোর মধ্য থেকে আফীরার মাহমালটি দুর্গে নিয়ে এসো। আর অন্যগুলোকে নারীক্যাম্পে পাঠিয়ে দাও।

অশ্বারোহী ছুটে গেল।

যেসব মুসলমান আমেরকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল, আহনাফ (রা.) ও সাফওয়ান তাদের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করলেন। হাঁটতে-হাঁটতে তিনি এক অফিসারকে বললেন, কিছু লোককে শহীদ ও মুসলমান জখমিদের একত্রিত করতে বলে দাও। অনতিবিলম্ব জখমিদের ব্যান্ডেজ-চিকিৎসা হওয়া দরকার। জানাযা আদায় করে শহীদদের দাফন করে ফেলো। আর কতজন লোক শহীদ হয়েছে, কজন আহত হয়েছে, রিপোর্ট দাও।

আহনাফ (রা.) আমেরকে নিয়ে হেরাতের গভর্নর হাউসে চলে গেলেন। গভর্নর পালিয়ে গেছে। হেরাতের আলিশান এক মহল। সুখ-শান্তি ও বিলাসিতার সকল উপকরণ বিদ্যমান। আমেরকে মনোরম এক কক্ষে আরামদায়ক একটি সোফায় শুইয়ে দেওয়া হলো। অল্পক্ষণের মধ্যে ডাক্তার আবু আবদুল্লাহ ব্যান্ডের-চিকিৎসার সরঞ্জামাদি নিয়ে এসে হাজির হলেন। পাগড়ির যে-টুকরাটি দ্বারা আমেরের ক্ষতস্থান বাঁধা হয়েছিল, ডাক্তার সেটি খুলে ফেললেন। তাতে আমেরের খুব কষ্ট হলো। কারণ, নেকড়াটা জখমের সঙ্গে এঁটে গিয়েছিল। সেটি খুলতে ডাক্তারের বেশ কষ্ট হয়েছে। কষ্ট সইতে না পেরে আমের সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন।

ডাক্তার অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে জখম পরিষ্কার করলেন। বেশ গভীর জখম। ওষধাদি যা প্রয়োগ করা দরকার দিয়ে ডাক্তার জখমে পট্টি বেঁধে দিলেন। আহনাফ, সাফওয়ান ও আরও কয়েকজন মুসলমান এ-সময় উপস্থিত ছিলেন।

ব্যান্ডেজ-চিকিৎসা থেকে অবসর হয়ে ডাক্তার আবু আবদুল্লাহ বললেন, ক্ষত খুব গভীর। তবে আশঙ্কাজনক নয়। শুশ্রূষা করতে হবে খুব সতর্কতার সঙ্গে। রাতে এক মুহূর্তের জন্যও যেন নড়াচড়া করতে না পারেন। বেশি ভালো হবে, যদি কোনো মহিলাকে রোগীর সেবায় নিয়োজিত করা যায়।

আহনাফ (রা.) বললেন, এর এক মেয়ে এখানে আছে। তাকে নিয়োজিত করলে কেমন হয়?

ডাক্তার বললেন, ক্ষতি নেই। কিন্তু রোগীর অবস্থা দেখে আবার ভয় পাবে না তো!

সাফওয়ান বলল, না, মেয়েটি খুবই সাহসী ও স্বতন্ত্র মেজাজের অধিকারী। আমি মনে করি, ও ঘাবড়াবে না।

আহনাফ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আর আমের কখন একত্র হয়েছ?

জাশজাশা ও মদীনার মধ্যবর্তী একস্থানে আমাদের সাক্ষাত হয়েছিল। সেখান থেকেই আমি তাঁর সঙ্গে আছি।

আহনাফ (রা.) বললেন, তাহলে এটাই ভালো হবে, মোটামুটি আরাম না হওয়া পর্যন্ত তুমিই এর কাছে থাকো এবং যত্নের সঙ্গে সেবা করো।

সাফওয়ান বলল, আপনার আদেশ পালন করতে আমার কোনোই আপত্তি নেই।

আহনাফ (রা.) বললেন, এই প্রাসাদ আর এর সকল সাজ-সরঞ্জাম আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম। তবে সোনা-রুপার বরতন, অলংকারাদি ও মালামাল মালে-মনীমতের অফিসার এসে জব্দ করে নেবে।

সেনাপতি আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) ওখান থেকে বিদায় নিলেন। মুসলমানরা মজুসি সৈনিদেরকে এখনও গ্রেফতার করছে। দুর্গের কয়েকজন মান্যবর ব্যক্তি আহনাফ (রা.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে আবেদন জানালেন, যেসব সাধারণ নাগরিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তাদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হোক।

আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) তাদের আবেদন মঞ্জুর করে বললেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আমার লোক দিচ্ছি। তোমরা বিশ্বস্ততার সঙ্গে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের তালিকা প্রস্তুত করে দাও। কোনো যোদ্ধা পুরুষ যেন তালিকায় না ঢোকে। অন্যথায় তার দায় তোমাদেরকে বহন করতে হবে এবং তার জন্য তোমাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

তারা আদেশ অনুযায়ী কাজ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল। আহনাফ (রা.) তাদের সঙ্গে পঞ্চাশজন লোক দিলেন। তাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করলেন, যেন তারা সতর্কতার সঙ্গে তালিকা প্রস্তুত করে। যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো ধর্মনেতা, পঙ্গু, প্রতিবন্ধী ও নিঃস্ব-নিরীহ মানুষ এবং তাদের স্ত্রী-সন্তান-পরিজন, যারা তাদের উপর নির্ভরশীল, এদের নাম যেন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হয়।

তারা চলে গেল। কিছু লোককে মালে-গনীমতের অফিসারের সঙ্গে প্রেরণ করলেন, যেন তারা সৈনিক, অফিসার ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ভবনসমূহ থেকে উদ্ধার-হওয়া-বস্তুসামগ্রী জব্দ করে সেসবের তালিকা প্রস্তুত করে নেয় এবং তাদের পরিজনের লোকদেরকে গ্রেফতার করে আনে।

ইতিমধ্যে দুজন অফিসার এলেন, যাদের উপর শহীদদের দাফন ও জখমিদের ব্যান্ডেজ-চিকিৎসার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। তারা তথ্য জানালেন, এই যুদ্ধে একশো সাতষট্টিজন মুসলমান শহীদ হয়েছেন আর আহত হয়েছেন তিনশোর কিছু বেশি। আহতদেরকে চিকিৎসা-বিষয়ক কর্মকর্তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কয়েক ব্যক্তি নিহত মজুসিদেরও পরিসংখ্যা নিয়েছে। ছয় হাজারেরও বেশি মজুসি মারা গেছে। দুর্গের ভেতরে যেসব ইরানি মারা গেছে, তাদের হিসাব আলাদা।

তথ্য শুনে আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ।

তিনি সাফওয়ানকেই দুর্গের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন আর নিজে অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে ছাউনিতে ফিরে গেলেন।

সাফওয়ান আমেরের কাছে বসে তাঁকে নিরীক্ষা করে দেখছে। তার চেহারাটা হলুদ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর এক ব্যক্তি এসে আফীরার আগমনের সংবাদ জানাল। সাফওয়ান ভাবল, মেয়েটি এখানে এসে পৌঁছানোর আগেই পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া দরকার, যাতে এসে হঠাৎ পিতাকে এই অবস্থায় দেখে বিমর্ষ না হয়ে পড়ে।

সাফওয়ান উঠে পথেই আফীরার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রওনা হয়ে গেল।

সাতাশ.

আফীরা প্রাসাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। সাফওয়ান যখন তার কাছে গিয়ে পৌঁছুল, তখন তাঁর চেহারাটা খানিক বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। আফীরা বলল, ফিরে এসেছ তুমি পায়ে মেহেদি লাগিয়ে?

সাফওয়ান বলল, পা যাদের কোমল হয়, মেহেদি লাগায় তারা। তা-ও লাগায় পায়ের সৌন্দর্য বাড়াতে।

প্রাসাদে কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল?

এই প্রাসাদটি তোমার জন্য খালি করানো হয়েছে। ভালোই হলো, তুমি এসে পড়েছ। এখন আলাপ জমবে ভালো।

চলো, ভেতরে যাই।

চলো।

সাফওয়ান আফীরাকে নিয়ে আরেকটি কক্ষে প্রবেশ করল এবং দুজন দুটি চেয়ারে বসে পড়ল।

আফীরা বলল, অত্যন্ত আলিশান মহল তো!

যদি তোমার পছন্দ হয়, তাহলে এই প্রাসাদ তোমার নযরানা।

প্রাসাদের মালিক যেন তুমি!

অবশ্যই। এর মালিকানা শুধুই আমার।

আফীরা হাসি ধরে রাখতে পারল না। মেয়েটি খানিক শব্দ করেই হেসে ফেলল।

সাফওয়ান বলল, আমি মহান আল্লাহর শোকর আদায় করছি। তুমি হাসছ তাতে আমার কোনোই পরোয়া নেই। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, উত্তর দাও।

বলো।

তোমার হৃদয়টা খুব শক্ত, না?

আফীরা হেসে বলল, তোমার চেয়েও বেশি।

কিন্তু আমি তো জানি, তুমি নরম মনের মানুষ।

একথা ভুলো না যে, আমি নাহ্‌ম গোত্রের মেয়ে। আমার অন্তর খুবই শক্ত।

ঠিক আছে, এখনই পরীক্ষা নিচ্ছি। আমি তো জানি, মেয়েমাত্রই কোমলহৃদয় হয়ে থাকে।

আমি তাদের দলভুক্ত নই। আফীরা কথা কেটে বলল।

হতে পারে তোমার অন্তর দুর্বল নয়। অন্যথায় সাধারণত এটাই দেখা যায় যে, খারাপ কোনো সংবাদ শুনেই মেয়েরা অস্থির হয়ে ওঠে। অনেকে তো কেঁদেই ফেলে।

আফীরা সহসা চমকে ওঠল। বিস্ফারিত চোখে জিজ্ঞেস করল, তোমার এই ভূমিকার মানে কী?

একথা জানা যে, তোমার অন্তর সবল, না দুর্বল।

না, বলো, তুমি কী বলতে চাচ্ছ?

আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার অন্তরটা খানিকটা নড়ে ওঠেছে।

তা নয়, বরং তোমার কথাবার্তা আমাকে ভাবনার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

আর সেই ভাবনা থেকেই অস্থিরতা জন্ম নিয়েছে।

অস্থিরতা!

সাফওয়ান আফীরাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তোমার চেহারা থেকে পেরেশানি প্রকাশ পেতে শুরু করেছে।

আমাকে ভাবনার মধ্যে ফেলে রেখো না– যা বলতে চাচ্ছ বলে ফেলো।

জানা হয়ে গেছে, তোমার অন্তর খুবই দুর্বল।

ব্যাপার তা নয়। তুমি যদি আমাকে মন্দ-থেকে-মন্দতর সংবাদও শোনাও, আমি তা শুনতে প্রস্তুত আছি।

তা হলে শোনো। আমি তোমাকে একটি দুঃসংবাদই শোনাতে চাচ্ছি।

তাড়াতাড়ি বলো।

আগে মনটাকে শক্ত করে নাও।

আমার মন শক্তই আছে।

তাহলে শোনো, তোমার আব্বাজান আহত হয়েছেন।

আফীরা হঠাৎ ঘাবড়ে ওঠল। বলল, আব্বাজান আহত হয়েছেন?

এই তো ঘাবড়ে গেলে তুমি। মেয়ে মানুষ বলে কথা। তবে আশঙ্কার কিছু নেই। চলো, দেখে আস।

সত্যিই আমি ঘাবড়ে ওঠেছি। আব্বাজান ছাড়া জগতে আমার তো কোনো অবলম্বন নেই।

এটা তোমার ভুল চিন্তা যে, তুমি পিতাজিকেই অবলম্বন মনে করছে। মানুষের আসল অবলম্বন তো আল্লাহ।

তা তো বটেই। আল্লাহই মানুষের আসল অবলম্বন। মানুষ তো উসিলামাত্র। যাক, আমি হৃয়দটাকে শক্ত করে নিয়েছি। আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো।

এস।

দুজন হাঁটতে শুরু করল। সাফওয়ান বলল, সেনাপতি আহনাফ ইবনে কায়েস নিজে উপস্থিত থেকে তোমার আব্বাজানের ব্যান্ডেজ-চিকিৎসা করিয়েছেন। ডাক্তার আবু আবদুল্লাহ তাঁর চিকিৎসা করছেন। তিনি বলেছেন, ক্ষত খুব গভীর হলেও আশঙ্কাজনক নয়।

আশঙ্কাজনক হলেও আমরা কী করতে পারতাম! হবে তো তাই, যা আল্লাহ মঞ্জুর করে রেখেছেন।

তুমি বিলকুল ঠিক বলেছ। আল্লাহ যা মঞ্জুর করেন, তা-ই হয়। আমি বুঝতে পারছি, এবার তোমার অন্তরটা শক্ত হয়েছে।

দুজন আমেরের কক্ষে প্রবেশ করল। আমের অচৈতন্যের মতো পড়ে আছেন। আফীরা পিতার বিবর্ণ চেহারাটা দেখল। মেয়েটি নিজেকে সামলাতে পারল না। তার দু-চোখ থেকে ঝরঝর করে অশ্রু ঝরতে শুরু করল। ঝুঁকে পড়ে নিজের মুখটা পিতার বুকের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বলল, আব্বু, এ কী হাল হয়েছে তোমার!

ডাক্তার নিষেধ করে গেছেন, অন্তত এই রাতটা যেন রোগী একদম নড়াচড়া না করে। কিন্তু আফীরা এখন যা শুরু করল, তাতে ডাক্তারের এই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। হুট করে সাফওয়ান তার একটা কোমল বাহু ধরে বলল, এ কেমন অধৈর্য! নিজেকে সামলে নাও, সরে বসো।

আফীরা উঠে দাঁড়াল। মেয়েটি ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছে। একঝাঁক চিন্তা-পেরেশানি যেন এসে মেয়েটিকে ঝাপটে ধরেছে। কিন্তু সাফওয়ানের ধমক খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আত্মসংবরণ করে বলল, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। অর্থাৎ– আমরা আল্লাহর জন্য নিবেদিত। যা কিছু হচ্ছে তারই পক্ষ থেকে হচ্ছে আর আমরা সকলে তারই কাছে ফিরে যাব।

সাফওয়ান বলল, এবার-না ঠিক কথা বলেছ। যে-কোনো বিপদে-আপদে মুসলমানদের এই বিশ্বাসই লালন করা উচিত যে, যা কিছুই ঘটে, আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে ঘটে না।

আফীরা আত্মসংবরণ করে চোখের পানি মুছে ধরা গলায় কাঁদ-কাঁদ কণ্ঠে বলল, একেবারেই তো সংজ্ঞাহীন।

সাফওয়ান বলল, শরীর থেকে অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে। ব্যান্ডেজ-চিকিৎসা দেরিতে হয়েছে। সে-কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এবার তুমি একটি কথা বলো।

ডাক্তার একে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখতে বলেছেন। কোনো প্রকার নড়াচড়া করতে দেওয়া যাবে না। এই সেবা-পরিচর্যার দায়িত্ব তুমি নিতে পার?

এ-ও কি বলতে হবে? রাত জেগে একপায়ে দাঁড়িয়ে থেকে আমি আমার পিতার সেবা করব, এ আবার বলতে হবে নাকি?

এত বিশাল একটি প্রাসাদে একা থাকবে, ভয় পাবে না তো?

না, ভয়ের কোনো কারণ নেই। কিন্তু তুমি কোথায় যাবে?

আপাতত কোথাও যাচ্ছি না। কিন্তু বলা তো যায় না, সেনাপতি কখন কোথায় যাওয়ার আদেশ করেন। তা ছাড়া...।

সাফওয়ান চুপ হয়ে গেল। আফীরা তার মুখপানে তাকিয়ে ছিল। জিজ্ঞেস করল, তাছাড়া কী?

আমাদের দুজনের এখানে একাকি থাকা উচিতও নয়।

আফীরা বলল, তা বটে।

সাফওয়ান বলল, আচ্ছা, তুমি বসে থাকো আর পিতাজির দেখভাল করো।

আফীরা একটি চেয়ারে বসে পড়ল। সাফওয়ান তার সামনে আরেকটি চেয়ারে বসল। দুজন কথা বলছে আর ফাঁকে-ফাঁকে আমেরের প্রতি চোখ রাখছে। দুজন এ-কক্ষেই আসরের নামায আদায় করল। সাফওয়ানের নামায শেষ হলে এক সৈনিক দরজায় করাঘাত করল।

সাফওয়ান দরজা খুলে জিজ্ঞেস করল, কী খবর?

সৈনিক বলল, সেনাপতি আপনাকে যেতে বলেছেন।

সাফওয়ান কক্ষে প্রবেশ করে আফীরাকে বলল, সেনাপতি আমাকে তলব করেছেন আফীরা। আমাকে যেতে হচ্ছে।

আফীরা বলল, যাও। আমি আছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

সাফওয়ান বলল, যদি আসতে না পারি, তাহলে সেনাপতিকে বলে দু-চারটি মেয়ে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। তুমি রোগীর প্রতি খেয়াল রেখো।

সাফওয়ান প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ইসলামি বাহিনীতে গিয়ে পৌঁছুল। বাহিনীর সেনাপতি আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.)-এর তাঁবুর উপর ইসলামি পতাকা উড়ছে। সাফওয়ান সেই তাঁবুটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সেনাপতি আহনাফ কমান্ডার ও অফিসারদের নিয়ে তাঁবুতে উপবিষ্ট। সাফওয়ান অনুমতি নিয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করে সালাম দিল। একধারে বেশ কজন নারী বসা আছে।

সেনাপতি বললেন, সাফওয়ান, এই মহিলাদের একজনকে দাসীরূপে তোমার ভাগে রেখেছি। কাকে নেবে পছন্দ করো।

সাফওয়ান চোখ ঘুরিয়ে মহিলাগুলোর দিকে তাকাল। একজনও বৃদ্ধা বা প্রৌঢ়া নেই। সবাই হয় তরুণী, না হয় যুবতী। সবাই মূল্যবান পোশাক ও অলংকার পরিহিতা। ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা বলে মনে হলো।

সাফওয়ান সব কজনকে দেখে সেনাপতির প্রতি তাকিয়ে বলল, সবাই তো যুবতী-তরুণী। বিগতযৌবনা কেউ থাকলে না হয় নিতাম।

সেনাপতি আহনাফ ইবনে কায়েস হাসলেন। বললেন, কয়েকজন প্রৌঢ়া মহিলা ছিল। তাদেরকে প্রৌঢ়রা নিয়ে গেছে। এখন এরাই অবশিষ্ট আছে। তুমি এদের থেকে একজনকে বেছে নাও।

সাফওয়ান ইতস্তত করল। আহনাফ বললেন, আমার সঙ্গে আস।

তিনি সাফওয়ানকে নিয়ে মেয়েগুলোর সারির সামনে দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। দেখলেন, এক মেয়ে গভীর চোখে সাফওয়ানের প্রতি তাকাচ্ছে। মেয়েটি তরুণী, সুদর্শন পোশাক ও মূল্যবান অলংকারাদি পরিহিতা। আহনাফ মেয়েটিকে ইশারা দিলেন। মেয়েটি সম্মুখে এগিয়ে এল। আহনাফ (রা.) সাফওয়ানকে বললেন, এই মেয়েটি তোমাকে দেখছিল। আমি একে তোমাদে দিয়ে দিলাম।

সাফওয়ান বলল, কিন্তু এ তো একদম তরুণী, একে নিয়ে আমি কী করব?

আহনাফ হেসে বললেন, ভয় পেয়ো না; নিয়ে যাও। এ তোমার সেবা করবে। যদি তুমি একে কাছে রাখা সমীচীন মনে না কর, তা হলে বিক্রয় করে ফেলো। ভালো দাম পাবে।

সাফওয়ান আর কোনো কথা বলল না। মেয়েটিকে নিয়ে ওখান থেকে ফিরে এল।

আটাশ.

হাঁটার পথে মেয়েটিকে পুনরায় দেখল সাফওয়ান। খুবই রূপসী। ভাবগতিতে মনে হলো উচ্ছল-প্রাণবন্তও। সাফওয়ান জিজ্ঞেস করল, নাম কি তোমার?

মেয়েটি আরবিতে উত্তর দিল, আমার নাম ফ্রেগাস।

ইরানি কন্যা ফ্রেগাসকে আরবি বুঝতে ও বলতে দেখে সাফওয়ান বিস্মিত হলো। জিজ্ঞেস করল, তুমি আরবি জান নাকি?

ভালোই জানি।

তুমি কার কন্যা?

এখন সেই পরিচয় দিয়ে লাভ কী?

ফ্রেগাস বিষণ্ন হয়ে ওঠল। ঘটে-যাওয়া-ঘটনাটি সহসা তার দৃশ্যপটে ভেসে ওঠল।

সাফওয়ান বলল, অন্তত এটুকু লাভ হবে তো যে, তোমার মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে।

ফ্রেগাস বলল, আমি হেরাতের গভর্নর নারসির মেয়ে।

নারসি কোথায় গেছেন?

ইয়ায্‌দান জানেন, এখন তিনি কোথায় আছেন।

দুজন ছাউনি এলাকা অতিক্রম না করতেই জামাসপ সম্মুখ দিক থেকে এসে দাঁড়িয়ে গেল। বলল, তোমার জন্য আমি খুব পেরেশান ছিলাম। গোটা ক্যাম্পে হণ্যে হয়ে খুঁজেছি। এখন পেয়ে গেলাম।

আমি দুর্গে ছিলাম। আমের আহত হয়েছেন।

আমের আহত হয়েছেন! জামাসপ বিস্ময় ও আক্ষেপ প্রকাশ করল।

সাফওয়ান বলল, হ্যাঁ, তবে ক্ষত যদিও গভীর; কিন্তু আশঙ্কাজনক নয়। আফীরা তাঁর দেখাশোনা করছে। তুমি সকল মালামাল নিয়ে নারসির প্রাসাদে যাও; আমরাও ওখানে ওঠেছি।

ভালো করেছ। এই মেয়েটি কে?

এ হেরাতের গনর্ভর নারসির কন্যা।

তোমার সঙ্গে কেন?

ইসলামি বাহিনীর সেনাপতি আমাকে দিয়েছেন।

পরিষ্কার করে কেন বলছে না, সেনাপতি তোমাকে দাসী দান করেছেন।

ব্যাপার তা-ই।

তা হেরাতের শাসনকর্তার কন্যা দাসী হলো কী করে?

ইসলামের সামরিক আইনে।

বুঝলাম না।

ইসলামের যুদ্ধনীতি হলো, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, সাধারণ সৈনিক হোক, অফিসার-কমান্ডার হোক কিংবা শাসনকর্তা হোক, তাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে দাস-দাসী বানানো হয়।

আর শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের ব্যাপারে কী আইন?

তারা যদি জিযিয়া আদায় করতে সম্মত হয়, তাহলে ইসলামি শাসনের অধীনে শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারে। অন্যথায় তাদেরও গ্রেফতার করে দাস-দাসী বানানো হয়।

সাফওয়ান ফ্রেগাসকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। জামাসপ মালপত্র আনতে ফিরে গেল।

সাফওয়ান দুর্গে প্রবেশ করে প্রাসাদে পৌঁছে গেল। ফ্রেগাসকে বলল, এই প্রাসাদ তোমার। এখানে আরামে থাকো। তবে পালাবার চেষ্টা করো না। যদি করো, পালাতে সক্ষম হবে না। মুসলমানরা তোমাকে ধরে নিয়ে আসবে আর তুমি কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

ফ্রেগাস বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি পালাবার চেষ্টা করব না। কিন্তু আমি তো দাসী; আমাকে কাজ বুঝিয়ে দিন।

সাফওয়ান তাকে একটি কক্ষে রেখে নিজে আমেরের কক্ষে গেল। আফীরা নিশ্চিন্তমনে বসে আছে।

সাফওয়ান জিজ্ঞেস কলল, চাচাজান নড়াচড়া করেননি তো?

আফীরা উত্তর দিল, না। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর জিজ্ঞেস করল, সেনাপতি কেন ডেকেছিলেন তোমাকে?

সাফওয়ান বলল, তিনি বন্দিদের বণ্টন করেছেন। একটি দাসী আমাকেও দিয়েছেন।

আফীরা বলল, ভালো হয়েছে। তোমার দাসী একটির প্রয়োজন ছিল। বৃদ্ধা মহিলা তো?

সাফওয়ান বলল, না– তরুণী। খুবই সুন্দরী। হেরাতের গভর্নরের মেয়ে। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, মেয়েটি আরবি জানে।

আফীরার চেহারার রং ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে চুপসে গেল। সাফওয়ান বুঝে ফেলল, বিষয়টি আফীরার ভালো লাগেনি যে, একটি রূপসী তরুণী দাসী তার হাতে এসেছে। তাই বলল, আমি ওকে নিতে চাইনি।

আফীরা কথা কেটে বলল, কিন্তু সেনাপতি জোর করে তোমার মাথায় তুলে দিয়েছেন, না?

ব্যাপারটা এমনই। বললেন, নিয়ে যাও। রাখতে না চাইলে বিক্রি করে ফেলো; ভালো দাম পাবে।

আমি এই ভেবে নিয়ে নিলাম যে, ওকে তোমার হাতে তুলে দেব। রাখতে চাইলে রেখে দেবে, অন্যথায় বিক্রি করে ফেলবে।

কোথায় ও?

অপর একটি কক্ষে রেখে এসেছি।

নিয়ে আসি?

নিয়ে আস। রাত হয়ে আসছে; অন্ধকার নেমে যাবে। এসে আলোর ব্যবস্থা করে দিয়ে যাক।

সাফওয়ান গেল এবং ফ্রেগাসকে নিয়ে এল।

আফীরা মেয়েটিকে দেখল। খুবই রূপসী মনে হলো।

সাফওয়ান বলল, এর নাম ফ্রেগাস।

ফ্রেগাস আফীরাকে উদ্দেশ করে বলল, কী আদেশ আমার জন্য?

আফীরা মেয়েটির ব্যাপারে কিছু একটা ভাবছিল। সম্ভবত চিন্তা করছিল এমন একটি সুন্দরী মেয়েকে রাখা ঠিক হবে কিনা। কিন্তু মেয়েটির জিজ্ঞাসায় তার ভাবনায় ছেদ পড়ে গেল। চকিত হয়ে মাথা তুলে বলল, এই কক্ষে আলোর ব্যবস্থা করো।

হঠাৎ ফ্রেগাসের চেহারায় বিষণ্নতার কালো ছায়া ছেয়ে গেল। এই গতকালও সে এই প্রাসাদে রাজকুমারীর জীবনযাপন করেছে। একাধিক সেবিকা তার আদেশ পালনের জন্য একপায়ে খাড়া থাকত। পানিটুকু পান করার জন্যও তাকে এতটুকু নড়াচড়া করতে হতো না। আলোর জন্য কক্ষে বাতি জ্বালানো তো দূরের কথা। কিন্তু কালের চক্র আজ তাকে দাসী বানিয়ে দিল। এখন এক আরব দুহিতা তাকে কক্ষে বাতি জ্বালাতে আদেশ করছে!

ফ্রেগাস শীতল শ্বাস গ্রহণ করে বলল, এখনই আলোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

মোমবাতিগুলো কোথায় রাখা আছে, ফ্রেগাসের তা জানা আছে। মোমগুলো কীভাবে ফানুসে বসানো হয় এবং কীভাবে জ্বালানো হয়, তা-ও সে জানে। সে কয়েকটি বাতি ফানুসে বসিয়ে আলো জ্বালিয়ে দিল।

দিবালোকের অবসান ঘটিয়ে সূর্য পশ্চিম আকাশে অস্ত গেল। সাফওয়ান ও আফীরা মাগরিবের নামায আদায় করল। নামাযের পর দুজন আমেরের কাছে বসে পড়ল। ফ্রেগাস খানিক দূরে দাঁড়িয়ে রইল। আফীরা তাকেও নিজের কাছে ডেকে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিল। জিজ্ঞেস করল, শীতল শ্বাস নিলে কেন ফ্রেগাস?

ফ্রেগাস বলল, গতকাল পর্যন্ত আমি এই প্রাসাদেই চাকরানীদের আদেশ করতাম। কিন্তু আজ আমাকে আদেশ দেওয়া হচ্ছে! একদিনে কেমন উলট-পালট হয়ে গেল!

তুমি কি ভেবে দেখেছ, এই বিপ্লব কেন ঘটল?

আমাদের দ্বারা কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে নিশ্চয়ই।

কোনো জাতি যখন আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দাম্ভিকতার পথ অবলম্বন করে, তখন আল্লাহ তাদেরকে অপর কোনো জাতির অনুগত বানিয়ে দেন।

ফ্রেগাস কিছু বলতে চাচ্ছিল। এমন সময় জামাসপ এসে পড়ল। সে সাফওয়ানকে বলল, আমি মালপত্র সব নিয়ে এসেছি।

সাফওয়ান বলল, মালগুলো একটি কক্ষে রেখে দাও আর তুমিও এই প্রাসাদে থাকো।

জামাসপ বলল, বেশ ভালো। আজ সকাল থেকে কারুরই তো খাবার জোটেনি। আদেশ হলে খাবার প্রস্তুত করি।

আফীরা বলল, তোমাকে কষ্ট করতে হবে না; খাবার আমি তৈরি করব।

ফ্রেগাস বলল, আপনাদের খাবার তো আমি তৈরি করতে পারব না; তবে আদেশ হলে ইরানি খাবার তৈরি করে দিতে পারি।

জামাসপ বলল, ইরানি খাবার কী? গোশত রান্না করে নাও। তবে গোশতে মসলা পড়বে না। শুধু গরম মসলা দিলেই হলো।

সাফওয়ান জামাসপকে বলল, কমান্ডার আমেরের জন্য দুধের প্রয়োজন হবে।

জামাসপ বলল, আমি ব্যবস্থা করে দেব।

জামাসপ চলে গেল। ফ্রেগাসও খাবার প্রস্তুত করতে বেরিয়ে গেল। সাফওয়ান ও আফীরা বসে রইল। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আমের নড়ে ওঠলেন। সাফওয়ান তাকে থামিয়ে দিলেন।

ধীরে-ধীরে আমেরের চৈতন্য ফিরে আসতে লাগল। সাফওয়ান ও আফীরা তার প্রতি তাকিয়ে আছে। এক সময় তিনি চোখ দুটো খুলে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। আফীরা বলল, আব্বু...।

সাফওয়ান আফীরাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, এখনই দৃষ্টি আকর্ষণ করো না। পুরোপুরি সংজ্ঞা ফিরে আসুক। আফীরা চুপ হয়ে গেল। কিন্তু তার চেহারা বলছে, পিতার সঙ্গে কথা বলতে সে সীমাহীন বেচাইন। সাফওয়ান বলল, ঈশার নামাযের সময় হয়ে গেছে। চলো, নামায পড়ে নিই।

দুজন অজু করে নামায পড়ল। ফিরে এসে দেখল, আমেরের হুঁশ-জ্ঞান পুরোপুরি ফিরে এসেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, রাত হয়ে গেছে নাকি?

আফীরা বলল, জি, এখন এশার সময়।

আমের জিজ্ঞেস করলেন, যুদ্ধের ফলাফল কী হলো?

সাফওয়ান বলল, আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দান করেছেন। এই মুহূর্তে আমরা দুর্গের ভেতরে গভর্নর হাউসে অবস্থান করছি।

আমের বললেন, আলহাম্‌দুলিল্লাহ। পানি আনো; আমি অজু করব।

সাফওয়ান বলল, যুদ্ধে আপনি আহত হয়েছিলেন। ডাক্তার আবু

আবদুল্লাহ আপনার ব্যান্ডেজ চিকিৎসা করে বলে গেছেন, যেন আপনাকে নড়াচড়া করতে না দিই। আপনি তায়াম্মুম করে ইশারায় নামায আদায় করুন।

আমের তায়াম্মুম করে নামায আদায় করলেন। নামায পড়ে কথা বলতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর ফ্রেগাস এসে সংবাদ জানাল, খাবার প্রস্তুত হয়ে গেছে। আমের বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, এ কে?

সাফওয়ান আমেরকে মেয়েটির ইতিবৃত্ত শোনাল। তারপর সবাই খানা খেল। সবাই ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে যথাসময়ে জাগ্রত হয়ে আমের, সাফওয়ান ও আফীরা প্রয়োজনাটি সেরে ফজর নামায আদায় করল। নামাযের পর তিনজনই কুরআন তিলাওয়াত শুরু করল। ফ্রেগাস বসে-বসে কুরআনের তিলাওয়াত শুনতে লাগল।

বেশ বেলা হলে সেনাপতি আহনাফ ইবনে কায়েস ডাক্তার আবু আবদুল্লাহকে নিয়ে প্রাসাদে এলেন। আফীরা অন্য কক্ষে চলে গেল। আফনাফ আমেরকে কৃতজ্ঞতা জানালেন। ডাক্তার ব্যান্ডেজ খুলে জখম দেখলেন। ঔষধ লাগালেন। তারপর পুনরায় পট্টি বেঁধে দিলেন। তিনি বললেন, অবস্থার বেশ উন্নতি হয়েছে। তবে পুরোপুরি ভালো হতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে।

ডাক্তার আবু আবদুল্লাহ কিছু সময় বসে পরে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। এই অবসরে ফ্রেগাস নাস্তা নিয়ে হাজির হলো। সবাই নাস্তা খেতে শুরু করল।

উনত্রিশ.

আহত মুজাহিদদের ক্ষত শুকানো এবং সুস্থ্যতা লাভের অপেক্ষায় সেনাপতি আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) বেশ কদিন হেরাত অবস্থান করলেন। তিনি কয়েকজন জিম্মিকে গোয়েন্দাগিরির কাজে নিযুক্ত করে রেখেছেন। এর বিনিময়ে তাদেরকে ও তাদের আত্মীয়-পরিজনকে অনেক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছেন।

গোয়েন্দারা তাঁকে তথ্য সরবরাহ করেছিল যে, ইয়ায্দাজার্দ মারাদশাহজাহানে অবস্থান করছেন এবং এই মুহূর্তে তার কাছে ত্রিশ হাজারেরও বেশি সৈন্য আছে। আহনাফ-এর কাছে আছে দশ হাজার মুজাহিদ। কিন্তু শত্রুপক্ষের এত বিশাল বাহিনীর মোকাবেলায় তার এই ক্ষুদ্র বাহিনী পেরে উঠবে কিনা ভেবে তিনি খোরাসানে অভিযান প্রেরণ

করেননি। আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) তাঁকে আদেশ দিয়ে রেখেছেন, যেন তিনি একের-পর-এক নগরী জয় করে সামনের দিকে এগিয়ে যান এবং ইয়ায্দাজার্দকে হত্যা, গ্রেফতার কিংবা দেশান্তরিত না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত না হন। তিনি মনে-মনে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে রেখেছেন, আমীরুল মুমিনীনের এই মনোবাঞ্ছা পূরণ না করে ঘরে ফিরবেন না। তাই তিনি ভেবে-চিন্তে পদক্ষেপ নিচ্ছেন।

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) এই ইরানকে ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায় হিসেবে বিবেচনায় নিয়েছেন। তাই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সামরিক সাহায্য প্রেরণে সচেষ্ট ছিলেন। ইতিমধ্যে মদীনা, কুফা, বসরা ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে বহু সাহায্য ইরান পৌঁছেছে।

ইরাক, মিসর, ফিলিস্তিন, শামও পদানত হওয়ার পথে ছিল। তাই এসব রাজ্যের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিপুলসংখ্যক সৈন্যের প্রয়োজন ছিল। তাই এসব রাজ্য থেকে বেশি সৈন্য সরিয়ে আহনাফ (রা.)-এর সাহায্যে খোরাসান প্রেরণ করার সুযোগ ছিল না।

সেনাপতি আহনাফ ইরান অভিযানে সফল হওয়াকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আমলে নিয়েছেন। যত দ্রুত সম্ভব তিনি সমগ্র খোরাসানের দখল হাতে নিয়ে ইরান অভিযানকে পূর্ণতাদানে এবং ইয়ায্দাজার্দ-এর পতন ঘটানোয় মরিয়া হয়ে ওঠেছেন। সে-কারণে কোথাও বেশি সময় অবস্থান করা তার জন্য কষ্টকর।

কতিপয় আহত মুজাহিদ ইতিমধ্যে সুস্থ্য হয়ে ওঠেছে। কয়েকজনের ক্ষত শুকোতে আর অল্প কিছু সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু কমান্ডার আমেরের জখম ভালো হতে এখনও অনেক দেরি। আগামী পাঁচ-দশ দিনে ভালো হয়ে যাবে এমন আশাও করা যায় না। ডাক্তার আবু আবদুল্লাহ ও সেনাপতি আহনাফ তাঁর খোঁজখবর নিতে রোজই আসছেন। প্রতিদিনই তাঁর ব্যান্ডেজ খোলা ও বাঁধা হচ্ছে। ইতিমধ্যে তিনি কিছু সময়ের জন্য বসবার অনুমতি পেয়েছেন। তিনি অজু করার সময়, নামায পড়ার সময় ও খাওয়ার সময় প্রয়োজন অনুপাতে বসছেন। বাদ বাকি সময় বিছানায় পড়ে থাকছেন। জখমের ব্যথায় তাঁর জ্বরও হয়েছিল। কয়েকদিন তো প্রচণ্ড জ্বরে ভুগেছেন। কিন্তু আজ কদিন হলো জ্বর নেই।

ফ্রেগাস যথেষ্ট চঞ্চল ও প্রাণবন্ত মেয়ে। এই অল্প কদিনে মেয়েটি আফীরার গায়ে-গায়ে মিশে গেছে এবং সাফওয়ানকেও আপন বানিয়ে

নিয়েছে। কিন্তু জামাসপের সঙ্গে এখনও ফ্রি হতে পারেনি। মেয়েটি যদিও বিত্তশালী শাসক পরিবারের সন্তান এবং বিলাসিতার মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছে, তবু ভাগ্য যখন তাকে দাসী বানিয়ে দিল, তখন সে সব কাজ নিজহাতে করতে শুরু করল। নাস্তা প্রস্তুত করছে, খাবার রান্না করছে, সকলকে খাবার পরিবেশন করছে, আমেরের ব্যান্ডেজ পরিবর্তন করে দিচ্ছে ও অজুর পানি এনে দিচ্ছে ইত্যাদি যখন যে-কাজটি করবার প্রয়োজন হচ্ছে, করছে। তাছাড়া আফীরার কাছে বসে ইরানের মজার-মজার গল্প শুনিয়ে তাকে আনন্দ দিচ্ছে।

তবে জামাসপ তার প্রতি প্রসন্ন নয়। সে মেয়েটিকে বিশ্বাস করছে না। ওর ব্যাপারে মনে তার সন্দেহ বিরাজ করছে। একদিন সাফওয়ানকে নির্জনে পেয়ে বলল, আমি কিন্তু ফ্রেগাস মেয়েটিকে একটুও বিশ্বাস করি না। ওর চোখে আমি যে-চমক দেখেছি, তাতে আমি আশঙ্কা করছি, কখনও সে ধোঁকা দেয় কি-না।

কী ধোঁকা দেবে ও?

আমি আফীরার ভাবনা ভাবছি।

না ফ্রেগাস কোথাও যাচ্ছে, না আফীরা। আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করবেন। আর তুমি তো পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত আছই।

তার পাহারাদারি ও নিরাপত্তার কাজে আমি কোনো ত্রুটি করব না।

এ-সময় হঠাৎ সেনাপতি আহ্নাফ (রা.) এসে হাজির হলেন। আজ তিনি এই দ্বিতীয়বার এলেন। তিনি সাফওয়ানকে সঙ্গে করে আমেরের কাছে গেলেন এবং সালাম দিয়ে বললেন, আমরা এখানে অবস্থান নিয়েছি বারোদিন হয়ে গেল। আল্লাহর ফজলে আহত সকল মুজাহিদ সুস্থ হয়ে গেছে। বাকি আছেন শুধু আপনি। আপনার পুরোপুরি সুস্থ হতে এখনও বেশ কদিন সময় লাগবে। আপনার প্রয়োজনে আরও কয়েক দিন থাকতে আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাতে আমীরুল মুমিনীন অসন্তুষ্ট হতে পারেন বলে আশঙ্কা করছি। তাই আপনি অনুমতি দিলে আমি মারাদশাহজাহান অভিমুখে অগ্রসর হতে চাই।

আমের বললেন, আমার কারণে আপনাকে প্রয়োজনের বেশি সময় এখানে আটকে থাকতে হলো, এর জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমীরুল মুমিনীনকে আমিও সমীহ করি। আপনি রওনা হয়ে যান।

আমি সাফওয়ানকে হেরাতের গভর্নর নিযুক্ত করেছি। আপনি যখন

সুস্থতা লাভ করবেন, তখন তার পরিবর্তে আপনি শাসনক্ষমতা বুঝে নেবেন।

না, আপনার কাছে আমার আবেদন হলো, আপনি স্থায়ীভাবে সাফওয়ানকেই হেরাতের গভর্নর নিযুক্ত করুন।

সাফওয়ান বললেন, আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাই।

সেনাপতি বললেন, এমন হতে পারে যে, সাফওয়ানকে স্থায়ীভাবে হেরাতের গভর্নর নিযুক্ত করা হলো। কিন্তু যখন তার জিহাদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হবে, তখন আপনি তার অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী গভর্নরের দায়িত্ব পালন করবেন।

আমের বললেন, আপনি আমাকে যে-আদেশ দেবেন, আমি তা-ই পালন করব।

সেনাপতি বললেন, আচ্ছা, এখন আমি অনুমতি চাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ আগামী কাল রওনা হব।

সেনাপতি আহনাফ ইবনে কায়েস চলে গেলেন।

সেদিনই সাফওয়ান হেরাতের গভর্নরের দায়িত্ব বুঝে নিল। পরদিন ইসলামি বাহিনী মারাদশাহজাহানের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। সাফওয়ান আহনাফ (রা.)কে বিদায় জানাতে তাঁর কাছে গেল।

ইসলামি বাহিনী রওনা হতে শুরু করেছে। তারা যে-মাঠে ছাউনি ফেলেছিল, সেটি ধীরে-ধীরে খালি হতে শুরু করেছে। আহনাফ এবং তাঁর ইউনিটও রওনার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

আহনাফ (রা.) সাফওয়ানকে বললেন, এসেছ ভালো করেছ। তোমাকে আমার কয়েকটি কথা বলবার ছিল। এখন তুমি হেরাতের গভর্নর। এই পদমর্যাদা আমি তোমাকে তোমার দীনদারি, পরহেযগারি ও বাহাদুরির কারণে দিয়েছি। আমি আশাবাদী, তুমি এই পদের জন্য যোগ্য প্রমাণিত হবে আর এমন কোনো ঘটনা ঘটতে দেবে না, যার জন্য আমীরুল মুমিনীন তোমাকে ও আমাকে ভর্ৎসনা করতে পারেন। মনে রেখো, গভর্নর, অফিসার ও সৈনিকদের সামান্য-সামান্য বিষয়ও আমীরুল মুমিনীনের কানে পৌঁছে যায়। তোমার অধীনে আমি পাঁচশো সৈনিক রেখে গেলাম। তুমি তাদের ভালো-মন্দ খেয়াল রেখো। জিম্মিদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কোরো এবং সব সময় বিনয় ও নম্রতার পরিচয় দিয়ো। সময়মতো নামায আদায় কোরো। মুসলমানদেরকে অনারবদের থেকে আলাদা রেখো– যখন দুর্গের ভেতরে থাকবে তখনও, যখন বাইরে থাকবে তখনও। পরাজিত জাতির

সঙ্গে মেলামেশা করার ফল ভালো হয় না। আমি তোমাকে এ-কটি উপদেশ দিয়ে গেলাম। এগুলো তুমি মেনে চলো।

সাফওয়ান বলল, ইনশাআল্লাহ আমি আপনার এই উপদেশগুলো বর্ণে-বর্ণে পালন করব। অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ কাউকে দেব না।

এবার আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.)-এর ইউনিট রওনা হলো। তিনিও এগোতে শুরু করলেন। সাফওয়ান ফিরে এল।

সাফওয়ান যখন দুর্গের নিকটে এসে পৌঁছুল, তখন জামাসপের সঙ্গে তার দেখা হলো। লোকটিকে বেশ উৎফুল্ল মনে হলো। সাফওয়ান জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কী, তোমাকে খুব আনন্দিত দেখাচ্ছে!

জামাসপ বলল, এটি কি আনন্দের বিষয় নয় যে, আপনি সেই পদ লাভ করেছেন, যার ব্যাপারে আমার আকাঙ্খা ছিল যে, আপনি তার অধিকারী হোন? আপনি হেরাতের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছেন।

সাফওয়ান বলল, তুমি জান না, মুসলমান পদ-পদবি পছন্দ করে না। তাতে দায়-দায়িত্ব বেড়ে যায়। একজন সৈনিক হিসেবে বেঁচে থাকাই আমার কাম্য ছিল। কিন্তু বাহিনীর সেনাপতি আমার মাথায় নেতৃত্বের দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন। এখন এই দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হবে। আল্লাহর নিকট দু'আ করি, যেন তিনি আমাকে এই পদের যোগ্য প্রমাণিত করেন।

জামাসপ বলল, আপনি যা-ই বলুন না কেন, আমি তাতে খুবই খুশি হয়েছি। এর জন্য আমি আপনাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

সাফওয়ান বলল, তুমি আমার হিতকামী। আমিও তোমার কৃতজ্ঞতা আদায় করছি।

দুজন দুর্গে প্রবেশ করল। জামাসপ সাফওয়ান থেকে বিদায় নিয়ে কোনো এক কাজে চলে গেল। সাফওয়ান প্রাসাদে ঢুকেই বারান্দায় ফ্রেগাসের দেখা পেল। তার চেহারায় আনন্দের জ্যোতি ছড়িয়ে রয়েছে। মনকাড়া চোখ দুটোতে কড়া চমক। মুখে হাসির আভা ছড়িয়ে বলল, আপনি হেরাতের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছেন। আমি আপনাকে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করছি।

সাফওয়ান বলল, আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, এই ঘটনায় তুমি আনন্দিত হয়েছ। তা এ-সংবাদ তোমাকে কে বলল?

আমি আর আফীরা আপা এইমাত্র আমের সাহেব থেকে শুনেছি। খবরটা আপনাকে বলার জন্য আমি উদগ্রীব ছিলাম। আর সেজন্যই আপনার অপেক্ষায় বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে আছি।

সাফওয়ান বলল, তোমার চেহারা থেকে যে আনন্দদ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তাতেই তোমার মনের ভাব ফুটে ওঠছে।

সাফওয়ান এগিয়ে গেল। ফ্রেগাস মনে-মনে বলল, হায়, তুমি যদি আমার মনের অবস্থা বুঝতে!

সাফওয়ান একটি কক্ষে প্রবেশ করল। কক্ষে আফীরা মানুষের সমান বড় একটি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল। এই একটু আগে সে গোসল করেছে। মাথার চুল শুকিয়ে তেল লাগিয়েছে। আর এখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনি করছে। রেমশ-কোমল কালচে সোনালি সরু চুলগুলো কোমর পর্যন্ত ঝুলে আছে। খুবই চমৎকার দেখাচ্ছিল।

সাফওয়ান মোড় ঘুরিয়ে ফিরে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু আফীরা আয়নার মধ্যে তার প্রতিবিম্ব দেখে ফেলল। সে ঝট করে মোড় ঘুরিয়ে তার প্রতি তাকিয়ে বলল, আমি হেরাতের গভর্নরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

কালো চুলের মাঝে আফীরার শ্রীমান মুখাবয়বটা এমন দেখাল, যেন কালো চুলের মাঝে একটি চিত্তহারী চাঁদ। সাফওয়ান মুচকি হেসে বলল, মোবারকবাদ গ্রহণ করলাম। এবার একটু-আধটু ভয় করতে শেখো।

আফীরাও দু-ঠোঁটের ফাঁকে হাসি গলিয়ে বলল, তোমাকে ভয় করব, নাকি তোমার ক্ষমতাকে?

সাফওয়ান বলল, উভয়কেই।

এবার আফীরা শব্দ করে হেসে ওঠল।

ত্রিশ.

ফ্রেগাস যেমন সুন্দরী, তেমনি চঞ্চল ও প্রাণবন্ত। মেয়েটি আফীরাকে পছন্দ করে, আবার করেও না। পছন্দ করে এইজন্য যে, আফীরা তার সমবয়স্কা, সুশ্রী ও খোশমেজাজ। তার কথাবার্তা খুবই ভালো লাগে ওর। আর অপছন্দ করার কারণ হলো, সাফওয়ানের প্রতি তার এবং তার প্রতি সাফওয়ানের মনের টান আছে। এ-বিষয়টি ফ্রেগাস মেনে নিতে পারছে না। কেননা, তার মনে সাফওয়ানের মনের মানুষ হিসেবে পেতে চায়। তাই অপর কোনো নারী সাফওয়ানকে ভালবাসুক, সাফওয়ান অন্য কোনো নারীর প্রতি আকৃষ্ট হোক, তা সে মেনে নিতে পারছে না।

ফ্রেগাস মন উজাড় করে সাফওয়ানের সেবা করছে। তাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সাফওয়ানের

গতিধারা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। নিজের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কোনোই লক্ষণ ফ্রেগাস দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু কেন? বাধাটা কোথায়? ভেবে-চিন্তে স্থির করল, আফীরা মেয়েটিই তার ও সাফওয়ানের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। সাফওয়ান যেহেতু আফীরাকে ভালবাসে, তাই তার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে না। ফ্রেগাস একটিবারের জন্যও ভাবেনি, সাফওয়ান মুসলমান আর ও অমুসলিম কন্যা। তার প্রতি সাফওয়ানের আকর্ষণ তৈরি হওয়ার পথে এটিই হলো বাধা।

সাফওয়ান ফ্রেগাসকে স্বাভাবিক চোখেই দেখছে। একজন প্রাক্তন শাসনকর্তার কন্যা হিসেবে তার মর্যাদা ও সুখ-আরামের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখছে। কিন্তু ফ্রেগাসের কামনা অন্য কিছু, আরও গভীর।

ফ্রেগাস যখন দেখছে, আফীরা ও সাফওয়ানের কথা বলতে-বলতে হাসাহাসি করছে, তখন হিংসার আগুনে তার অন্তরটা পুড়ে যাচ্ছে এবং মনে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু বিষয়টি সে হজম করে নিচ্ছে– বাইরে প্রকাশ পেতে দিচ্ছে না।

দিনের-পর-দিন অতিবাহিত হচ্ছে। আমের ক্রমান্বয়ে সুস্থ হয়ে ওঠছেন। তাঁর ক্ষত শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জখম ভরাট হতে এখনও অনেক বাকি। তিনি হাঁটা-চলা করতে শুরু করেছেন। প্রাসাদের বাইরে না বেরোলেও ভেতরে হাঁটাহাটি করছেন।

ফ্রেগাস তার কর্মনীতি ও মতিগতি দ্বারা প্রমাণিত করেছে, সে পালাবার চেষ্টা করবে না। পলায়নের কোনো ইচ্ছেও তার নেই। অবশিষ্ট গোটা জীবন সাফওয়ানের সঙ্গে কাটানোই তার মনের ঐকান্তিক কামনা। তাই তার প্রতি কোনো নজর রাখা হচ্ছে না। প্রায়ই দুর্গের ভেতরে বান্ধবীদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এবং মাঝে-মধ্যে দুর্গের বাইরেও চলে যাচ্ছে।

ফ্রেগাস শুধু ধনীর দুলালীই ছিল না– হেরাতের গভর্নরের কন্যাও ছিল। তাই তার ওঠাবসা-চলাফেরাও ছিল শাসকশ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে। তাদের কয়েকজন– যাদের পিতারা সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল– গ্রেফতার হয়ে দাসীতে পরিণত হয়েছে এবং ইসলামি বাহিনীর সঙ্গে চলে গেছে। কিন্তু কয়েকটি মেয়ে দুর্গে রয়ে গেছে। ফ্রেগ্রাস সুযোগ পেলে তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করতে যাচ্ছে।

ফ্রেগাসের পিতার কয়েকটি বাগান ছিল। সেগুলো এখন ইসলামি সরকারের দখলে আছে। বেশ কদিন যাবত ফ্রেগাস বাগানে ঘুরতে যেতে পারেনি। কিন্তু

আজ কয়েকদিন হলো প্রতিদিনই যাচ্ছে। কয়েকবার আফীরাকেও উৎসাহিত করেছে। ইরানি ফল ও ফুলের লোভ দেখিয়ে রাজি করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পিতার অসুস্থতার কথা চিন্তা করে যেতে সম্মত হয়নি।

একদিন দুপুরবেলা ফ্রেগাস ফুল-বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ফুলের কেয়ারিতে ঘুরে-ঘুরে সুরভিত হচ্ছিল। হঠাৎ কারও পায়ের শব্দ তার কানে এল। মোড় ঘুরিয়ে দেখল, ফায়রোজান সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রেগাস বিস্মিত চোখে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলল, তুমি...!

ফায়রোজান গম্ভীর কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ, আমি– তোমার পাপিষ্ঠ।

ফ্রেগাসের মনে ক্ষোভ জেগে ওঠল। তার চেহারাটা লাল হয়ে গেল। বলল, আমার সামনে আসবার সাহস কীভাবে হলো তোমার?

অপরাধের স্বীকৃতি দিতে এবং কৃত অপরাধের সাজা নিতে এসেছি। আমি তোমার দয়ালু হৃদয়ের কাছে করুণার আবেদন জানাতে এসেছি। একথা বলেই ফায়রোজান পকেট থেকে খঞ্জরটা বের করে ফ্রেগাসের সম্মুখে ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং বলল, খঞ্জরটা তুলে নাও, আমার মাথাটা উড়িয়ে দাও।

ফ্রেগাস দাঁত কড়মড় করে বলল, মন তো এমনই চায়, কিন্তু...।

ফায়রোজান কথা কেটে বলল, ভালবাসা এসে পথ আগলে দাঁড়ায়, না?

না। একটি কচি শিশুর ভাবনা।

কচি শিশু? ফায়রোজান বিস্মিত চোখে ফ্রেগাসের প্রতি তাকিয়ে বলল।

হ্যাঁ, একটি কচি শিশুর ভাবনা আমার মনোবাঞ্ছা পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অন্যথায় তোমার মাথাটা দেহ থেকে আলাদা করে আমি আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করতাম।

কোন শিশুর কথা বলছ?

তোমার ও আমার পাপময় জীবনের স্মারক একটি কন্যাশিশু।

কোথায় ও?

এতদিন যাবত আমি ওর দেখাশোনা করেছি। এখন দায়িত্বটা তোমাকে নিতে হবে। বলো, তুমি কি রাজী?

রাজী বটে; কিন্তু...।

কিন্তু কী?

যদি ক্ষেপে না যাও, তাহলে বলব।

বলো।

তুমি কি নিশ্চিত, আমিই শিশুটি জনক?

ফ্রেগাস আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠল। তার চোখ দুটো আগুনের ফুলকি ছড়াতে শুরু করল। জিজ্ঞেস করল, তোমার তাতে সন্দেহ কেন?

তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে, আমি কেন তোমার সম্পর্কটা ছিন্ন করেছিলাম।

আমার এক বান্ধবী আমাকে বলেছিল, তুমি রাজপরিবারের কোনো একটি মেয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছ এবং তাকে পেতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছ।

তোমাকে ভুল তথ্য শোনানো হয়েছে। আসল সত্য হলো, একদিন আমি নিয়মের বাইরে ঘটনাচক্রে এই বাগানে এসেছিলাম। সে-সময় তোমাকে আমি এক সুদর্শন ইরানি যুবকের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। দৃশ্যটি আমি মেনে নিতে পারিনি। আত্মমর্যাদায় আমার দেহের রক্তগুলো টগবগ করে ওঠেছিল। একবার ভেবেছিলাম, এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করি, ছেলেটি কে এবং কেন এমন নির্ভীকমনে তোমার সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু তাতে বিবেকের সায় পেলাম না এবং ফেরত চলে গেলাম। পরে একদিন যখন তোমার সাক্ষাতে তোমাদের প্রাসাদে গেলাম, তখন পরিকল্পনা ছিল, তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের পর তোমার পিতার সঙ্গে দেখা করে বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক করে আসব। কিন্তু তোমার কক্ষে প্রবেশ করে দেখলাম, তুমি সোফার উপর আধশোয়া পড়ে আছ আর সেই ইরানি– যাকে বাগানে তোমার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিলাম– তোমার উপর ঝুঁকে আছে। দৃশ্যটা দেখামাত্র আমার দেহে এমন একটি অগ্নিশিখা জ্বলে ওঠল, যেটি পায়ের গোঁড়ালি থেকে উঠে আমার মন-মস্তিষ্ক সবকিছুকে পুড়িয়ে ভস্মে পরিণত করে বেরিয়ে গেছে। আমি অস্ফুট স্বরে বললাম, হায় কপাল! কিন্তু তোমরা দুজন প্রেমসাগরে এমন ডুব-সাঁতারে লিপ্ত ছিলে, যৌন-মাদকতায় এতটা চুর ছিলে যে, আমার আগমন টের পাওনি।

আমি উলটোপায়ে ফিরে এলাম এবং তখনই মারাদশাহজাহানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম। আমি যা কিছু দেখলাম, তাতে তোমার প্রতি আমার আস্থা আর আমার প্রতি তোমার অফাদারি মুহূর্তমধ্যে ফুটো বেলুনের মতো হাওয়ায় মিশে গেল। তোমার-আমার ভালবাসার কাচের ঘর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। আমি তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললাম। তারপর আজকের আগে আর হেরাত আসিনি।

লজ্জায় ফ্রেগাসের মাথাটা খানিক নুয়ে পড়ল বলে মনে হলো। তবে নির্লজ্জের মতো বলল, কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, শিশুটি তোমারই ঔরসজাত।

ফায়রোজান বলল, ক্ষমা করো; এখন আর আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।

ফ্রেগাস চিত্তহারী চোখ দুটো তুলে জিজ্ঞেস করল, কেন?

তার কারণ, আমি যখন তোমার উপর অপবাদ আরোপ করলাম, তখন তোমার জন্য সুযোগ ছিল, তুমি প্রতিবাদ করতে। কিন্তু তুমি একটি শব্দও উচ্চরণ করনি। উলটো লজ্জায় তোমার দৃষ্টি অবনত হয়ে পড়েছিল, যেন জিহ্বার কাজ চোখ করেছে। তাই আমি নিশ্চিত নই, তুমি সত্য বলছ।

আমি সত্যই বলছি। তুমি যে-লোকটির কথা বলছ, সে মারাদরোদের মারযুবান। লোকটি আমার প্রতি ভীষণ আসক্ত হয়ে পড়েছিল। আমি তার পিছু ছাড়াতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার আব্বাজান তার থেকে কিছু অর্থ ঋণ নিয়েছিলেন। সেই সূত্রে আমাকে তার মন জুড়িয়ে চলতে হচ্ছিল। তুমি আমাকে ত্যাগ করে চলে এলে আমি মনে খুব ব্যথা পেয়েছিলাম। ফলে বাধ্য হয়ে আমি তার প্রতি ঝুঁকে গেলাম। তাতে সে খুব খুশি হলো এবং প্রতিশ্রুতি দিল, আগামীতে যখনই আসবে, বিয়ের তারিখ ঠিক করে যাবে। আমি চাচ্ছিলাম, বিয়েটা এখনই হয়ে যাক। কিন্তু তোমার ও আমার পাপের বোঝা আমার পা দুটোকে ভারী করে দিয়েছিল। আমি তাকে চাঁপ দিলাম, কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন। তিনি আব্বাজানকে প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আব্বাজান তাকে আশ্বাস দিলেন বটে; কিন্তু তিনি সময় নিলেন। তখন বাস্তবতা এই ছিল যে, সে-সময় আব্বাজানের কিছু অর্থের প্রয়োজন ছিল। তার কাছ থেকে তিনি আরও কিছু ঋণ নিতে চাচ্ছিলেন। তিনি চলে গেলেন এবং চার মাস পর এলেন। ততদিনে আমি মা হওয়ার উপক্রম হলাম। এই অবস্থায় তার সামনে যেতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু ঘটনাক্রমে সামনে পড়ে গেলাম। আমাকে দেখেই তিনি সবকিছু বুঝে ফেললেন এবং তৎক্ষণাৎ ফিরে গেলেন। এবার তুমি বলো, সন্তানটি কার?

ফায়রোজান জিজ্ঞেস করল, তোমার পিতা যখন জানতে পারলেন তুমি মা হতে যাচ্ছ, তখন তিনি কী বললেন?

ফ্রেগাস বলল, আমি খুবই চিন্তিত ছিলাম। কিন্তু আব্বাজান এই বলে আমাকে সান্ত্বনা দিলেন যে, যে-কারও দ্বারাই বোকামি হতে পারে; তুমি চিন্তা করো না।

ফায়রোজান বলল, তোমার দ্বারা আমাকে একটি সওদা করতে হবে। যদি ভালো মনে কর, তাহলে আগামী কাল এই সময় এখানে এসো।

ফ্রেগাস বলল, কথা দিলাম, আসব।

ফায়রোজান চলে গেল। ফ্রেগাসও প্রাসাদে ফিরে গেল।

একত্রিশ.

পরদিন ফ্রেগাস ওয়াদা মোতাবেক বাগানে এল। ফায়রোজান আগেই এসে বসে আছে। ফ্রেগাস বলল, আমি এসেছি; বলো কী সওদা করতে চাচ্ছ?

প্রথম কথা হলো, তোমার শিশুকন্যাটির জন্য আমি তোমাকে এত দেব যে, জীবনভর তুমি রাজার হালে বসে-বসে খেতে পারবে।

ফ্রেগাস কথা কেটে বলল, এই প্রস্তাব আমি মানি না। ও তোমার সন্তান; তুমি ওকে নিয়ে নাও।

যদি না নিই, তাহলে?

আমি চিৎকার করব। কাছাকাছি কোথাও কোনো-না-কোনো মুসলমান থেকে থাকবে। এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

কিন্তু আমার অপরাধ কী? মুসলমানরা আমাকে কেন গ্রেফতার করবে?

কারণ, তুমি হেরাতের নাগরিক নও। এই নগরীর অধিবাসীরা জিযিয়া আদায় করে মুসলমানদের জিম্মাদারি অর্জন করে নিয়েছে। অন্য এলাকার মানুষ বলে তুমি মুসলমানদের জিম্মাদারিতে নেই। তারা গোয়েন্দা মনে করে তোমাকে গ্রেফতার করবে।

ফ্রেগাসের যুক্তিতে ফায়রোজানের চেহারা ফিকে হয়ে গেল। কিন্তু চতুরতা দ্বারা মনের ভীতিকে লুকিয়ে রেখে শান্তকণ্ঠে বলল, আমিও যদি মুসলমানদের জিম্মাদারি নিয়ে থাকি?

তুমি যদি তাদের জিম্মাদারি নিয়ে থাকতে, তা হলে শহরেই আসতে পারতে।

তুমি জান না, শহরে আমি একবার নয়– একাধিকবার এসেছি। শহরে এসেই তো আমি সেসব তথ্য সংগ্রহ করেছি, যা বলবার জন্য আমি তোমাকে আসতে বলেছি।

ফ্রেগাস এই যুক্তির কোনো উত্তর খুঁজে পেল না। তাই চুপসে গেল। ফায়রোজান বলল, আমি তোমাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করব আর কয়েকটি কথা বলব। তারপর একটি সওদা করব। বলো, জিজ্ঞেস করব?

করো।

তুমি সব সময় চিন্তিত ও বিমর্ষ থাক কেন?

আমাকে ক্ষমা করো; এই রহস্য তোমার মতো লোকের কাছে বলা যাবে না।

কিন্তু আমি যে রহস্যটা জানি!

ফ্রেগাস বিস্মিত নয়নে ফায়রোজানের প্রতি তাকিয়ে বলল, তোমার জানা আছে?

হ্যাঁ, তুমি কি এখন এক আরবের দাসী নও?

হ্যাঁ, আমি এখন দাসী।

ওই আরব লোকাটির প্রতি তোমার ভালবাসা নেই কি?

ফ্রেগাস অধিক বিস্মিত হয়ে ফায়রোজানের প্রতি তাকাল। বলল, আছে।

এবার বুঝে নাও, তোমার তথ্য-রহস্য আমার জানা আছে কি-না।

মেনে নিলাম, আমার সব রহস্য তোমার জানা আছে।

উক্ত আরবও কি তোমাকে ভালবাসে?

না।

কেন?

স্বজাতীয় একটি মেয়ের সঙ্গে তার ভালবাসা আছে।

মেয়েটি খুব সুন্দরী, না?

হ্যাঁ।

ওর নাম কী?

আফীরা।

আর আরব ছেলেটির নাম?

সাফওয়ান।

তুমি কি চাচ্ছ, তোমার ও সাফওয়ানের মধ্য থেকে আফীরাকে সরিয়ে দেওয়া হোক?

হ্যাঁ, আমি তা চাই।

আমি এই সওদাটিই করতে এসেছি।

ফ্রেগাস ফায়রোজানের প্রতি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী বলতে চাচ্ছ তুমি, খুলে বলো।

মানে, তুমি যদি আমাকে সহযোগিতা কর, তা হলে আমি আফীরাকে তোমাদের মধ্য থেকে সরিয়ে দেব।

এটা কঠিন হবে।

কোনো কঠিন নয়। শুধু একটু সাহস দরকার।

আমাকে কী করতে হবে?

তোমার কাজ হলো, একদিন আফীরাকে এখানে নিয়ে এসো।

কিন্তু সে তো কোথাও যাওয়া-আসা করে না।

তুমি চেষ্টা করো।

তাকে তুমি জান না। অত্যন্ত বুদ্ধিমতি, চতুর ও চৌকস। প্রতারণার জালে আসবার মতো মেয়ে নয়। যদি এখানে এসেও পড়ে, তুমি একা কিছু করতে পারবে না। ও খুব বীরাঙ্গনা মেয়ে।

সেকথা তোমার বলতে হবে না। আমি স্বয়ং তার বীরত্ব দেখেছি। আমি একা থাকব না। সঙ্গে আরও লোক থাকবে।

তাকে তুমি কোথায় নিয়ে যাবে?

আমাদের সম্রাট ইয়ায্‌দাজার্‌দ শুধু লোকমুখে রূপের বর্ণনা শুনে তার প্রতি প্রবল আসক্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি আমাকে ও তার ঘনিষ্ঠ সহচর খোরযাদকে প্রেরণ করেছেন এবং আদেশ দিয়েছেন, যেভাবে হোক আমরা যেন আরবের রূপসীটিকে তার কাছে পৌঁছিয়ে দিই। আমাদের সঙ্গে বাহিনীও আছে। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরা যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত আছি।

ফ্রেগাস কিছু ভাবতে শুরু করল। ফায়রোজান বলল, আমি তোমাকে যে-সওদার কথা বলেছিলাম, এ-ই সেই সওদা। আফীরা তোমার পথের কাঁটা। তুমি এই কাঁটাটা সরাতে চাচ্ছ। আমরা তোমাকে সহযোগিতা দেব। আবার আমাদের শাহেনশাহর আফীরাকে প্রয়োজন। তুমি আমাদেরকে সহযোগিতা দাও। মেয়েটিকে যে করে হোক একদিন এখানে নিয়ে এসো।

ফ্রেগাস ফায়রোজানের প্রতি তাকিয়ে বলল, আফীরাকে তুমি কখন থেকে জান?

যখন সে খোরাসানের সীমানায় প্রবেশ করেছিল।

আর সঙ্গে-সঙ্গে তার প্রতি তোমার ভালবাসা জন্মে গিয়েছিল, না?

হ্যাঁ। কিন্তু তার রূপের খ্যাতি ইয়ায্‌দাজার্‌দ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ফলে এখন ওকে তাঁর জন্য অর্জন করতে চাচ্ছি।

ফ্রেগাস খিলখিল করে হেসে ওঠল। বলল, তুমি এক আজব মানুষ।

ফায়রোজান বলল, তুমি কি রাজী?

ফ্রেগাস বলল, আগে বলো, তুমি কী করে জানলে, আমি সাফওয়ানকে পেতে আফীরাকে সরাতে চাচ্ছি?

তোমার বান্ধবী শাহরান বলেছে। তুমি নিজের পুরো অবস্থা তাকে বলেছ।

হ্যাঁ, আমি আমার সব কথাই ওকে খুলে বলেছি। ও আমার সমব্যথী ও অন্তরঙ্গ সাথী। একজনের গোপন কথা আরেকজনকে বলি। কিন্তু ওর সঙ্গে তোমার কবে সাক্ষাত হয়েছে?

তার এক ভাই আছে আমাদের সহকর্মী। তার নাম নিরোরা। একদিন রাতে সে গোপনে বোনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। তার থেকে তথ্য পেয়েছে, এক আরব মেয়ে এখানে অবস্থান করছে এবং মেয়েটি খুবই রূপসী। তার পিতা যুদ্ধে আহত হয়েছে এবং তার বাগদত্তা যুবকটি হেরাতের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছে। ফিরে এসে সে এসব তথ্য আমাকে জানাল। আমি ধরে নিলাম, আমরা যে-আরব মেয়েটিকে খুঁজে ফিরছি, এ-ই সেই মেয়ে। আমি তাকে দেখতে উদগ্রীব হয়ে ওঠলাম। জানতে পারলাম, মেয়েটি প্রসাদ থেকে বেরই হয় না। আমি ও নিরোরা বেশ বদল করে হেরাতে কয়েকদিন অবস্থান করলাম। একদিন ঘটনাচক্রে মেয়েটি ফটকের কাছে এসে পড়ল। আমি দেখে নিলাম। এই সেই মেয়ে, আমরা যার অনুসন্ধানে ঘুরে ফিরছি। আমি শাহরানের সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। সে আমাকে তোমার পুরো অবস্থা শোনাল। ভাবলাম, শাহরানের সহযোগিতায় তার ঘরে তোমার সঙ্গে সাক্ষাত করব। কিন্তু মনে আশঙ্কা জাগল, পাছে হঠাৎ ভয় পেয়ে তুমি আমাকে ধরিয়ে দাও কিনা। তাই সেই পরিকল্পনা বাদ দিলাম। গতকাল তোমাকে এখানে আসতে দেখলাম আর এখানে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করলাম।

তুমি ভালোই করেছ যে, আমার সঙ্গে হেরাতে সাক্ষাত করার চেষ্টা করনি। অন্যথায় তোমার প্রতি আমি এত ক্ষুব্ধ ছিলাম যে, নির্ঘাত ধরিয়ে দিতাম।

যাক, এখন তো ক্ষোভ দূর হয়ে গেছে।

এখনও হয়নি।

যদি শাস্তি দ্বারা ক্ষোভ দূর হওয়ার হয়, তা হলে আমি উপস্থিত; শাস্তি দাও।

তুমি যদি শিশুটির লালন-পালনের ভার মাথায় তুলে নাও, তাহলে আমার ক্ষোভ দূর হতে পারে।

আমি ওয়াদা দিচ্ছি, সন্তানটিকে আমি নিয়ে নেব। কিন্তু তোমাকে কটা দিন অপেক্ষা করতে হবে।

আমি অপেক্ষা করব।

আচ্ছা, আফীরাকে তুমি কবে নিয়ে আসবে এখানে?

এখনও ওয়াদা দিতে পারছি না।

তোমার ভবিষ্যতকে যদি তুমি উজ্জ্বল বানাতে চাও, নিজের পরিকল্পনায় যদি সফল হতে চাও এবং হেরাতের গভর্নরের স্ত্রী হতে চাও, তা হলে যে-কোনো কৌশলে হোক আফীরাকে এখানে নিয়ে আসো।

আমি ভেবে দেখব।

ভাবো। আজ পুরো দিন চিন্তা করো। কাল এসে আমাকে সিদ্ধান্ত জানিয়ো।

হ্যাঁ, আগামী কাল এসে আমি তোমাকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেব।

আমি তোমাকে আবারও বলছি, যখন এই কাঁটাটি তোমার পথ থেকে সরে যাবে, তখন তুমি ফুল-বাগানে ঢুকে যেতে পারবে। তারপর আজীবন সুখে জীবন কাটাবে।

ফায়রোজান চলে গেল।

ফ্রেগাসও ফিরে এল।

বত্রিশ.

ইয়ায্‌দাজার্‌দ ইসলামি বাহিনীর তথ্য সংগ্রহের জন্য গোয়েন্দা নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। এই গোয়েন্দারা মারাদশাহজাহান থেকে হেরাত পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। যখন হেরাত জয় হয়ে গেল, তখন গোয়েন্দারা মারাদশাহজাহান পৌঁছে তাদের অফিসারদেরকে সংবাদ জানান। কিন্তু অফিসার শাহেনশাহ ইয়ায্‌দাজার্‌দকে এই দুঃসংবাদ শোনানোর সাহস পেল না।

ইয়াযদাজার্‌দ ভোগ-বিলাসিতা ও আনন্দ-ফুর্তিতে লিপ্ত। একের-পর-এক নাচ-গানের আসর চলছে। এসব আসরে নারী ও পুরুষ সমানভাবে অংশগ্রহণ করছে। ঊর্বষী তরুণী-যুবতীরা তাদের রূপ-যৌবনের সুষমা ছড়িয়ে নাচছে ও গাইছে। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার মহড়া চলছে।

খোরযাদ একদিন এমনই এক আসর উপভোগ করছিল। অর্ধনগ্না রূপসী মেয়েরা নাচছিল। রাজপরিবারের কন্যা-জায়ারাও উপস্থিত ছিল। ছিল এক রাজকুমারীও।

এই রাজকুমারী মেয়েটিকে খুব সরলা মনে হলো। তবে নিরতিশয় রূপসী ও সুদর্শনা। টাইট-ফিট রেশমি পোশাক তার সুডৌল দেহবল্লরির আকর্ষণীয় অঙ্গগুলোকে ফুটিয়ে রেখেছে। বিশেষত বক্ষের স্ফীতি যে-কোনো পুরুষকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছে। খোরযাদ মেয়েটির প্রতি অপলক চোখে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ ইয়ায্‌দাজার্‌দ খোরযাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, ফায়রোজান এখনও এল না, না?

না, আসেনি। তবে যে-বাহিনীটি নিয়ে গিয়েছিল, তাদেরকে ফেরত পাঠিয়েছে।

কেন ফেরত দিল? ইয়ায্‌দাজার্‌দ ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

সম্ভবত বাহিনীর প্রয়োজন নেই।

আর ওই আরব হরিণীটির খবর কী?

ফায়রোজান ওকে তুলে আনবার চেষ্টায় আছে। কয়েকজন বিচক্ষণ বীর সৈনিককে সে রেখে দিয়েছে।

তুমি মেয়েটির রূপ-যৌবনের ভূয়সী প্রশংসা করে আমাকে পাগল বানিয়ে দিয়েছ। আমার অন্তরে প্রেমের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ। আমি মেয়েটিকে একনজর দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছি।

আমি আপনাকে যথার্থই বলেছি। আর তাতে আপনার মাঝে যে-প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে, তাও যথাযথ। আপনি অপেক্ষা করুন। ফায়রোজান আপনার জন্য জীবনের বাজি লাগাবে।

আমার দর্শনাকাঙ্খা কবে পূর্ণ হবে?

আমি জানতে পেরেছি, ফুলকলিটি যে-বাহিনীটিতে ছিল, সেটি মুসলমানদের বৃহৎ বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। এ-কারণেই ফায়রোজান বাহিনীর প্রয়োজন নেই ভেবে তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ ক্ষেপে গিয়ে বললেন, বোকা কোথাকার! এমন পরিস্থিতিতে বাহিনীর আরও বেশি প্রয়োজন ছিল।

ইসলামি বাহিনীর মোকাবেলায় পাঁচ হাজারের একটি বাহিনী খুবই অল্প ছিল।

ও তো হেরাত থেকে সাহায্য নিতে পারত। এ তো তার জন্য মোক্ষম সুযোগ ছিল। একদিক থেকে হেরাতের বাহিনী আর অন্যদিক থেকে তার নিজের বাহিনী আক্রমণ করে মুসলমানদের নিঃশেষ করে ফেলতে পারত।

ফায়রোজানও এমনটিই চিন্তা করেছিল। কিন্তু যখন সে হেরাত পৌঁছুল, ততক্ষণে...।

কী হলো?

ততক্ষণে হেরাতের বাহিনী পরাজয় বরণ করেছে আর মুসলমানরা হেরাতে ঢুকে পড়েছে।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ যেন খোরযাদের এই তথ্যটি বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি চিৎকার করার মতো শব্দ করে বললেন, এ কী বললে তুমি?

খোরযাদ ভয় পেয়ে গেল। তার মনে আশঙ্কা জাগল, পাছে ইয়ায্দাজার্দ ক্ষুব্ধ হয়ে রাগের মাথায় তাকে হত্যা করে ফেলেন কিনা। তাই আর কোনো কথা না বলে চুপচাপ বসে রইল।

ইয়ায্দাজার্দ আগুনের মতো জ্বলে উঠে বললেন, বলো, এ তুমি আমাকে কী শোনালে?

খোরযাদ জীবনের আশা পরিত্যাগ করে ম্লানকণ্ঠে বলল, মহারাজ, আমি যা বুঝেছি ও শুনেছি, তা-ই আপনাকে শোনালাম।

তুমি যা কিছু শুনেছ, পরিষ্কার করে বলো।

সর্বত্র সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে যে, হেরাতের গভর্নর নারসি পরাজয়বরণ করেছেন এবং হেরাত মুসলমানদের দখলে চলে গেছে।

গোয়েন্দাদের অফিসার কোথায়?

গোয়েন্দা অফিসার তখন সেখানে উপস্থিত ছিল না। খোরযাদ করজোড়ে বলল, এখনই উপস্থিত করছি মহারাজ।

কয়েকজন সুবেদার গোয়েন্দা অফিসারকে ডেকে আনতে ছুটে গেল। লোকটি এসে হাজির হলো। ভয়ে তার চেহারাটা হলুদ হয়ে গেছে। শরীরটা যেন থরথর করে কাঁপছে। এসেই ভূতলে লুটিয়ে শাহেনশাহকে অভিবাদন জানাল।

ইয়ায্দাজার্দ রোষকষায়িত লোচলে বললেন, হেরাত নাকি মুসলমানরা জয় করে নিয়েছে?

একথা সত্য মহারাজ।

তোমার গোয়েন্দারা কি সংবাদ জানায়নি?

জানিয়েছিল। কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাই আমি সংবাদের সত্যতা যাচাই করছিলাম।

তুমি আমাকে অবহিত করলে না কেন?

আমার সাহস হয়নি।

ইয়ায্দাজার্দ চিৎকার করে বললেন, তুমি দেশের শত্রু, জাতির শত্রু, আমার শত্রু। তোমার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এর মাথাটা উড়িয়ে দাও।

শাহেনশাহর নিরাপত্তার জন্য বেশ কজন লোক নাঙ্গা তরবারি হাতে নিয়ে সব সময় তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে। আদেশ পেয়ে তাদের কয়েকজন তরবারি উঁচু করে অফিসারের দিকে এগিয়ে এল। অফিসার দৌড়ে ইয়ায্দাজার্দ-এর পায়ের উপর পড়ে গেল। বলল, দয়া করুন মহারাজ।

ঠিক এমন সময় একটি রূপসী মেয়ে আসর থেকে উঠে এসে শাহেনশাহর সম্মুখে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে গেল। বিনীত কণ্ঠে বলল, মহারাজ, আমার পিতার উপর দয়া করুন।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর আসরগুলোতে তার মোসাহেব, সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলি, মন্ত্রীবর্গ, সেনা-অফিসার ও অপরাপর কর্মকর্তাদের সুন্দরী বোন-কন্যা ও স্ত্রীরা অংশগ্রহণ করত, যাতে আপন-আপন পিতা, ভাই ও স্বামীদের পদোন্নতির জন্য চেষ্টা চালাতে পারে এবং কোনো কারণে শাহেনশাহ কারও প্রতি ক্ষেপে গেলে তারা সুপারিশ করতে পারে।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ চোখ তুলে মেয়েটির প্রতি তাকালেন এবং বললেন, ঠিক আছে, এই মেয়েটির সুপারিশে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। তবে ভবিষ্যতে এমন ভুল যেন না হয়।

অফিসার উঠে দাঁড়িয়ে শাহেনশাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। ইয়ায্‌দাজার্‌দ প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মোসাহেবদের উদ্দেশ করে বললেন, মুসলমানরা যখন হেরাত জয় করে নিয়েছে, তা হলে তো এবার তারা এদিকেই অগ্রসর হবে।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুসলমানরা এখন মারাদশাহজাহানের দিকেই অগ্রসর হবে।

গোয়েন্দা অফিসার বলল, আমি হেরাত জয়ের সংবাদের সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য যাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম, তারা একটু আগে ফিরে এসেছে। তারা জানিয়েছে, মুসলমানরা মারাদশাহজাহান অভিমুখে রওনা হয়েছে। এই সংবাদটা শোনানোর জন্যই অধম শাহেনশাহর খেদমতে হাজির হয়েছিল।

রিপোর্ট শুনে ইয়ায্‌দাজার্‌দ এত আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন, যেন মুসলমানরা এসেই পড়েছে। তিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এখন আমাদের কী করা উচিত?

প্রধানমন্ত্রী বললেন, এর উত্তর সেনাপ্রধান দেবেন।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ সেনাপ্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সেনাপ্রধান বললেন, এই মুহূর্তে শাহেনশাহর সঙ্গে ত্রিশ হাজার সৈন্য আছে। আমি যতদূর জানি, মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা দশ হাজারের বেশি হলেও পনেরোর কম। শাহেনশাহ আদেশ করলে আমি এখানেই তাদের মোকাবেলা করতে পারি।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বললেন, না, এতো অল্প সৈন্য দ্বারা মুসলমানদের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, শাহেনশাহর ধারণাই সঠিক। এ-পর্যন্ত মুসলমানদের যেসব কীর্তির কথা শুনেছি, সেসব খুবই বিস্ময়কর ও ভয়ানক। আমার মতে কিছু সৈন্য মারাদশাহজাহানে রেখে অবশিষ্টদের নিয়ে শাহেনশাহ্‌ মারাদরোদ চলে যান। ওখানে পৌঁছে খাকান ও তুর্কিস্তানের অন্যান্য সম্রাটদের থেকে সাহায্য তলব করুন। যখন সহযোগী বাহিনী এসে পড়বে, তখন পূর্ণ শক্তি ও উদ্দীপনার সঙ্গে মুসলমানদের মোকাবেলা করা যাবে।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ বললেন, এই প্রস্তাবই বেশি উপযোগী।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ ও তাঁর মন্ত্রী-উপদেষ্টা সবাই ভোগ-বিলাসিতায় লিপ্ত হওয়ার কারণে ভীরু হয়ে গেছে। এখন তারা যুদ্ধের নামে ভয় পেতে শুরু করেছে। তাই সবাই মন্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করল।

সবার মনে ভয় ধরে গেছে, মুসলমানরা না-জানি কখন এসে পড়ে। তাই তখনই সেখান থেকে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। কিন্তু যেহেতু শাহেনশাহও সফরে যাবেন, তাই এত তাড়াহুড়া সত্ত্বেও রওনা হতে কয়েক দিন সময় লেগে গেল। অবশেষে একদিন ইয়ায্‌দাজার্‌দ সৈন্য ও হেরেমসহ মারাদরোদ অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

তেত্রিশ.

ফ্রেগাস এদিন অবশিষ্ট সময় চিন্তা করতে থাকল। কখনও মনে ভাবনা জাগল, তার এই আচরণ আমের ও সাফওয়ানের সঙ্গে বড় রকম বিশ্বাসঘাতকতা বলে বিবেচিত হবে। কখনও মনের পর্দায় খেয়াল ভেসে ওঠল, এর ফলে সাফওয়ান খুব কষ্ট পাবে। আবার কখনও বিবেক এই বলে সায় দিল যে, এতে আমার জীবন তো উজ্জ্বল হবে। কখনও বিবেক তাকে ভর্ৎসনা করল। কখনও-বা আত্মস্বার্থ তাকে উৎসাহিত করল।

এই চিন্তা-ভাবনা ও টানাপড়েনের মাঝে এদিন মেয়েটি মন দিয়ে কোনো কাজ করতে পারল না। ফলে সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেল। এমনকি আজকের রান্নাটাও সুস্বাদু হলো না।

আফীরা জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার, আজ তোমার মনটা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

না, একথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

আমার তো তা-ই মনে হচ্ছে। আজ খাবার ভালো পাকাওনি। আমার থেকে লুকোচ্ছ কেন? আমি তোমাকে কতবার বলেছি, যখন মন খারাপ লাগবে কিংবা কাজ করতে মন না চাইবে, তখন আমাকে বোলো; সব কাজ আমি করব।

আফীরা সাধারণত সব কাজ নিজেই করে ফেলত। কিছু-কিছু কাজ তো রোজই করত। ফ্রেগাসের সঙ্গে তার বেশ আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তাই তাকে সব সময় কাজে ব্যস্ত রাখা তার ভালো লাগত না। মেয়েটিকে সে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত এবং আরাম দিত। তা ছাড়া ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর মতো ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা গল্প করে বেড়াত।

রাতে ফ্রেগাস আফীরার অবদান, মমতা ও সহমর্মিতার কথা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, ফায়রোজানকে জবাব দিয়ে দেবে। আফীরার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর তার মনের বোঝা কিছুটা হালকা হয়ে গিয়েছিল।

সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে ফ্রেগাস সে-বেলার কাজে লেগে গেল। আফীরাও কিছু-কিছু কাজে হাত লাগাল। আফীরা বলল, ফ্রেগাস, আমি তোমাকে বেশ অস্থির ও অন্যমনস্ক দেখতে পাচ্ছি। এই জীবন যদি তোমার পছন্দ না হয়, তা হলে বলো, সুপারিশ করে আমি তোমাকে মুক্ত করিয়ে দিই।

ফ্রেগাস বলল, ব্যাপার তা নয়। বুঝতে পারছি না, গত কাল মনটা হঠাৎ কেন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এখন কোনো সমস্যা নেই। আমার সঙ্গে তুমি বোনের মতো আচরণ করছ। তোমার সঙ্গ ত্যাগ করতে আজি রাজি নই।

আফীরা বলল, যদি বিয়ে করতে চাও, তাহলে বলো, তারও ব্যবস্থা করব।

ফ্রেগাস বলল, ব্যাপার তা নয়। পরক্ষণেই মুখে হাসির আভা ছড়িয়ে বলল, বিয়ে যদি করতেই হয়, তোমাকেই করব।

ফ্রেগাসের রসিকতাপূর্ণ কথা শুনে আফীরাও হেসে ফেলল। বলল, তা হতে পারে। তুমি আমার যোগ্য জুড়িই বটে।

দুজন মধুর ও সুদর্শন একটা হাসি দিল। আফীরা জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, তুমি মাঝে-মধ্যে দুপুরবেলা কোথায় অদৃশ্য হয়ে যাও?

ফ্রেগাস বলল, ওদিকে মনোরম একটা বাগান আছে। বাগানে নানা জাতের ফল আছে– অত্যন্ত সুস্বাদু ও রসালো। ফুলও আছে– অতিশয় সুন্দর ও সৌরভময়। ইচ্ছে হলে বলো, একদিন নিয়ে যাব।

সাফওয়ান যদি অনুমতি দেয়, তাহলে যাব।

ফ্রেগাস মুচকি হেসে বলল, উনি তোমাকে কোথাও যাওয়ার অনুমতি দেবেন কেন? উনি তো চাচ্ছেন তুমি সারাক্ষণ আয়নার মতো তাঁর সামনে উপস্থিত থাক।

দুষ্টু মেয়ে। বলে আফীরা হেসে ওঠল।

সেদিনই দুপুরবেলা ফ্রেগাস বাগানে গেল। ফায়রোজান আগেই এসে তার অপেক্ষা করছিল। দুজন মুখোমুখি হওয়ার পর কোনো ভূমিকার অবতারণা না করেই ফায়রোজান প্রশ্ন করল, বলো ফ্রেগাস, কী চিন্তা করেছ?

ফ্রেগাস বলল, আমি আফীরাকে ধোঁকা দিতে পারব না।

ফায়রোজান বলল, হতভাগী কোথাকার! নিজেই নিজের পায়ে কুড়াল মারো। নিজের জীবনটাকে নিজেই অন্ধকার বানিয়ে ফেলো। নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনলে অন্যের কিছু করবার থাকে না।

খানিক থেমে ফায়রোজান বলল, এখনও সময় আছে। নতুন করে চিন্তা করো। এই সুযোগটাকে হাতছাড়া করো না। মনে রেখো, সুযোগ বারবার আসে না।

ফ্রেগাস কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, ঠিক আছে, আমি তাকে এনে দেব।

ফায়রোজান খুশি হয়ে গেল। বলল, এবার তুমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ। আচ্ছা, কবে আনবে?

আগামী কাল ঠিক এই সময়।

ফায়রোজান চলে গেল। ফ্রেগাস সুন্দর-সুন্দর কতগুলো ফুল ছিঁড়ে এবং আঙুরের কয়েকটি ছড়া নিয়ে ফিরে এল।

প্রাসাদে গিয়ে ফুল ও আঙুরগুলো আফীরার সামনে রেখে দিল। দেখে আফীরা খুব খুশি হলো। আফীরা আঙুর চেনে না। একবার সাফওয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিল; কিন্তু কোনো উত্তর পায়নি। আজ ফ্রেগাসকে জিজ্ঞেস করল।

ফ্রেগাস বলল, আগে খাও। খুবই মিষ্টি, সুস্বাদু ও রসালো। নাও, আমিও খাচ্ছি।

ফ্রেগাস খোসা থেকে একটি দানা ছিঁড়ে মুখে দিল। আফীরাও খেল। মুখে পুরে দাঁতে চাপ দিয়েই বলল, আরে খুব মিষ্টি তো! সুস্বাদু ও রসে ভরা!

ফ্রেগাস বলল, যদি তাজাতাজা খেতে পার গাছ থেকে ছিঁড়ে সঙ্গে-সঙ্গে, তাহলে আরও মজা লাগবে। ছিঁড়বে আর মুখে পুরে চাপ দেবে।

কোথায় আছে এই ফল?

বাগানে। গেলে দেখবে, থোকাগুলো কেমন ছড়িয়ে রয়েছে। ওখানে ফুলও আছে, ঝরনাও আছে। খুবই মনোরম জায়গা।

আফীরা বলল, ঠিক আছে যাব একদিন বাগানে।

একদিন কেন, কালই চলো দুপুরে।

কত দূরে বাগানটি?

এই তো কাছেই।

আচ্ছা, আমি তাঁর থেকে অনুমতি নেব।

ফ্রেগাস কয়েকটি ফুল দ্বারা কানফুল বানাল। একটি মুকুট তৈরি করল। এগুলো আফীরাকে পরিয়ে দিল। মুকুটটা তার মাথায় রাখল। ফুলের অলংকার আর মুকুট তার রূপ-সৌন্দর্যকে ঝকমকিয়ে দিল। আর এই তাজা ফুলগুলোর সৌরভ মহলটিকে সুরভিত করে তুলল। ফ্রেগাস বলল, ইস্, কেমন চমৎকার লাগছে এখন তোমাকে!

ফ্রেগাস রূপের মূর্তিটিকে টেনে আয়নার সম্মুখে নিয়ে গেল। আফীরা আয়নার মধ্যে নিজের প্রতিবিম্বটা দেখে নিজেও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। ঘটনাক্রমে এ-সময় সাফওয়ান এসে পড়ল। ফ্রেগাস অন্যত্র চলে গেল। সাফওয়ান বলল, ওহে ফুলের রানী, হেরাতের গভর্নরের সালাম গ্রহণ করো।

আফীরা চিত্তাকর্ষী দৃষ্টি তুলে সাফওয়ানের প্রতি তাকাল এবং খানিক হেসে বলল, একজন মুজাহিদের সালাম গ্রহণ করলাম।

সাফওয়ান বলল, আচ্ছা আফীরা, তুমি আমার আত্মনিয়ন্ত্রণের পরীক্ষা নিতে চাচ্ছ কেন?

আফীরা আড়চোখে তাকিয়ে বলল, কেমন?

সাফওয়ান ভয় পেল, পাছে আফীরা ক্ষেপে না যায়। বলল, আয়নার মধ্যে দেখলাম, তুমি কী যেন হয়ে গেছ।

আফীরা বলল, শুনেছি, দুর্গের অদূরে কতগুলো বাগান আছে। সেগুলোতে সুন্দর-সুন্দর ফুল আছে, মনোরম দৃশ্য আছে। কাল চলো বেড়িয়ে আসি।

সাফওয়ান বলল, গিয়ে যদি ওখানে কোনো বনমানুষের দেখা পেয়ে যাও, তাহলে?

আফীরা মুচকি হেসে বলল, একটুও ভয় পাব না। ওকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসব কিংবা মেরে ফেলব।

বোধহয় পাহাড়ের উপর যখন ওই দৃশ্যটি দেখেছিলে, তখন তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছিলে?

আফীরা মুরুব্বিয়ানা ভাব ধরে বলল, আমার হৃদয়ে মমতা জেগেছিল, তাই ছেড়ে দিয়েছি। বেচারা চলে গেল।

তুমি তাকে ছেড়ে দিয়েছ বটে; কিন্তু সে তো তোমাকে ছাড়বে না।

না ছাড়ুক, এখন বলো যাবে কি-না।

আমার যাওয়া সম্ভব হবে না। সৈনিকরা সামরিক মহড়া দেবে।

তাহলে আমি যাব?

কার সঙ্গে?

ফ্রেগাসের সঙ্গে।

যাও। সামরিক মহড়া দুর্গের বাইরের মাঠে হবে। তুমি যদি এসব অলংকার পরিধান করে আর এই মুকুট উড়িয়ে যাও, তাহলে যারা তোমাকে দেখবে, নির্ঘাত তাদেরকে পাগল বানিয়ে দেবে।

আবার সেই আয্‌রিমার্কা কথাবার্তা।

আমি নিশ্চিত, এই অবস্থায় তোমাকে দেখে আয্‌রি-অ-আয্‌রি সবাই দেওয়ানা হয়ে যাবে।

দুষ্টু কোথাকার! বলেই আফীরা তড়াক করে অন্য কক্ষে চলে গেল।

পরদিন দুপুরবেলা আফীরা মুখে নেকাব পরে ফ্রেগাসের সঙ্গে বাইরে বাগানে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। সে-সময় দুর্গের সামনের মাঠে সামরিক মহড়া চলছিল।

সূর্য পশ্চিমে হেলে যাওয়ার পর জামাসপ হন্তদন্ত হয়ে এসেই সাফওয়ানকে বলল, গভর্নর, আমি ফায়রোজানকে দেখেছি। আপনি রাতে বলেছিলেন, আপামণি বাগানে ভ্রমণে যাবে। যায়নি তো এখনও?

সাফওয়ান ঘাবড়ে গেল। বলল, না গেছে তো! অনেক সময় হয়ে গেছে! বলেই সাফওয়ান বাগানের দিকে ছুটে গেল। জামাসপও পেছনে-পেছনে গেল। সাফওয়ান বাগানে পৌঁছেই দেখতে পেল, ফ্রেগাস মাটিতে লুটিয়ে কাঁদছে। ফ্রেগাস সাফওয়ানের প্রতি তাকাল।

সাফওয়ান ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, আফীরা কোথায়? ফ্রেগাস ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, কয়েকজন মুখোশধারী লোক তাকে তুলে নিয়ে গেছে।

সাফওয়ান ভীষণ ব্যথা পেল। মনটা তার খা-খা করে উঠল। জিজ্ঞেস করল, কোন দিক গেছে ওরা?

ফ্রেগাস একদিকে ইঙ্গিত করে বলল, ওদিকে।

চৌত্রিশ.

আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) মারাদশাহজাহান অভিমুখে রওনা হয়েছেন। ইয়ায্‌দাজার্‌দ ও তার বাহিনীর তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি কয়েকজন গোয়েন্দা পাঠিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, অনারব সম্রাট মারাদশাহজাহানে তাদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হবেন। তাই তিনি নিশ্চিত ছিলেন, এখানেই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

কিন্তু একদিন এক গোয়েন্দা তাঁর কাছে এসে তথ্য জানাল, ইয়ায্‌দাজার্‌দ মারাদরোদ পালিয়ে গেছেন এবং মারাদশাহজাহানে দশ হাজার সৈন্য রেখে গেছেন। শুনে আহনাফ (রা.) খুবই অনুতপ্ত হলেন যে, ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর সঙ্গে মোকাবেলার সুযোগ মিলল না। তিনি বাহিনীর গতি বাড়িয়ে দিলেন এবং একদিন মারাদশাহজাহানের দুর্গের সম্মুখে পৌঁছে গেলেন।

ইরানিরা আগেই দুর্গবদ্ধ হয়ে ছিল। দুর্গটা বেশ প্রশস্ত ও মজবুত। আহনাফ (রা.) দুর্গের সম্মুখে খানিক দূরে ছাউনি ফেললেন।

পরদিন তিনি কয়েকজন অফিসারকে সঙ্গে করে রওনা হলেন এবং দুর্গের চারদিকে ঘুরতে শুরু করলেন। তিনি দেখতে চাচ্ছিলেন, কোন দিক থেকে আক্রমণ করা সহজ হবে। দুর্গের পাঁচিল অনেক উঁচু। তার উপর ইরানি সৈন্যরা ছড়িয়ে রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুটি ফটক আছে। উভয়টিই খুব উঁচু ও জাঁকালো। উভয় ফটকের উপর বড়-বড় নাকাড়া স্থাপন করা আছে। তা সম্ভবত এইজন্য যে, যদি মুসলমানরা কোনো দিক থেকে আক্রমণ চালায়, তাহলে নাকাড়া বাজিয়ে দুর্গে ঘোষণা করে দেওয়া হবে যে, আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে।

আহনাফ (রা.) ও তাঁর সঙ্গীরা দুর্গের চারদিক ঘুরে দেখলেন। সবদিকের পাঁচিল ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন। কিন্তু কোথাও এমন কোনো সুযোগ চোখে পড়ল না, যেপথে আক্রমণ করা সহজ হতে পারে। অগত্যা তিনি দুর্গ অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) মারাদশাহজাহানের দুর্গ অবরোধ করলেন। আশা পোষণ করলেন, অবরোধের শিকার হয়ে যখন খাদ্যসম্ভার শেষ হয়ে যাবে এবং ভেতরে অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে পড়বে, তখন ইরানিরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে।

কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিল, অবরোধ যদি দীর্ঘতা লাভ করে, তাহলে তার বাহিনী এত দিনের রসদ কোথায় পাবে। এখানে মুসলমানরা বিদেশী

মানুষ। আপন রাজ্য এখান থেকে বহু দূরে, সেখান থেকে রসদ আনা সম্ভব নয়। এ-ক্ষেত্রে তাদের নিয়ম ছিল, যখন যে-অঞ্চলে অবস্থান করত, তখন সেখান থেকেই রসদের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করত। অনেক সময় অধিক মুনাফার লোভে স্থানীয়রা তাদের কাছে খাদ্যসামগ্রী এনে বিক্রি করত। আবার মাঝে-মধ্যে নিজ সরকার ও সেনাবাহিনীর বাধা ও নিষেধাজ্ঞার কারণে আনতে পারত না। তখন মুসলমানদের সমস্যায় পড়তে হতো।

আরও একটি নিয়ম ছিল, কোনো অঞ্চল জয় হয়ে গেলে এবং সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে সমঝোতা হয়ে গেলে সেখান থেকে খাদ্যদ্রব্য উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে সংগ্রহ করত। কিন্তু জয়ের আগে আক্রান্ত এলাকার নাগরিকদের থেকে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করত জোরপূর্বক।

এখনও মুসলমানদের রসদের প্রয়োজন দেখা দিল। অবরোধ সম্পন্ন করে আহনাফ ইবনে কায়েস একশো সৈনিকের তিন-চারটি ইউনিট তৈরি করে রসদ সংগ্রহের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। এরা সন্ধ্যার সময় ফিরে এল। সঙ্গে করে খাদ্যদ্রব্য বোঝাই কয়েকটি উট-খচ্চর এবং অনেকগুলো ভেড়া-বকরি নিয়ে এল। রসদ পেয়ে মুসলিম বাহিনী চিন্তামুক্ত হয়ে গেল।

দুর্গ অবরোধের বয়স বারো দিন হয়ে গেছে। কিন্তু দুর্গের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে অধৈর্যের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেল না। না তারা দুর্গ থেকে বেরিয়ে মোকাবেলার সাহস দেখাল, না অবরোধে অতিষ্ঠ হয়ে কোনো প্রস্তাব পাঠাল। সেনাপতি আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) আর বিলম্ব করা সমীচীন মনে করলেন না। তাই একদিন তিনি বাহিনীতে ঘোষণা করিয়ে দিলেন, আগামী কাল দুর্গ আক্রমণ হবে।

সে-যুগের মুসলমানরা জিহাদকে এত প্রিয় আমল মনে করত যে, কদিন যুদ্ধ ছাড়া কাটাতে হলে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। তাই এই যে-কটা দিন তারা দুর্গ অবরোধ করে বসে-বসে কাটাল, তা তাদের মনে বিরক্তির উদ্রেক করে দিল। এখন আক্রমণের ঘোষণায় সবাই সজীব ও চাঙ্গা হয়ে ওঠল। তারা খুশীমনে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিল। রাত জেগে অস্ত্রে ধার দিতে থাকল।

পরদিন ফজর নামাযের পর কমান্ডারগণ ঝটপট অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সৈনিকদের কাছে চলে গেল এবং তাদেরকে সারিবদ্ধ করতে শুরু করল। অল্পক্ষণের মধ্যে সেনাপতি আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) তাঁর নিজস্ব ইউনিটটি নিয়ে এসে পড়লেন। তিনি সম্মুখ বাহিনীকে অগ্রসর হতে ইঙ্গিত

করলেন। অগ্রবাহিনীর কমান্ডার হারিছা ইবনে নুমান। অত্যন্ত চৌকস, অভিজ্ঞ ও উজ্জীবিত মুজাহিদ। তিনি আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে সম্মুখে অগ্রসর হলেন। তার সহযোদ্ধারাও উচ্চৈঃস্বরে তাকবীরধ্বনি তুলল এবং বীরদর্পে এগোতে শুরু করল। অগ্রবাহিনীর ডান বাহুর দায়িত্বে আছেন আলকামা ইবনুন-নায্‌রি আর বাম বাহুর মুগ্‌নী ইবনে আমের আত-তামীমি। তাঁরা আপন-আপন ইউনিট নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। এই ইউনিটগুলো অগ্রবাহিনীর সঙ্গে-সঙ্গে তার সাহায্যে রওনা হয়ে গেল, যাতে যদি দুর্গের পাঁচিলের উপর থেকে তিরন্দাজি কিংবা প্রস্তর নিক্ষেপ শুরু হয়, তাহলে তারা তির ছুঁড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করতে চেষ্টা করবে।

অগ্রবাহিনী রওনা হতেই আরেকটি ইউনিট তাদের পেছনে-পেছনে এগোতে শুরু করল। অর্ধেক সৈন্য এগিয়ে গেলে আহনাফ (রা.) তার ইউনিটটি নিয়ে রওনা হলেন। তাঁর পেছনে অবশিষ্ট সৈন্য রওনা হলো।

অগ্রবাহিনীটি যখন দুর্গের সন্নিকটে পৌঁছে গেল, তখন হঠাৎ একযোগে সবগুলো নাকাড়া বেজে ওঠল। সেগুলোর ভয়ংকর শব্দ ঘোষণা করে দিল, মুসলমানরা দুর্গ আক্রমণ করেছে। সঙ্গে-সঙ্গে ইরানি সৈন্যরা এমন হট্টগোল শুরু করে দিল যে, সমস্ত দুর্গ ও দুর্গের সম্মুখস্থ ময়দান কেঁপে ওঠল।

মুসলমানরা চুপচাপ অগ্রসর হচ্ছিল। তারা যখন আরও কয়েক পা অগ্রসর হলো, তখন ইরানি সৈন্যরা মিনজানিকে ধারালো পাথরের টুকরো ভরে নিক্ষেপ করতে শুরু করল। তাতে মুসলমানরা বুঝে ফেলল, ইরানিরা তির-বর্শাও নিক্ষেপ করতে পারে। তাই তারা সতর্ক হয়ে গেল। তারা যার-যার ঢালের পেছনে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল।

কিন্তু পাথর এত জোরে এসে নিক্ষিপ্ত হলো যে, কোনো-কোনো মুজাহিদের হাত থেকে ঢাল ছুটে পড়ে গেল। অনেকে পাথরের আঘাতে আহত হলো।

ইরানিরা যেইমাত্র প্রথম আক্রমণ করল, অমনি অগ্রবাহিনীর উভয় বাহুর সৈনিকরা তির ছুঁড়তে শুরু করল। আবরদের তির হালকা ও ছোট। কিন্তু মুসলমানরা এত জোরে নিক্ষেপ করল যে, কিছু তির পাঁচিলের গায়ে গিয়ে গেঁথে গেল আর কতিপয় পাঁচিলের উপরে ওঠে সৈনিকদের কপাল, চোখ, গলা ও বুকে বিদ্ধ হলো। আক্রান্তদের কয়েকজন পেছনের দিকে উলটে পড়ে গেল। কয়েকজন আমার চোখ গেল, আমার চোখ গেল বলে চিৎকার দিয়ে সামনের দিকে গড়িয়ে পড়ল এবং ছটফট করতে লাগল।

এই অবস্থার মধ্যে ইরানিরা পুনরায় পাথর নিক্ষেপ করল। এবার মুসলমানরা এসে ঢাল দ্বারা পাথর প্রতিহত করল। এবারকার আক্রমণে কোনো মুসলমান আহত হয়নি। জবাবে মুসলিম সৈন্যরা দ্বিতীয়বারের মতো তির ছুঁড়ল। তাতে ইরানি সৈন্যদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হলো।

ইরানি বাহিনীর কমান্ডাররা দেখল, মুসলমানদের তির তাদের সৈন্যদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করছে; কিন্তু তাদের পাথর মুসলমানদের কোনোই ক্ষতি করতে পারছে না।

তাদের মনে খুব রাগ এল। তারা তাদের তিরন্দাজদের ইঙ্গিত দিল। তারা দ্রুততার সঙ্গে ধনুক হাতে নিল এবং তূনীর থেকে তির বের করে তাতে সংযোজন করল।

এখনও তারা ধনুকের জ্যা টানতে পারেনি, ইতিমধ্যে মুসলমানরা তৃতীয়বারের মতো তিরবৃষ্টি বর্ষণ করল। বিপুলসংখ্যক তির ইরানি তিরন্দাজদের আহত করে দিল। তাতে তাদের মাঝে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল। তারা একসঙ্গে সবাই তির ছুঁড়তে সক্ষম হলো না। খুবই স্বল্পসংখ্যক তির তাদের ধনুক থেকে বের হলো। তথাপি তাড়াহুড়া করে ও আতঙ্কের মধ্যে ছোঁড়ার কারণে তির বায়ু ভেদ করে মুসলমানদের কাছে পৌঁছুতে সক্ষম হয়নি– মাঝপথেই রয়ে গেছে।

ইরানি বাহিনীর কমান্ডাররা তাদের সৈনিকদের উৎসাহিত ও উত্তেজিত করার চেষ্টা করল এবং পূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে তির ছুঁড়তে নির্দেশ দিল। ফলে ইরানি সৈন্যরা ঝটপট পুনরায় ধনুকে তির সংযোজন করল। কিন্তু তারা তির ছুঁড়বার আগে-আগে মুসলমানদের তির এবারও তাদের কাবু করে ফেলল। তারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল এবং তির ছোঁড়ার কথা ভুলে গেল।

এবার মুসলমানরা সুযোগ পেয়ে গেল। এতক্ষণ তারা বসে-বসে যুদ্ধ করছিল। এখন একদম দাঁড়িয়ে গেল এবং দ্রুতগতিতে দুর্গের দিকে ছুটে গেল। ইরানিরা দেখল যে, মুসলিম সৈন্যরা দুর্গের দিকে ধেয়ে আসছে। কিন্তু তাদের প্রতিহত করার সাহস পেল না।

কারণ, তারা দেখছিল, অগ্রবাহিনীর সহযোগী ইউনিটটিও তাদের সাহায্যে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। কমান্ডাররা সৈনিকদের উৎসাহ দিল। সৈনিকরা ধনুক সামনে নিয়ে দ্রুত তির ছুঁড়ল। কিন্তু ততক্ষণে মুসলমানরা তিরের আওতা থেকে বেরিয়ে পাঁচিলের নিচে পৌঁছে গেছে। এই অবস্থা দেখে ইরানি সৈন্যরা ঘাবড়ে গেল।

পঁয়ত্রিশ.

ইরানিরা পরিকল্পনা আঁটল, যেসব মুসলমান পাঁচিলের নিচে এসে পড়েছে, উপর থেকে তাদের গায়ে ভারী পাথর গড়িয়ে দেবে। কিন্তু তা সম্ভব হলো না। কারণ, মুসলমানদের অগ্রবাহিনীটি যে-জায়গায় বসে ঢালের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, সেখানে আরও দুটি ইউনিট এসে জমে গেছে। তাছাড়া তাদের উভয় বাহুতে আরও কয়েকটি সেনা-ইউনিট এসে যোগ দিয়েছে। সবাই ধনুকে তির সংযোজন করে দাঁড়িয়ে আছে।

ইরানি সৈন্যরা পাঁচিলের কিনারায় এসে ঝুঁকে মুসলমানদের অবলোকন করবে, তাও সম্ভব হচ্ছে না।

পাঁচিলের নিচে পৌঁছে যাওয়া মুজাহিদরা উপর দিকে রশি ছুঁড়ে পাঁচিলের আংটার সঙ্গে আটকে দিল। কয়েকজন আপন-আপন তরবারি দাঁতে চেপে ধরে রশি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল। পাঁচিল থেকে দূরে দাঁড়িয়ে যেসব মুসলমান তির ছুঁড়ছিল, তারা তিরন্দাজি বন্ধ করে দিল। কারণ, আশঙ্কা দেখা দিয়েছে এই তির তাদেরই সঙ্গীদের গায়ে বিদ্ধ হতে পারে।

ইরানিরা অনবরত তির ছুঁড়ছে। সেই তিরের আঘাতে মুসলমানরা আহত হচ্ছে। কিন্তু এর জবাবে তাদের কিছুই করবার নেই।

যখন কয়েকজন মুসলমান পাঁচিলের ছাদের কাছাকাছি পৌঁছে গেল, তখন পাঁচিল থেকে দূরে অবস্থানরত মুসলমানরা একযোগে তাকবীরধ্বনি দিয়ে ওঠল। শুনে ইরানিরা ভাবনায় পড়ে গেল, এখন মুসলমানরা কী করবে। তারা গভীর চোখে সম্মুখের মুসলমানদের প্রতি তাকাতে লাগল। হতভম্বের মতো হয়ে তারা তির-পাথরের বর্ষণ বন্ধ করে দিল।

যেসব মুসলমান উপরে আরোহণ করছিল, তারা মওকা পেয়ে গেল। তারা ঝটপট পাঁচিলের উপর পা রেখেই সম্মিলিত কণ্ঠে তাকবীরধ্বনি দিল। তাদের দেখে ইরানিরা থ বনে গেল। তারা তরবারি উঁচু করে ইরানিদের উপর আক্রমণ চালিয়ে দিল এবং প্রথম আক্রমণেই কয়েকজন সৈনিককে হত্যা করে ফেলল।

ইরানিরা তরবারি হাতে নিল এবং জবাবি আক্রমণ শুরু করে দিল। দুর্গের পাঁচিলের উপর দুই পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। নিচ থেকে মুসলমানরা তরতর করে রশি বেয়ে-বেয়ে পাঁচিলের উপর উঠতে লাগল। পাঁচিলে পৌঁছেই তারা তরবারি উঁচিয়ে ইরানিদের আক্রমণ চালাতে, শুরু করল যাতে তারা পেছনে সরে যেতে বাধ্য হয়।

কিন্তু পাঁচিলের উপর ইরানিদের সংখ্যা ছিল অনেক। তারা অতিশয় উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে এগিয়ে-এগিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে। তাতে কিছু-কিছু মুসলমান আহতও হচ্ছে। তাতে মুসলমানরা ততোধিক উদ্দীপ্ত হয়ে তীব্র আক্রমণ চালাচ্ছে এবং এক-এক আক্রমণে এক-একজন মুসলমান দু-চারজন ইরানিকে হতাহত করছে।

পাঁচিলের উপর ইরানিদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, তারা যদি এতটুকু বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারত, তাহলে অতি অনায়াসে মুসলমানদের কাবু করে ফেলতে পারত। সুযোগ ছিল, যেসব মুসলমান পাঁচিলের উপর উঠে গিয়েছিল, তাদেরকে ঘিরে ফেলে একটি ইউনিট পাঁচিলের কিনারায় আক্রমণ জমিয়ে তুলত এবং এরাই পাঁচিলের উপর মুসলমানদের আরোহণ প্রতিহত করে দিত। কিন্তু যুদ্ধের সময় ভালো-ভালো অভিজ্ঞ সিপাহসালারও বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেন। তাদের মেধা অকেজো হয়ে যায়। ফলে জয়মাল্যের বদলে পরাজয়ের গ্লানি বরণ করে নেয়।

ইরানি অফিসার ও সেনাপতির মাথায় এই বুদ্ধিটা খেলল না। মুসলমানদের আগমন ও আরোহণ অব্যাহত থাকল। এমনকি অগ্রবাহিনীর সব কজন সৈন্য পাঁচিলের উপর উঠে গেল। এবার অগ্রবাহিনীর সহযোগী ইউনিটটি উপরে উঠতে শুরু করেছে। যেসব মুসলমান দুর্গ থেকে দূরে থেমে রয়েছিল, তারা যখন দেখল, বাইরে ইরানিদের তিরন্দাজি ও পাথরবৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে, তখন তারা দুর্গের দিকে এগিয়ে এল। এবার গোটা ইসলামি বাহিনী সাগরের উত্তাল ঢেউয়ের মতো এগোতে লাগল।

অগ্রবাহিনী দুর্গের পাঁচিলে উঠে প্রবল বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে দ্রুত ইরানি সৈন্যদের নির্মূল অভিযান শুরু করে দিল। তাদের পিপাসাকাতর তরবারিগুলো হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠল। রক্তের বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

ইরানিরাও জোরদার আক্রমণ করে মুসলমানদের হতাহত করতে লাগল। যুদ্ধ ঘোরতর রূপ লাভ করল। উভয় পক্ষেরই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে লাগল। তরবারিগুলো প্রবল উদ্দীপনার সঙ্গে পরিচালিত হতে লাগল। লাশের-উপর-লাশ পড়তে লাগল। পাঁচিলের উপর এত পরিমাণ রক্ত ঝরল যে, পাঁচিলের সমতল পিচ্ছিল হয়ে গেল। উভয়পক্ষের সৈনিকরা পা পিছলে পড়ে যেতে লাগল। যে-ই পড়ছে, সে আর উঠতে পারছে না। কারও-না-কারও তলোয়ারের কোপে সে হত হয়ে যাচ্ছে কিংবা আহত হয়ে ছটফট করতে শুরু করছে।

অগ্রবাহিনীর কমান্ডার হারিছা ইবনে নুমান। তাঁর বাহিনীও পাঁচিলের উপর পৌঁছে গেছে। এতক্ষণ তিনি কয়েকজন মুজাহিদ নিয়ে দুর্গের ফটক ভাঙ্গার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ফটক এত মজবুত যে, দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর এতটুকু নাড়াতেও সক্ষম হলেন না। তাই বাধ্য হয়ে পাঁচিলে উঠে এসেছেন। উঠেই তিনি এমন জোরদার আক্রমণ চালালেন যে, যে-ইরানি সেনাই তাঁর আয়ত্ত্বে এল, তাকে তিনি হত্যা করে ফেললেন। তাঁর তরবারি মৃত্যুর ফেরেশতা হয়ে গেছে। তাতে যে-ই আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে, সে-ই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, একজন ইরানিও জীবিত থাকা পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হবেন না।

মুজাহিদগণ যখন তাদের কমান্ডারকে এ-ধারায় যুদ্ধ করতে দেখল, তখন তারাও অধিকতর উজ্জীবিত হয়ে ওঠল। তারাও জোরদার হামলা চালাল। তাদের এই আক্রমণ খুবই কঠিন প্রমাণিত হলো। ইরানিদেরকে এভাবে হত্যা করল, যেভাবে কৃষক খেতের ফসল কর্তন করে। লাশের-উপর-লাশ ফেলল। রক্ত পানিপ্রবাহের মতো বইতে লাগল।

বেদম মার খেয়ে ইরানিরা পেছনে সরে গিয়ে দুর্গের আঙিনায় নেমে গেল। মুসলমানরাও তাদের মারতে-কাটতে ধাওয়া করে তাদের পেছনে-পেছনে এগিয়ে গেল। তারাও বারান্দায় নেমে পড়ল। দুর্গের সম্মুখ চত্বরে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। লাশ পড়তে শুরু করল। রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল।

কয়েকজন মুসলমান ইরানিদের হতাহত করতে-করতে ফটকের দিকে এগিয়ে গেল। ইরানিরা পায়ে-পায়ে মোকাবেলা করা সত্ত্বেও তারা ফটকের সম্মুখে পৌঁছে গেল। তারা ভেতর থেকে ফটক খুলে দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে ইসলামি বাহিনী স্রোতের মতো দুর্গে ঢুকতে শুরু করল। তারা এমন হত্যাযজ্ঞ শুরু করল যে, মুহূর্তমধ্যে অগ্নিপূজক ইরানি সৈন্যদের লাশ দ্বারা চত্বর ভরে ফেলল। ইরানিদের মনে ভয় ধরে গেল। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অস্ত্রসমর্পণ করল। মুসলমানরা তাদের গ্রেফতার করতে শুরু করল। দুর্গের অধিবাসীরা ভয়ে কাঁপতে শুরু করল। পুরুষদের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মহিলাদের গায়ের রক্ত শুকিয়ে গেল।

মারাদশাহজাহানের উপর মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। সাধারণ নাগরিকরা জিযিয়ার প্রস্তাব পেশ করল।

আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) পুরো বাহিনী নিয়ে বাইরে অবস্থান গ্রহণ করলেন। শহীদদের জড়ো করে জানাযার নামায আদায় করলেন। একটি

ইউনিট মালে-গনীমত সংগ্রহ করল। মারাদশাহজাহান থেকে বিপুল সম্পদ হস্তগত হলো। যেসব মুজাহিদ আহত হয়েছিল, তাদের ব্যান্ডেজ-চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলো।

পরদিন থেকেই জিযিয়া আদায় শুরু হয়ে গেল। মারাদশাহজাহানের অধিবাসীদের মনে আশঙ্কা ছিল, তাদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করা হবে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাদের মহিলাদেরকে গ্রেফতার করা হবে এবং তাদের সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকে নিঃস্ব বানিয় দেওয়া হবে। কিন্তু তেমনটি হলো না। মুসলমানরা না কোনো সাধারণ নাগরিককে গ্রেফতার করল, না কারও সঙ্গে কঠোর আচরণ করল। বরং এমন কোমল আচরণ করল যে, ইরানিরা তা কল্পনাও করেনি। বিজয়ী মুসলমানদের আচরণে ইরানিরা অত্যন্ত খুশি হলো। তাদের সওদাগররা ইসলামি বাহিনীতে বাজার বসাল এবং প্রয়োজনীয় সকল পণ্যের পসরা সাজাল। মুসলমানরা কেনাকাটা শুরু করে দিল। এই ক্রয়-বিক্রয়ে ইরানি সওদাগররা বেশ লাভবান হলো।

আহনাফ ইবনে কায়েস কয়েক দিন মারাদশাহজাহানে অবস্থান করলেন। যখন জিযিয়া উসুল হয়ে গেল এবং পল্লী অঞ্চলগুলোতেও শান্তি প্রতষ্ঠিত হয়ে গেল, তখন তিনি বাহিনীকে রওনা হতে আদেশ দিলেন। রওনা হওয়ার আগে তিনি মালে-গনীমত থেকে এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করে অবশিষ্ট চার ভাগ সকল মুজাহিদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। প্রত্যেক মুজাহিদ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গনীমত পেল।

সেনাপতি আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) হারিছা ইবনে নুমানকে মারাদশাহজাহানের গভর্নর নিযুক্ত করলেন। তারপর বাহিনী নিয়ে মারাদরোদ অভিমুখে রওনা হলেন।

ছত্রিশ.

সাফওয়ান ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল। অল্পক্ষণ পর জামাসপ দ্রুতপায়ে বাগানে এল। দেখল, ফ্রেগাস বাগানের সবুজ ঘাসের উপর লুটিয়ে কাঁদছে আর মাটিতে মাথা ঠুকছে। জামাসপ তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ত্রস্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, আপামণি কোথায়?

ফ্রেগাস উত্তর দিল, কয়েকজন মুখোশধারী তাকে তুলে নিয়ে গেছে।

কারা তারা?

আমি জানি না।

এটা হতে পারে না। তুমি অবশ্যই জান। তাদের মধ্যে ফায়রোজানও ছিল।

জামাসপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফ্রেগাসের প্রতি তাকাল। মেয়েটিকে খানিক লজ্জিত মনে হলো। তার চোখ দুটো অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। তাই তৎক্ষণাৎ কোনো উত্তর দিতে পারল না। জামাসপ জিজ্ঞেস করল, কবে দেখা হয়েছিল তোমার ফায়রোজানের সঙ্গে?

ফ্রেগাসের মনে হলো, জামাসপ তার ও ফায়রোজানের সাক্ষাত বিষয়ে অবহিত। তাই অস্বীকার না করে উত্তর দিল, আমি তাকে গত কাল দেখেছিলাম।

আর তারই পরামর্শে তুমি আপামণিকে প্ররোচিত করে এখানে নিয়ে এসেছিলে!

ফ্রেগাস ভালো করে জানত, যদি সে স্বীকার করে নেয়, তা হলে এই অপরাধে তাকে হত্যা করা হবে। যদি জীবনে রক্ষা পেয়েও যায়, সাফওয়ানের ঘৃণ্য পাত্রীতে পরিণত হবে তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই। আর তখন তার সেই স্বপ্ন ধুলোয় মিশে যাবে, যার জন্য আফীরাকে ফায়রোজানের হাতে তুলে দিয়েছে। তাই বলল, এ একদম ভুল কথা। এ-ব্যাপারে সে আমাকে কিছুই বলেনি আর আফীরাকে এখানে নিয়ে আসতে আমাকে কোনো উৎসাহও দেয়নি।

তাহলে কেন এনেছিলে তাকে?

তিনি ফুল খুব ভালবাসতেন। একদিন আমি তার জন্য কয়েকটি ফুল নিয়েছিলাম। ফুলগুলো তার খুব ভালো লাগল। আমাকে খুব পীড়াপীড়ি করলেন, যেন একদিন তাকে বাগানে নিয়ে আসি। আমি রাজি হলাম এবং আজ তাকে এখানে নিয়ে এলাম। আমরা এসে পৌঁছুবার অল্পক্ষণ পর কয়েকজন মুখোশধারী এসে তাকে তুলে নিয়ে গেল। আমি তাকে ঝাপটে ধরেছিলাম। কিন্তু মুখোশধারীরা আমাকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে তাকে নিয়ে চলে গেল।

কতজন ছিল তারা?

আট-দশজন হবে।

আপামণি কি নিজেকে ছাড়ানোর কোনো চেষ্টা করেনি?

খুব চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাকে অসহায় করে তোলা হয়েছিল।

জামাসপ কিছু ভাবতে লাগল। বলল, গভর্নর কোথায় গেছেন?

মুখোশধারীদের ধাওয়া করতে ছুটে গেছেন।

ফ্রেগাস বাগান থেকে দ্রুত ফিরে এল এবং হন্তদন্ত পায়ে পেরেড ময়দানে পৌঁছে গেল। তখনও সৈন্যরা মহড়া দিচ্ছিল। ফ্রেগাস কমান্ডারকে বলল, মুখোশধারীরা আফীরাকে তুলে নিয়ে গেছে।

সংবাদটা সঙ্গে-সঙ্গে আমেরকে জানানো হলো।

আমের সহসা চকিত হয়ে ফ্রেগাসের প্রতি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কারা হতে পারে ওরা?

আমি জানি না।

জামাসপ কোথায়?

তিনি বাগানে এসেছিলেন। আমাকে ঘটনা জিজ্ঞেস করে চলে গেছেন।

আমের স্বগতোক্তির মতো করে বললেন, জামাসপ লোকটা ষড়যন্ত্র করেনি তো।

ফ্রেগাসের চোখ দুটো চিকচিক করে ওঠল। আমেরের এই সংশয় তার মস্তিষ্কে নতুন এক ভাবনা জাগিয়ে তুলল। বলল, আমি তাকে এমনটা মনে করি না।

আমিও এমন মনে করি না। মানুষটা বিশ্বাসযোগ্য। আচ্ছা, সাফওয়ান কোথায়?

সম্ভবত তিনি মুখোশধারীদের ধাওয়া করতে গেছেন।

ও কি একা গেছে?

আমি তাকে একটা ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখেছি।

এটা খুবই খারাপ হলো। মেয়েটা আমার জীবনের একমাত্র সহায় ছিল। যে-ই এই ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকুক, আমি কিছুতেই তাকে ক্ষমা করব না।

তারপর আমের আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন। মেয়েটি ইজ্জত ও জীবন রক্ষা করে তার কাছে ফিরিয়ে দিতে কাকুতি জানালেন। শক্তি ও সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

আমের তৎক্ষণাৎ কয়েকজন সেনা-অফিসারকে ডেকে পাঠালেন। তারা এলে তিনি ঘটনা অবহিত করে আদেশ দিলেন, সাফওয়ান আফীরাকে উদ্ধার করতে রওনা হয়ে গেছে। তোমরা এক্ষুনি তার সাহায্যে রওনা হয়ে যাও।

কয়েকজন অফিসার পঞ্চাশজন সৈনিকের একটি ইউনিট নিয়ে বিভিন্ন পথে ছুটে গেল। আমের এতটা ব্যথিত হলেন যে, তাঁর চেহারায় চিন্তা ও অস্থিরতার লক্ষণ ফুটে ওঠেছে। তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। তাই বসে পড়লেন আর যারা অপহরণকারীদের পশ্চাদ্ধাবনে রওনা হয়ে গেছে, তাদের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে লাগলেন।

সময় অতিবাহিত হতে থাকল। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নামল। সূর্যাস্তের খানিক আগ থেকে সৈন্যরা ফিরে আসতে শুরু করল। সবাই ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছিল। সাফওয়ান ও জামাসপও ফিরে এল। তাদের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। দুজনই আফীরার অপহরণ ঘটনায় যারপরনাই ব্যথিত ও মর্মাহত হয়ে পড়েছে।

সবাই মাগরিবের নামায আদায় করল। নামাযের পর সাফওয়ান তার প্রচেষ্টার কারগুজারি শোনাল। এ-সময় জামাসপ এসে বলল, আমি ফ্রেগাসের চোখে উঁকি দিয়ে দেখিছি। মেয়েটা ষড়যন্ত্রে জড়িত, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

জামাসপ ও ফ্রেগাসের মধ্যে যা কিছু কথাবার্তা হয়েছে, জামাসপ সব শোনাল। প্রশ্ন করার সময় মেয়েটির যে-অবস্থা ধরা খেয়েছিল, তাও ব্যক্ত করল।

আমের বললেন, আমি কারও উপর অমূলক সন্দেহ করতে চাই না। আল্লাহই ভালো জানেন।

সাফওয়ান বলল, আমি আফীরার সন্ধানে ভোরেই রওনা হয়ে যাব। আপনার অনুমতি নিতে এসেছি।

আমের বললেন, আমার পক্ষ থেকে অনুমতি আছে। সুস্থ থাকলে আমিও তোমার সঙ্গে যেতাম।

জামাসপ বলল, আমাকেও অনুমতি দিন। আমি একে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

আমের সাফওয়ানের দিক তাকালেন। সাফওয়ান বলল, তার প্রতি আমার আস্থা আছে। সে সঙ্গে থাকলে আমার অনেক উপকারও হবে।

আমের বললেন, ঠিক আছে, নিয়ে যাও।

সাফওয়ান ও জামাসপ রাতে প্রস্তুতি নিয়ে রাখল। সাফওয়ান ফজর নামায পড়েই ঘোড়ায় চড়ে দুজন রওনা হয়ে গেল।

সাঁইত্রিশ.

ইয়ায্দাজার্দ মারাদরোদ পৌঁছে গেছেন। মারাদরোদের নগরী আলাদা আর দুর্গ আলাদা। নগরীর চতুর্দিকে নগর নিরাপত্তাপ্রাচীর দ্বারা ঘেরা। চারদিকে আলিশান ফটক।

দুর্গের অবস্থান নগরী থেকে এক মাইল দূরে। অত্যন্ত মজবুত ও বিস্তৃত। প্রাচীরও অতিশয় উঁচু ও দুর্ভেদ্য। চারদিকে চারটি মজবুত ফটক। প্রতিটি ফটকের উভয়দিকে দুটি করে বুরুজ (পর্যবেক্ষণ টাওয়ার)। বুরুজগুলো

ফটক থেকে এগিয়ে স্থাপিত। এসব বুরুজের মাধ্যমে ফটকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

নগরী ও দুর্গের মধ্যকার ফাঁকা জায়গাটিতে নগরীর কাছাকাছি স্থানে কয়েকটি বাগান। বাকি জায়গা উন্মুক্ত মাঠ। অবশিষ্ট তিন দিকেও খোলা ময়দান।

দুর্গটির অবস্থান একটি পর্বতশৃঙ্গের উপর। সেজন্য দুর্গটি অনেক উঁচু। পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত না হলে দুর্গটি অনেক দূর থেকে দেখা যেত। দুর্গের সামান্য দূর থেকেই পর্বতশ্রেণীর ধারা শুরু হয়ে গেছে।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ দুর্গে অবস্থান করছেন। এখানে পৌঁছেই তিনি মারাদরোদের সম্পদের পরিসংখ্যান গ্রহণ করছেন। বিপুল সম্পদের তথ্য পাওয়া গেল। তিনি সমস্ত সম্পদ কব্জা করে নিলেন। মারাদরোদের গভর্নর বিষয়টি ভালো চোখে দেখলেন না। কিন্তু সে ইরান সম্রাটের অধীন বটে। তা ছাড়া শাহেনশাহ খুব রাগী ও প্রতিশোধপরায়ণ মানুষ, তা তার জানা ছিল। মতের বিপক্ষে টু-শব্দটি করলে হত্যা করতেও তার বাধবে না। ফলে গভর্নর কোনো বাদ-প্রতিবাদ না করে চুপ করে রইল।

ইয়াযদাজার্‌দ মারাদরোদের কোষাগার থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ হস্তগত করলেন। এই সম্পদের একটি অংশ তিনি নতুন সেনা সংগ্রহের কাজে ব্যয় করতে শুরু করলেন। তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালানোর জন্য লোক নিযুক্ত করলেন। তারা মারাদরোদ থেকে বলখ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। তাদের শিখিয়ে দিলেন, তোমরা মুসলমানদের নানা দোষের কথা প্রচার করবে। নির্যাতন-অত্যাচারের কল্পিত কাহিনী মানুষকে শোনাবে আর বলবে, মুসলমানরা পবিত্র অগ্নির খুব অমর্যাদা করছে, শত-শত কুণ্ডের আগুন নিভিয়ে দিয়েছে এবং কুণ্ডগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে। অথচ মুসলমানরা না কোথাও কোনো অগ্নিকুণ্ড ধ্বংস করেছে, না কোনো কুণ্ডের আগুন নির্বাপিত করেছে।

এই মিথ্যা প্রচারণা এজন্য চালানো হলো, যাতে অগ্নিপূজকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠে এবং নিজেদের ধর্ম ও অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়।

ইরানিরা ছিল অগ্নিপূজক। সমগ্র ইরানে অগ্নিপূজা চলত। মানুষ অত্যন্ত ভক্তিসহকারে আগুনের পূজা করত। এর জন্য তারা স্থানে-স্থানে আগুনের কুণ্ড তৈরি করে নিয়েছিল। এসব কুণ্ডের আগুন তারা কখনও নিভতে দিত না। যে-কুণ্ড যতদিন অক্ষত থাকত, ততদিন তার আগুনও প্রজ্জ্বলমান

থাকত। কোনো-কোনো কুণ্ডের বয়স কয়েকশো বছর অতিক্রম করেছিল। এই দীর্ঘ সময়ে এক মুহূর্তের জন্যও আগুন নির্বাপিত হয়নি।

ইয়াযদাজারদও মাদায়েনের বিখ্যাত অগ্নিকুণ্ডের আগুন সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন। ভোগ-বিলাসিতা ও আনন্দ-ফুর্তির ফাঁকে-ফাঁকে যখন ফুরসত পেতেন এবং মুসলমানদের ভয় বেড়ে যেত, তখন তিনি ও তার সকল সহচর সেই আগুনের পূজা করতেন এবং প্রার্থনা করতেন, যেন পবিত্র আগুন মুসলমানদেরকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। কিন্তু তা না করে যদি তারা যে-মহান সত্ত্বা আগুন সৃষ্টি করেছেন, তার দাসত্ব ও উপাসনা করত, তাহলে তাদের বেদুইন আবরদের হাতে তাদের এই প্রতাপশালী সাম্রাজ্যের পতন ঘটত না।

আল্লাহপাক ইরানিদেরকে সম্পদ দান করেছিলেন, সম্মান দান করেছিলেন এবং ক্ষমতা দান করেছিলেন এই জন্য যে, তারা তাঁর পরিচয় জানবে এবং তাঁর সামনে মাথানত করবে। কিন্তু অজ্ঞতাবশত তারা আগুনের পূজা শুরু করে দিয়েছিল। ফলে আল্লাহ তাদের উপর রুষ্ট হলেন। তাদের থেকে তিনি সবগুলো নেয়ামত এক-এক করে ফিরিয়ে নিলেন।

ইয়াযদাজারদ-এর মুসলমানবিরোধী অপপ্রচারের ফল ফলতে শুরু করল। প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে ইরানিরা ক্ষেপে ওঠল। মুসলমানদেরকে চরম একটা শিক্ষা দেওয়ার অভিলাষে তারা দলে-দলে ফৌজে ভর্তি হতে শুরু করল। অল্প কদিনে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী তৈরি হয়ে গেল।

কিন্তু ইয়াযদাজারদ ভালোমতোই জানতেন যে, মুসলমানদের মোকাবেলায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের বাহিনী যথেষ্ট নয়। ইতিপূর্বে তিনি দুই-দু-লাখ সৈন্যের বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু এই বিশাল বাহিনীও মুসলমানদের হাতে শোচনীয়রূপে পরাজয়বরণ করে এসেছে। তাই এখন চাচ্ছেন, শেষবারের মতো ভাগ্য পরীক্ষার জন্য লাখতিনেক সৈন্যের একটি বাহিনী তৈরি হয়ে যাক।

কিন্তু এত বিশাল একটি বাহিনী প্রস্তুত করা সহজ ব্যাপার নয়। ইরানের অধিকাংশ অঞ্চলে মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আর যে-অঞ্চলেই মুসলমানদের শাসন চালু হয়েছে, সেখানকার জনসাধারণ ইসলামি সরকারের জীবনবান্ধব আইন ও মুসলমানদের কোমল আচরণে ইসলামের অনুরক্ত হয়ে গেছে। ইয়াযদাজারদ ফিরে আসুক, তা তাদের কারুরই কাম্য নয়।

খোরাসানের কিছু অংশ ইয়াযদাজারদ-এর হাতে রয়ে গিয়েছিল। এই সামান্য অঞ্চল থেকে এত সৈন্যের সমাবেশ ঘটানো নিশ্চিত অসম্ভব ছিল। তিনি ও তার উপদেষ্টারা মিলে অনেক চেষ্টা করে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সংখ্যা আর বাড়ানোর কোনোই সুযোগ নেই।

অগত্যা মোসাহেব ও উপদেষ্টারা ইয়াযদাজারদকে পরামর্শ দিল, আপনি তুর্কিস্তানের বাদশাহ খাকান ও অপরাপর বাদশাহদের কাছে সাহায্য চেয়ে আবেদন প্রেরণ করুন।

ইয়াযদাজারদ একজন প্রতাপশালী ও বিপুল ক্ষমতাধর রাজা। তার সাম্রাজ্যের প্রভাব-প্রতাপ চীন ও তুর্কিস্তান পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। এসব দেশের সম্রাটদেরকে তিনি কখনও হিসাবে ধরতেন না। কিন্তু এখন বেকায়দায় পড়ে তাদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানাতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

ইয়াযদাজারদ সর্বপ্রথম খাকানকে পত্র লিখলেন। তাতে তিনি লিখেছেন

'আরবের কতগুলো ভুখা-নাঙ্গা মানুষ কী একটা নতুন ধর্ম নিয়ে আরব রাজ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওরা অদেখা খোদার পূজা করে। শুধু নিজেদের ধর্মকে ভালো বলে আর অন্য সকল ধর্মকে মন্দ বলে। যারা তাদের ধর্মকে বরণ করে নেয়, তাদের সঙ্গে কোনো বিবাদ করে না। আর যারা গ্রহণ করে না, তাদেরকে হয়ত মেরে ফেলে কিংবা তাদের উপর জিযিয়া চাপিয়ে দেয়। এটি এমন একটি কর, যা প্রত্যেক অমুসলিমকে আদায় করতে হয়। যারা জিযিয়া আদায় করতে সম্মত হয়, তাদেরকেও মুসলমানদের গোলামি করে চলতে হয়। এই আরবরা নিজেদেরকে 'মুসলমান' দাবি করে। তারা চাচ্ছে, সমগ্র জগত অদেখা খোদার উপাসনা করুক। আপন রাজ্য থেকে তারা মূর্তিপূজা উৎখাত করে দিয়েছে। এখন ইরান থেকে আগুনপূজার অবসান ঘটাচ্ছে আর শাম থেকে খ্রিস্টধর্মের মূলোৎপাটন করছে। যদি তাদের প্রতিহত না করা যায়, তাহলে অসম্ভব নয় যে, সমগ্র পৃথিবীতে তাদের ধর্ম ছড়িয়ে যাবে। আপনি যদি আমাকে সাহায্য দেন, তা হলে আমি তাদেরকে পরাজিত করে আপন দেশে তাড়িয়ে দেব। আমি আশা করি, আপনি আমার ধর্ম ও জগতের অন্য সকল ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে বিপুলসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করে আমাকে সাহায্য করবেন।'

ইয়াযদাজারদ একটি প্রতিনিধিদল খাকানের কাছে প্রেরণ করলেন আর তুর্কিস্তানের অপর কয়েকজন রাজার কাছেও একই মর্মে পত্র লিখে তাদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানালেন।

তার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, খাকান ও অন্যান্য রাজাগণ অবশ্যই তাকে সাহায্য দেবেন। তাই পত্র ও প্রতিনিধি প্রেরণ করে তিনি বসে-বসে সাহায্যের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে লাগলেন।

আটত্রিশ.

জামাসপ সাফওয়ানের জন্য একসেট ইরানি পোশাকের ব্যবস্থা করেছে। নিজে তো আগে থেকেই ইরানি পোশাক পরছে। তার জানা ছিল, আফীরার সন্ধানে তাদেরকে খোরাসানের সেই অঞ্চলটিতে যেতে হবে, যেখানে এখনও খোরাসানিদের কর্তৃত্ব বিদ্যমান। ইয়ায্দাজার্দ তার দালালদের মাধ্যমে খোরাসানের উক্ত অঞ্চলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আঞ্চলিকতার বিষাক্ত প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে খোরাসানিদেরকে উত্তেজিত করে তুলেছিল। সেজন্য আশঙ্কা ছিল, সাফওয়ানকে আরবি পোশাকে দেখে কোনো অজ্ঞ ও উগ্র লোক তার উপর আক্রমণ করে বসতে পারে। আর সেজন্যই জামাসপ তার জন্য ইরানি পোশাকের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল এবং হেরাতেই তাকে সেই পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আরবদের আকার-গঠন, চাল-চলন ও রং-রূপ খোরাসানিদের থেকে ভিন্ন ছিল। তাই জামাসপ বেশ পরিবর্তনের এ-কৌশলটি অবলম্বন করল। সাফওয়ানকে এমন একসেট ইরানি পোশাক পরিয়ে দিল, যার ফলে চোখ ও চেহারা ব্যতীত দেহের আর কোনো অংশই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

দুজন হেরাত থেকে রওনা হলো। যখন মারাদশাহজাহানের পথে গিয়ে উঠল, তখন জামাসপ বলল, আমি মনে করি, ফায়রোজান মারাদশাহজাহান যেতে পারে না।

কেন পারে না?

কারণ, তার জানা আছে, ইসলামি বাহিনী ওদিকে রওনা হয়েছে। তাদের ভয়ে সে ওদিকে যাওয়ার সাহস পাবে না।

তোমার ধারণা সঠিক। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমি যাব কোন দিকে।

এটিই ভাববার বিষয়। আমি মনে করি, সে না ওদিক থেকে এসেছে, না এদিকে গেছে।

আমি তোমার ধারণা সমর্থন করি। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, আমরা যাব কোন দিকে।

ফায়রোজান আমাকে বলেছিল, সে শারাকশাহাজহানের জাগিরদার।

শারাকশাহজাহান মারাদশাহজাহানের বিপরীত দিকে। মারাদশাহজাহান যদি জয় হয়ে থাকে, তা হলে সে ওখানেও যাবে না।

তা হলে কোথায় যাবে? বলখ যেতে পারে?

সম্ভাবনা আছে। তবে বলখের রাস্তা অতিশয় দুর্গম ও ঝুঁকিপূর্ণ। দীর্ঘ পথ পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

তাহলে মারাদশাহজাহানই চলো। সেখান থেকে কিছু সৈন্য নিয়ে বলখ চলে যাব।

যদি সামরিক শক্তি দ্বারা আপামণিকে উদ্ধার করার আশা থাকত, তা হলে আমরা দুজন আসতাম না; হেরাত থেকে একটি বাহিনী পাঠিয়ে দিতাম। তারা মারাদশাহজাহান থেকে একটি বাহিনী নিয়ে অভিযান চালাত। কিন্তু এই পথে সফলতার আশা নেই। প্রথমত এই কারণে যে, ওরা সেখানে গিয়ে পৌঁছেছে, সেখানে আমাদের মোকাবেলা করতে হবে। ওদিককার প্রতিটি দুর্গ ও শহরে বিপুলসংখ্যক মজুসি সৈন্য রয়েছে। বলা তো যায় না, যুদ্ধের ফলাফল কী হবে। দ্বিতীয় কারণ, আপামণিকে যত দ্রুত উদ্ধার করা যায়, ততই আমাদের জন্য মঙ্গল হবে। কিন্তু বাহিনী তো এত দ্রুত পথ চলতে পারবে না। তৃতীয় কারণ, বাহিনী প্রেরণ করলে পথে-পথে তাদের শত্রুসেনাদের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে। ফলে বাহিনী যথাসময়ে গন্তব্যে পৌঁছুতে পারবে না। চতুর্থত, আমরা যে-স্থানে আক্রমণ চালাব, ফায়রোজান যদি সেখানে থাকে, তাহলে সে পালিয়ে যাবে। এক কথায় সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে এই অভিযানে আমরা সফল হব না। সাফল্য অর্জনে আমাদের প্রথম কাজ হলো, আমাদেরকে জানতে হবে, আপামণিকে নিয়ে ও গেল কোন দিকে।

কিন্তু এই তথ্য উদ্‌ঘাটন করা তো সহজ নয়।

সহজ নয় বটে; কিন্তু অসম্ভবও নয়। আমাদেরকে তার পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলতে হবে।

আমার মন বলছে, ও বলখের দিকেই গেছে।

এই ধারণা আমারও। বলখের দুর্গম পথেই তার আশ্রয় মিলতে পারে।

তা হলে আর কোনো কথা নয়। আল্লাহর নাম নিয়ে সেদিকেই রওনা হই।

ঠিক আছে, চলুন।

দুজন এগোতে শুরু করল এবং বলখের পথ ধরেই রওনা হলো।

রাস্তাটি খুবই ভয়ংকর ও দুর্গম। সে-কারণে সাধারণতই এ-পথে মানুষ

যাতায়াত করে খুব কম। আর এখন যখন মুসলমানরা হেরাত জয় করে নিল, তখন থেকে পথটি একেবারে বন্ধই হয়ে গেছে।

সাফওয়ন ও জামাসপ দুপুর পর্যন্ত ঘোড়া হাঁকাতে থাকল। এই দীর্ঘ সময়ে একজন পথচারীর সঙ্গেও তাদের দেখা মিলল না। জামাসপ মাটিতে ঘোড়ার খুরচিহ্ন দেখার চেষ্টা করছিল। কিন্তু প্রবল বায়ু ধুলোবালি উড়িয়ে সব পদচিহ্ন মুছে ফেলেছে।

পথে তারা কয়েকটি জনবসতি পেল। সেগুলোর বেশ কটিই লোকশূন্য। মুসলমানরা যখন হেরাত আক্রমণ করেছিল, তখন মুসলমানদের ভয়ে এরা পালিয়ে গিয়েছিল। জনাকতক বৃদ্ধলোক পাওয়া গেল। তারা ভয়ে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। তারা এদেরকে ইসলামি গুপ্তচর মনে করল। তাই তাদের কোনো প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিল না।

সাফওয়ান ও জামাসপ এগোতে থাকল। এবার তারা পাহাড়ের উপর উঠে গেল এবং পাহাড়ের পাকডন্ডি অতিক্রম করে চলতে থাকল এবং পাহাড়ের একটি গুহায় রাত কাটাল। গুহার বাইরে লাকড়ি কুড়িয়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে রাখল। ঘোড়া দুটোকে গুহার একধারে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজেরা অপর ধারে পড়ে থাকল।

তারা হেরাত থেকে কোনো খাবার সঙ্গে করে আনেনি। তাড়াহুড়ার কারণে মনেই ছিল না। এক বস্তি থেকে কিছু ছোলা এনেছিল। সেখান থেকে কিছু খেল এবং পাহাড়ি ঝরনা থেকে পানি পান করল। সাফওয়ান ঈশার নামায আদায় করে শুয়ে পড়ল।

সকাল-সকাল জাগ্রত হয়ে তারা প্রয়োজনাদি সারল। সাফওয়ান অজু করে নামায পড়ল। তারপর ঘোড়ায় যিন কষে রওনা হলো। পথ দুর্গম হওয়ায় তারা দ্রুত চলতে পারছে না। স্থানে-স্থানে আকাশচুম্বি চটানের মধ্যদিয়ে অতিক্রম করতে হচ্ছে। পথ এবড়ো-খেবড়ো হওয়ার কারণে হিসাব করে মেপে-মেপে পা ফেলতে হচ্ছে। কোথাও-কোথাও পথের দু-ধারে গভীর খাদ। পাকডন্ডির মতো রাস্তা। তাতে দেখে-দেখে খুবই সাবধানে চলতে হচ্ছে সাফওয়ান ও জামাসপকে।

দুপুরবেলা তারা একটি পাহাড়ি লোকালয়ে গিয়ে উপনীত হলো। গোটাকতক কাঁচা-পাকা ঘর। তারা বিস্মিত হলো যে, গোটা বসতিতে কয়েকজন দুর্বল নারী ও কতক বৃদ্ধ পুরুষ ছাড়া আর কোনো মানুষ নেই। জামাসপ তাদের জিজ্ঞেস করল, তোমাদের আর লোকজন কোথায়?

তাদের কয়েকজন উত্তর দিল, মহিলারা ভেড়া-বকরির পাল চরাতে আর পুরুষরা ঘাস কাটতে গেছে।

সাফওয়ান ও জামাসপ সেখান থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য ও বন ইত্যাদি ক্রয় করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। বসতি অতিক্রম করে সামান্য অগ্রসর হওয়ার পর এক পাহাড়ি মেয়েকে বকরি চরাতে দেখল। এরা তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অতিশয় রূপসী এক মেয়ে। জামাসপ তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি প্রতিদিনই এখানে বকরি চরাতে আস?

মেয়েটি চঞ্চল মুখে বলল, তাতে তোমার কাজ কী? কী বলতে চাচ্ছ বলো?

তুমি কি এদিক দিয়ে কয়েকজন অশ্বারোহীকে যেতে দেখেছ?

দেখেছি, কাল এই সময় কিংবা এর কিছু সময় পর, না-না সন্ধ্যার সময় যখন আমি বকরিগুলো বস্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন কয়েকজন অশ্বারোহী বস্তির নিকটে গিয়েছিল। তাদের সঙ্গে একটি মেয়েও ছিল। তার পোশাক-আশাক খানিক অদ্ভূত ধরনের– আমাদের এ-দেশীয় নয়। তারা রাতে আমাদের বস্তিতে আমাদেরই ঘরে ছিল। আমার মনে হয়েছিল, মেয়েটি আরবকন্যা। আচ্ছা, তোমার সঙ্গীটা মুখে পট্টি বেঁধে রাখল কেন?

তার আক্কেল দাঁত গজাচ্ছে।

আমি এক্ষুনি একটি শেকড় এনে দিচ্ছি। তাতে অল্পক্ষণের মধ্যেই আরাম হয়ে যাবে।

মেয়েটি দৌড়ে গেল। একটি শেকড় তুলে আনল এবং জামাসপের প্রতি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এই নিন।

জামাসপ জিজ্ঞেস করল, কীভাবে লাগাব এটি?

মেয়েটি বলল, কোনোভাবে লাগাতে হবে না। চিবিয়ে খেতে বলুন।

জামাসপ মেয়েটির কৃতজ্ঞতা আদায় করল এবং সেই স্থান ত্যাগ করে সম্মুখপানে অগ্রসর হতে লাগল।

ঊনচল্লিশ.

তুর্কিস্তানের সম্রাটদের কাছে সাহায্যের আবেদন পাঠিয়ে ইয়ায্দাজার্দ মারাদরোদে জবাবের অপেক্ষায় বসে আছেন। প্রতিবেশী রাজাগণ তার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াবেন তাতে তার কোনোই সন্দেহ নেই। যে-দূতদের প্রেরণ করেছেন, তাদের একজনও এখনও ফিরে আসেনি। তিনি ইসলমি বাহিনীর খবরাখবর সংগ্রহের জন্য কয়েকজন গুপ্তচর প্রেরণ করে

রেখেছিলেন। তাদের মাধ্যমে তিনি সংবাদ পেয়ে গেছেন, মারাদশাহজাহান জয় হয়ে গেছে। তিনি এক-একটি নগরী ও দুর্গের পতনের সংবাদ শুনছেন আর ব্যথায় কুঁকিয়ে ওঠছেন। মুসলমানদের প্রতি ক্ষুব্ধও হয়ে উঠছেন তিনি। কিন্তু তার ক্ষোভ মুসলমানদের অগ্রযাত্রা ও সফলতায় কোনোই ব্যত্যয় ঘটাতে পারছে না।

একদিন তার কাছে সংবাদ এল, ইসলামি বাহিনী মারাদরোদ অভিমুখে রওনা হয়ে গেছে। সঙ্গে এই তথ্যও পেলেন যে, খাকান অনতিবিলম্বে তার সাহায্যে বাহিনী প্রেরণ করছেন। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখলেন, সহযোগী বাহিনী এসে পৌঁছুলেই মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাবেন।

ইয়ায্দাজার্দ বিলাসিতাপাগল মানুষ ছিলেন। তার দরবারে নাচ-গানের আসর রোজই বসত। মাঝে-মধ্যে মদপানের ধারাও চলত। উপদেষ্টা, অনুচর, মন্ত্রীবর্গ ও রাজপরিবারের মেয়েরা প্রায়ই এসব আসরে অংশগ্রহণ করত। রূপসী নর্তকী-গায়িকারা ও দাসীরা নেচে-গেয়ে বাদশাহ ও তাঁর সঙ্গী-সহচরদেরকে আনন্দ দিত।

ইয়ায্দাজার্দ যখন মাদায়েন অবস্থান করেছেন, সে-সময় তিনি মুসলমানদের ঘাটাননি। ইনসাফের সঙ্গে শাসন করেছেন। সে-সময় মদ-নারীর প্রতিও তেমন আসক্ত ছিলেন না। এটা ছিল তার নিজস্ব নীতি ও চরিত্র।

কিন্তু চালবাজ-চাটুকার সহচররা তাকে এই আদর্শের উপর স্থির থাকতে দেয়নি। তারা শাহেশাহর কে কত বেশি নৈকট্য অর্জন করে বেশি-বেশি স্বার্থ ও ক্ষমতা ভোগ করবে, সেই প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ল। তারা রূপসী মেয়েদেরকে তার সামনে উপস্থাপন করতে শুরু করল। তাতে তিনি বিলাসিতা ও মদ-নারীর ফাঁদে আটকে গেলেন।

মুসলমানদের সঙ্গেও তার সম্পর্কের অবনতি ঘটল। মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে ওঠল। এক সময় তারা তাকে মাদায়েন থেকে তাড়িয়ে দিল। তিনি যদি বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ নিতেন এবং মুসলমানদের সঙ্গে সমঝোতা করে নিতেন,, তাহলে তাকে ভবঘুরের জীবন অবলম্বন করতে হতো না। তিনি স্বার্থপর মোসাহেবদের হাতের পুতুলে পরিণত হলেন। পরিণতি এই দাঁড়াল যে, তার সমগ্র রাজ্যে মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। খোরাসানের সামান্য একটি অংশ তার হাতে অবশিষ্ট আছে শুধু। মুসলমানরা তাও দখল করে নিতে শুরু করেছে। রাজ্য হারানোর ব্যথায় তিনি কুঁকিয়ে ওঠছেন। মনের এই ব্যথা লাঘবের জন্য

তিনি পেয়ালার-পর-পেয়ালা মদ গিলছেন। কিন্তু তিনি জানতেন না, মদ মানুষের বিবেক, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও অবিচলতার ঘোর শত্রু। মদ মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে রহিত করে ধ্বংসের অতলে ডুবিয়ে দেয়।

একদিন।

আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে আছে। এক বাগিচায় হাউজের পাড়ে রাজকীয় কোমল ফরাশ পাতা হয়েছে। সম্রাট ইয়াযদাজারদ তার সহচর ও উপদেষ্টাদের রূপসী নারীর সবাই এসে সমবেত হয়েছে। অনিন্দ্যসুন্দরী নর্তকী-গায়িকারা এসে উপস্থিত। আসর জমে গেছে। নাচ-গান শুরু হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর সোনা-রুপার বরতনে করে মদও এসে পড়েছে। তন্বী-তরুণীরা গ্লাস ভরে-ভরে মদ পরিবেশন করতে শুরু করেছে। এরা শাহেনশাহর সহচর ও উপদেষ্টাদের কন্যা।

সহচরদের মধ্যে খোরযাদও উপস্থিত আছে। সে পলকহীন চোখে এক যুবতীর প্রতি তাকিয়ে আছে। মেয়েটি অস্বাভাবিক রূপসী। চেহারা থেকে নিষ্পাপতা ঝরে পড়ছে। খোরযাদের এই লোলুপ দৃষ্টিপাত মেয়েটির ভালো লাগল না। মেয়েটি চায় না কোনো পুরুষ এভাবে তার প্রতি কামনার দৃষ্টিতে তাকাক। বিশেষ করে এমন ব্যক্তি, যে বার্ধক্যের সীমানায় ঢুকে পড়েছে। কিন্তু সে পিতার খাতিরে মুখ খুলল না। এর কোনো প্রতিবাদ করার সাধ্য তার নেই।

হঠাৎ ইয়াযদাজারদ-এর কী যেন মনে পড়ল। তিনি বললেন, খোরযাদ, সেই আরব মেয়েটির কী হলো, যার কামনা আমাকে অস্থির করে রেখেছে?

খোরযাদ বলল, ফায়রোজান তাকে তুলে আনতে গেছে। আমি নিশ্চিত সে সুন্দরীকে নিয়েই তবে ফিরবে।

আচ্ছা, মেয়েটি কি খুব বেশি রূপসী?

এত রূপসী যে, জগতের সব রূপসী তার সামনে এমন, যেন চাঁদের সামনে তারা। তার চাঁদসুন্দর মুখমণ্ডল থেকে রূপ ও আলোর কিরণ বিচ্ছুরিত হয়, যা যে-কোনো দর্শককে বিমুগ্ধ ও বিমোহিত করে তোলে। তার ডাগর-ডাগর চোখ দুটো এত মনকাড়া যে, মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। মোটকথা, মেয়েটি রূপ-সৌন্দর্যের মূর্তপ্রতীক।

আমাদের এখানে যেসব তন্বী-তরুণীরা আছে, তাদের একজনও সেই রূপবতীর তুলনা হতে পারে না কি?

আমি ইয়াযদানের শপথ করে বলছি, এদের একজনও তার মতো রূপসী নয়।

ফায়রোজান যদি তাকে তুলে আনতে সক্ষম হয়, তাহলে আমি তাকে তার দাবি অনুপাতে পুরস্কার দেব।

চিত্তহারিণী মেয়েরা আবারও গ্লাস ভরে-ভরে মদ পরিবেশন করতে লাগল। সবাই মদপান করল। এত বেশি করল যে, তারা আবোল-তাবোল বকতে শুরু করল। লজ্জা ও শালীনতার পর্দা উঠে গেল। নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার ধারা শুরু হয়ে গেল।

খোরযাদ পুনরায় মেয়েটির দিকে তাকাতে শুরু করল। উজিরে আজম একবার মেয়েটির কাছে মদ চাইল। মেয়েটি আগ্রহভরে উঠে তার হাতে মদের গ্লাস ধরিয়ে দিল। বৃদ্ধ মন্ত্রী তার কোমল হাত থেকে পাত্রটা নিয়ে লোভাতুর চোখে তার মুখপানে তাকাল এবং ঢকঢক করে মদগুলো গলায় ঢেলে দিল।

খোরযাদ বিষয়টিকে আপত্তির চোখে দেখল। সে-ও মেয়েটির কাছে মদ চাইল। কিন্তু সুন্দরী কোনো ভ্রূক্ষেপ করল না। খোরযাদ আবারও চাইল। এবার মেয়েটি অনাগ্রহের সঙ্গে ওঠল। গ্লাসে মদ ঢালল এবং নিয়ে খোরযাদের কাছে গেল। খোরযাদ মেয়েটির কোমল হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ধরে রাখল। মেয়েটি বিষয়টিকে আপত্তির চোখে দেখল। তার রাজকীয় রক্ত উথলে ওঠল। অপর হাতে খোরযাদকে চড় মারতে মনস্থ করল। কিন্তু তার আগেই অপর এক মোসাহেব– বোধহয় সে-ও মেয়েটির প্রত্যাশী ছিল– উত্তেজিত হয়ে তরবারির বাট দ্বারা খোরযাদকে আঘাত হানল। খোরযাদের হাত থেকে মেয়েটির হাত ছুটে গেল। মোসাহেব বলল, বদতমজি, শাহজাদীর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখো।

খোরযাদও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠল। সে খঞ্জর বের করে সহসা মোসাহেবের দিকে তেড়ে গেল। মেয়েটি ভয়ে পেছন দিকে সরে গেল। পার্শ্ব থেকে কয়েক ব্যক্তি ধেয়ে এসে খোরযাদ ও মোসাহেবের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে গেল। দৃশ্যটি দেখে ইয়ায্দাজার্দ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, কেমন মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা! উৎসবের জায়গায় যুদ্ধ কেন? হাতে তরবারি কেন? খঞ্জর কেন?

শাহেনশাহর হস্তক্ষেপে সবাই শান্ত হলো। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সকলে আপন-আপন আসনে বসে পড়ল। নেশা উবে গেল। মোসাহেব বলল, খোরযাদ এই মেয়েটির হাত ধরেছিলেন।

ইয়ায্দাজার্দ গর্জে উঠে বললেন, খোরযাদ এমন দুঃসাহস কোথায় পেল?

খোরযাদ বলল, আমি শাহজাদীর হাত থেকে গ্লাস নিতে চেয়েছিলাম। আমার হাত ফস্কে তার হাতের উপর পড়েছিল।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ বললেন, এই ব্যাপার! এমন সামান্য একটি ব্যাপার নিয়ে এত হাঙ্গামা! তোমরা আমার মনটাই খারাপ করে দিয়েছ।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ কী একটা আদেশ দিতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় গোয়েন্দা কর্মকর্তা এসে হাজির হলো। তার জানা ছিল না, এখানে কী ঘটেছে এবং কী ঘটছে। এসেই সে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে বলল, মহারাজ, আমি একটি সংবাদ জানতে পেয়েছি।

বলো, কী সংবাদ পেয়েছ?

মুসলমানদের আক্রমণ-অভিযান বেড়ে চলছে। তাদের অগ্রবাহিনী এখান থেকে মাত্র চার মনযিল দূরে এসে পড়েছে।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, তুমি খুবই খারাপ খবর নিয়ে এসেছ– খুবই খারাপ খবর! এই হতভাগা মুসলমানগুলো কি আমাদেরকে কোথাও শান্তিতে বসতে দেবে না?

মুসলমান নাম শুনে উজিরে আজমের নেশা কেটে গেল। বললেন, তাদের সাহস এইজন্য বেড়ে গেছে যে, আমরা কেবলই পেছনে সরে যাচ্ছি।

সেনাপ্রধান বললেন, এই মুহূর্তে আমাদের কাছে পর্যাপ্ত সৈন্য আছে। আমাদের এখানেই তাদের মোকাবেলা করা উচিত।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ বললেন, না না, এ ভুল চিন্তা। আমাদের কাছে এত পরিমাণ সৈন্য নেই যে, আমরা এখানে অবস্থান করে তাদের মোকাবেলা করতে সক্ষম হব। তুর্কিস্তানের সহযোগী বাহিনী এসে না পৌঁছা পর্যন্ত মুসলমানদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়ার চিন্তা করা ঠিক হবে না।

উজিরে আজম বললেন, কিন্তু মহারাজ, মুসলমানরা যে এদিকে এগিয়ে আসছে!

ইয়ায্‌দাজার্‌দ বললেন, আসতে দাও। আমরা বলখ রওনা হয়ে যাব। আজই সমস্ত বাহিনীতে ঘোষণ করে দাও, আমরা আগামী কাল বলখের উদ্দেশ্যে যাত্রা করব।

সেনাপ্রধান জিজ্ঞেস করলেন, মারাদরোদে কী পরিমাণ সৈন্য রেখে যাব?

ইয়ায্‌দাজার্‌দ বললেন, দুর্গপতিকে জিজ্ঞেস করুন, তার জন্য কত সৈন্য রেখে যেতে হবে।

দুর্গপতিও বৈঠকে উপস্থিত আছেন। ইয়ায্‌দাজার্‌দ ও তার মোসাহেবদের প্রতি তার মন ভালো নেই। বললেন, সৈন্য তো শাহেনশাহরই সঙ্গে থাকা দরকার। আমার কাছে যে-সৈন্য আছে, আমি তাদের নিয়েই মুসলমানদের মোকাবেলা করব।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ বললেন, শাবাশ! তার কাছে যে-সৈন্য আছে, তারাই যথেষ্ট হবে। অবশিষ্ট গোটা বাহিনী বলখের উদ্দেশ্যে রওনা হও।

উৎসবের আসর লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। যে-হাঙ্গামা শুরু হয়েছিল, তাও বন্ধ হয়ে গেল। তখনই রওনার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। পরদিনই ইয়ায্‌দাজার্‌দ মারাদরোদ ত্যাগ করে বলখের দিকে পালিয়ে গেলেন।

চল্লিশ.

আফীরার ক্লু পেয়ে যাওয়ায় সাফওয়ান ও জামাসপ খুবই আনন্দিত হলো। অথচ এ-যাবত তথ্য শুধু এটুকু পাওয়া গেছে যে, রাতে সে এই লোকালয়ে ছিল। এর বেশি কোনো তথ্য এখনও মেলেনি। তবে এর দ্বারা জানা গেল, এরা সঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছে।

এ-মুহূর্তে তারা এমন এক পথে চলছে, যেটি মোটামুটি ভালো ও সুগম। তারা ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিল। চলতে-চলতে সাফওয়ান বলল, আল্লাহর শোকর যে, আমরা ক্লু পেয়ে গেছি।

জামাসপ বলল, এ-দেশে সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। এখানে আল্লাহর নাম কেউ উচ্চারণ করে না। এ-নামটিই যতসব বিবাদের মূল। আল্লাহর নাম উচ্চারণকারীকে এখানে হত্যা করা হয়। একথা আমি এইজন্য বলছি না যে, আমি অনারব মজুসি কিংবা আল্লাহতে অবিশ্বাসী। এখানে আমার কোনো ভয় নেই। চিন্তা করি আপনাকে নিয়ে। আপনার যদি কোনো ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে মুসলমানরা নির্ঘাত এ-কথাই বলবে যে, ইরানি লোকটি প্রতারণা করেছে।

সাফওয়ান বলল, ঠিক আছে ভাই, আমি সতর্ক থাকব।

জামাসপ বলল, এ আবার আপনি কী বললেন? আমি তো আপনার একজন দাসানুদাস মাত্র। আমি আপনার ভাই নই।

সাফওয়ান বলল, না, আজ থেকে আপনি আমার ভাই– গোলাম নন। ওই ধারণাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন।

সাফওয়ানের উদারতা ও মহানুভবতায় জামাসপ ভীষণ খুশি ও কৃতজ্ঞ হলো। বলল, আমার শরীরের প্রতিটি লোম পূর্ব থেকেই আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ ও নিবেদিত। এখন আমার অন্তরে যে-জযবা ও চেতনা জন্ম নিয়েছে, তাতে যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে আপনার জন্য আমার জীবনটাকে উৎসর্গ করে দিতেও কুণ্ঠিত হব না।

সাফওয়ান বলল, দু'আ করুন, এমন সময়টি যেন না আসে।

জামাসপ বলল, ইয়ায্দান করুন, এমন মুহূর্তটি যেন না আসে।

দুজন কথা বলতে-বলতে পাহাড়ি জনবসতি থেকে অনেক দূর চলে গেছে। যে-পথটি অপেক্ষাকৃত সমতল ও সুগম ছিল, সেটি শেষ হয়ে গেছে। এখন আবার উঁচু-উঁচু পাকডন্ডি এসে পড়েছে। সাফওয়ান ও জামাসপ ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিয়ে সাবধানে চলতে লাগল।

এখানকার পাকডন্ডি পূর্বাপেক্ষা বেশি দুর্গম। একধারে বড়-বড় চটান, অপর ধারে ঝোপ-জঙ্গল। দুজন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পা-পা করে অগ্রসর হচ্ছে।

যখন এই দুর্গম পাকডন্ডি শেষ হলো, তখন সামনে এল একটি পাহাড়ি কূপ। সামনে সাফওয়ান। সাফওয়ানের ঘোড়া ঝুপ করে কূপের মধ্যে পড়ে গেল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল। ফলে নিজে রক্ষা পেয়ে গেল। এমনকি ঘোড়াকেও সামনে নিল এবং বাঁগ টেনে তাকে অপর কূলে নিয়ে গেল।

জামাসপ পেছনে ছিল। তার ঘোড়াও পা পিছলে উবু হয়ে কূপের মধ্যে পড়ে গেল। লোকটি বোধহয় আলগাভাবে বসে ছিল– সতর্ক ছিল না। তাই নিজেও ডিগবাজি খেয়ে পড়ে কূপের গভীরতা মাপতে শুরু করল। সাফওয়ান মুচকি হেসে বলল, বেরিয়ে আসুন; এতে বেশি পানি নেই। আপনি অযথা ঝাঁপিয়ে পড়ে পানি মাপতে শুরু করেছেন।

জামাসপ উঠে এল। তার পরিধেয় ভিজে গেছে। বলল, এই অভাগা ঘোড়াটা আমাকে ফেলে দিল যে, আগে পানিটা মেপে নাও।

জামাসপ ঘোড়ার বাগ ধরে ঘোড়াসহ কূপের অপর পাড়ে চলে গেল। সাফওয়ান বলল, কাপড়গুলো খুলে চিপে শুকিয়ে ফেলো।

জামাসপ বলল, চিপে নিচ্ছি। চলতে-চলতে গায়েই শুকিয়ে যাবে।

সাফওয়ান বলল, না, তা করো না। ভিজা কাপড় পরনে থাকলে জ্বর হয়, নিমোনিয়া হয়– খুবই মারাত্মক রোগ।

জামাসপ বলল, কিন্তু শোকাতে গেলে তো অনেক সময় ব্যয় হয়ে যাবে। এখানে বসে-বসে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।

সাফওয়ান বলল, যা-ই হোক, আমি তোমাকে ভিজা কাপড় পরতে দেব না। এগুলো খোলো, চিপো, শুকোয়। অতক্ষণে আমি জোহর নামাযটা আদায় করে নিই।

সাফওয়ান অজু করে চটানের আড়ালে গিয়ে নামায পড়তে শুরু করল। জামাসপ ঝটপট গায়ের সবগুলো কাপড় খুলে চিপে শুকোতে ছড়িয়ে দিল।

সাফওয়ান নামায শেষ করে দেখল, এক পাহাড়ি কন্যা একস্থানে বসে বিস্মিতচোখে তার প্রতি তাকিয়ে আছে। দুজনে চোখাচুখি হলে মেয়েটি ফারসি ভাষায় জিজ্ঞেস করল, কী করছিলে তুমি?

সাফওয়ান ফ্রেগাসের নিকট সামান্য ফারসি শিখে নিয়েছিল। সে ভাঙা-ভাঙা ভাষায় উত্তর দিল, আমি উপাসনা করছিলাম।

মেয়েটি বেশ সুশ্রী ও চঞ্চল। বলল, আগুন ছিল কোথায় তোমার সামনে?

আগুন ছিল না।

আশ্চর্য মানুষ তো তুমি! তোমার বলার ধরন বলছে, তুমি এ-দেশের নাগরিক নও।

সাফওয়ান দ্বিধায় পড়ে গেল, কী উত্তর দেবে। বলল, আমি ইরাকের নাগরিক– না না, তার থেকেও দূরের।

আমি বুঝতে পারছি না, তুমি কোথাকার মানুষ।

এই চটানগুলোর অপর প্রান্তে আমার এক সঙ্গী আছে। ও-ই তোমাকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারবে।

মেয়েটি উঠে গেল এবং হাসতে-হাসতে ফিরে এল। হাসতে-হাসতেই বলল, মানুষ কোথায়, ওখানে তো নেংটা-পোংটা একটা বন্যপ্রাণী বসে আছে।

সাফওয়ান ভুলেই গেছে, জামাসাপ উলঙ্গ হয়ে কাপড় শোকাচ্ছে। সে মুচকি হেসে বলল, ওকে ওর ঘোড়া কূপে ফেলে দিয়েছিল যে, মেপে দেখো, পানির পরিমাণ কত?

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে ওঠল। হাতে তালি বাজাতে-বাজাতে বলল, বেশ বেশ! কাপড়-চোপড়সহ কূপে নেমে পানি মেপেছেন আর এখন একদম উলঙ্গ বন্যপ্রাণী সেজে কাপড় শোকাচ্ছেন। খুব মজার মানুষ তো আপনারা!

তা তুমি এখানে এলে কীভাবে?

আমি নিকটেই বকরি চরাচ্ছি। একটি বকরি পালাতে শুরু করেছিল। আমি তার পেছনে-পেছনে চলে এলাম। বকরিটি পালে চলে গেছে। আর ঘটনাচক্রে আমি তোমাকে দেখে ফেললাম আর এখানে চলে এলাম। যাচ্ছ কোথায় তোমরা?

সাফওয়ান বলল, ওই যে উলঙ্গ লোকটিকে দেখে এসেছ, আমি তার সঙ্গে আছি। ও আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, আমি সেখানেই যাব।

মেয়েটি আবারও হাসল। বলল, বড় আজব-আজব কথা বলছ তুমি। উনি যদি তোমাকে জায়হুন নদীর ওপারে নিয়ে যান, তাহলে?

জায়হুন নদী কোথায়, তা-ই তো আমি জানি না।

এটুকুও জান না তুমি! তা হলে আমি বলছি শোনো, বলখ থেকে আরও কিছুদূর সামনে এগিয়ে গেলে একটি নদী দেখতে পাবে। তার নাম জায়হুন। নদীটি পার হয়ে তুর্কিস্তানেও যেতে পার, চীনও যেতে পার।

জানি না, ও আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে।

তুমি কোথাও যেও না– এখাইে থাকো।

এখানে থেকে আমি তোমার বকরি চরাব, না?

মেয়েটি আবারও খিলখিল করে হেসে ওঠল। বলল, না বকরি আমিই চরাব। আমাদের পুরুষরা কোনো কাজ করে না। তাই তোমাকেও কিছু করতে হবে না। শুধু দস্যু ও ডাকাতদের থেকে আমাদের ও আমাদের মহল্লাটিকে পাহারা দেবে।

ওরা বকরি হাঁকিয়ে নিয়ে যায় নাকি?

বকরিও নেয়, সুন্দরী মেয়েদেরও ধরে নিয়ে যায়।

মেয়েদের নিয়ে কী করে?

বিক্রি করে ফেলে কিংবা দাসী বানায়।

সরকার কি দস্যু-তস্করদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয় না?

নিলে তো দস্যু-তস্কর থাকতই না। আরে-আরে, আমার বকরিগুলো কোথায় চলে গেল!

মেয়েটি উঠে এমনভাবে দৌড় দিল, যেন সে উড়ছে। সাফওয়ানও উঠে দাঁড়াল। সে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দেখল। বকরিগুলোকে খুব ভীত-সন্ত্রস্ত মনে হলো। সে আরও এগিয়ে গেল, সম্মুখ থেকে মেয়েটি আসছিল। তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে। দু-চোখ থেকে ভীতি ঠিকরে পড়ছে। সাফওয়ান বলল, ভয়ে পেয়ো না, বলো কী হয়েছে?

মেয়েটি বলল, দস্যু এসে পড়েছে।

তখনই দুজন লোক ছুটে এল। মেয়েটি বলল, ওই নেকড়েগুলো থেকে আমাকে বাঁচাও।

সাফওয়ান মেয়েটিকে তার পেছনে নিয়ে লুকিয়ে ফেলল।

একচল্লিশ.

দস্যু দুজনকেই রক্তপিপাসু ও হিংস্র মনে হলো। সাফওয়ান মেয়েটিকে সান্ত্বনা ও অভয় দিয়ে বলল, তুমি ভয় পেয়ো না, তোমাকে এরা আমার থেকে নিতে পারবে না।

দস্যুরা সাফওয়ানের কাছে এল। দুজনই তরবারি উঁচিয়ে ধরেছে। একজন বলল, আহরামের কসম, এ তো ইরানের নাগরিক নয়। এ তো আরবের লোক। এখানে কীভাবে এল?

অপরজন বলল, যেখানকারই হোক, মেরে ফেলো আর ওই পাহাড়ি হরিণীটি নিয়ে চলো।

সাফওয়ান বলল, যদি এই নিরপরাধ মেয়েটির প্রতি চোখ তুলেও তাকাও, আমি তোমাদের চোখ খুলে ফেলব।

এক দস্যু জিজ্ঞেস করল, কে তুমি?

সাফওয়ান বলল, আমি মুসলমান।

মুসলমান! উভয় দস্যু বিস্মিতকণ্ঠে বলল। একজন ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল, এ আমাদের দেশের শত্রু, জাতির শত্রু, একে শেষ করে ফেলো।

যে-লোকটি তরবারি উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল, সে আক্রমণ করল। সাফওয়ান তার আক্রমণ প্রতিহত করল। দস্যু পুনর্বার আঘাত হানতে-না-হানতে সাফওয়ানও দ্রুত আক্রমণ চালাল। তরবারি দস্যুর একটি কান উড়িয়ে নিয়ে গেল। লোকটি ব্যথায় চিৎকার দিয়ে ওঠল। বলল, বদমাশ, জালেম।

দস্যু প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে উঠে পূর্ণ শক্তিমত্তার সঙ্গে আবারও আঘাত হানল। সাফওয়ান পার্শ্ব বদল করে তার আক্রমণ ঠেকিয়ে দিল এবং মোড় ঘুরিয়ে আক্রমণ করে তার মাথাটা উড়িয়ে দিল।

সঙ্গীর পরিণতি দেখে অপর দস্যুর চোখে রক্ত নেমে এল। সে তেজোদ্দীপ্ত হয়ে এগিয়ে এল এবং আক্রমণ চালাল। সাফওয়ান তার আক্রমণ প্রতিহত করল।

দস্যু পেছনে সরে গেল। সাফওয়ান তার প্রতি দৃষ্টি রেখে আছে। সে সাফওয়ানের পেছন দিকে তাকিয়ে বলল, এগিয়ে এসে পাহাড়ি হরিণীটিকে নিয়ে যাও। আমি এই মুসলমানটাকে শেষ করে এখনই আসছি।

সাফওয়ান মনে করল, দস্যু তাকে ধোঁকা দিচ্ছে; পেছনে আসলে দস্যুর কোনো সঙ্গী নেই। তাই সে পেছনে ফিরে তাকাল না। তাকানোর সুযোগও তার ছিল না। সম্মুখে দুশমন তরবারিহাতে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ ফেরালেই আক্রমণের আশঙ্কা বিদ্যমান। তাই সে আপন প্রতিপক্ষেরই উপর দৃষ্টি জমিয়ে দাঁড়য়ে রইল।

হঠাৎ সাফওয়ান পাহাড়ি মেয়েটির চিৎকারের শব্দ শুনতে পেল। মেয়েটি 'বাঁচাও-বাঁচাও', 'আমাকে এই হিংস্র নেকড়েটির হাত থেকে বাঁচাও' বলে চিৎকার করছে।

সাফওয়ান বুঝল, সামনের দস্যুটি সঠিকই বলেছিল। পেছনে তার কোনো সঙ্গী এসে পড়েছিল। সাফওয়ান দস্যুর উপর আক্রমণ চালাল। দস্যু তার ঢালটা সামনে মেলে ধরল। কিন্তু ঢালটা ঠিকমতো উঁচু হলো না– মাথাটা ঢাকল না। সাফওয়ান মওকা পেয়ে গেল। সে পূর্ণ উদ্দীপনা ও বীরত্বের সঙ্গে পুনরায় আঘাত হানল। তরবারি দস্যুর মাথার খুলিটি উড়িয়ে নিয়ে গেল। সে ভয়ংকর একটা চিৎকার দিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

সাফওয়ান দ্রুত মোড় ঘোরাল। পাহাড়ি মেয়েটি এখনও চিৎকার করছে। এক দস্যু মেয়েটিকে কোলে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। সাফওয়ান পাঞ্জায় ভর করে দৌড়ে তার কাছে পৌঁছে গেল। মেয়েটি তাকে দেখে ফেলেছে। বলল, আমাকে বাঁচাও– ইয়ায্দানের দোহাই, আমাকে বাঁচাও।

সাফওয়ান দস্যুর প্রতি তাকিয়ে হুংকার ছেড়ে বলল, খবরদার, কাপুরুষ! ইতর! মেয়েটিকে ছেড়ে দাও। অন্যথায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। যম তোমার মাথার উপর এসে পড়েছে।

দস্যু চোখ তুলে তাকাল। সাফওয়ান তার কাছে চলে এসেছে। দস্যু মেয়েটিকে ছেড়ে দিল এবং তরবারি উঁচিয়ে লাফিয়ে সাফওয়ানের উপর আক্রমণ চালাল। সাফওয়ান লাফ দিয়ে সরে গিয়ে দস্যুর আক্রমণ ব্যর্থ করে দিল এবং নিজে পালটা আঘাত হানল। দস্যু ঢাল দ্বারা আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করল।। কিন্তু ততক্ষণে সাফওয়ানের তরবারি তার ঘাড়টা উড়িয়ে দিল।

এবার সাফওয়ান মেয়েটির প্রতি মনোনিবেশ করল। তার মুখের উজ্জ্বলতা উবে গেছে। মনোহারী চোখ দুটো থেকে ভীতি টপকে পড়ছে। শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। একজন দস্যুর সঙ্গে শক্তির পরীক্ষা দিয়ে এখন হাঁপাচ্ছে।

সাফওয়ান তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, এখন আর ভয় নেই। সব কটাকেই মেরে ফেলেছি।

মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলল, তুমি যদি না থাকতে, তাহলে...।

অন্য কেউ থাকত আর তোমাকে রক্ষা করত।

এত সাহস আর কারও মধ্যে নেই। এমনকি আমার বাপ-ভাইয়ের মাঝেও নেই। যদি তারা এসে পড়ত আর কিছু করত– তাহলে শুধু এটুকু করত যে, দস্যুদের হাতে-পায়ে ধরে খোশামোদ করে নিজেদের ভেড়া-বকরিগুলো ফিরিয়ে নিত আর আমাকে তাদের হাতে তুলে দিত।

তারা কি তোমার চেয়ে ভেড়া-বকরিদের বেশি ভালবাসে?

ভেড়া-বকরির উপর তাদের জীবন নির্ভরশীল। আর আমি হলাম তাদের বোঝা।

সহসা মেয়েটির মুখটা মলিন হয়ে গেল। যেন হঠাৎ একরাশ দুশ্চিন্তা এসে তাকে চেপে ধরেছে। সাফওয়ান বলল, এ তো বিরাট অমানবিকতা! আচ্ছা, তুমি বাপ-ভাইয়ের ভাবনা ভেবো না। আল্লাহ যদি আমাদেরকে সফলতা দান করেন, তাহলে আমরা তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

কিন্তু তুমি তো মুসলমান।

তুমি আমার বোন হয়ে থাকবে।

মেয়েটির চোখ দুটো চিকচিক করে ওঠল। বলল, আমাকে মুসলমান হতে বাধ্য করবে না তো?

মোটেও না। আমরা কাউকে জোর করে মুসলমান বানাই না। জোর করে মুসলমান বানানো যায়ও না। তুমি তোমার ধর্মের উপর অটল থাকবে আর আমি আমার ধর্ম পালন করব।

মেয়েটি এত আনন্দিত হলো যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে ছুটে গিয়ে সাফওয়ানের বুকের সঙ্গে লেপটে গেল আর বলতে শুরু করল, প্রিয় ভাই আমার।

সাফওয়ান মেয়েটিকে আলতো পরশে সরিয়ে দিয়ে মাথায় স্নেহের হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, প্রিয় বোনটি আমার।

ঠিক এ-সময় আওয়াজ এল, এ আমি কী দেখছি!

সাফওয়ান ও পাহাড়ি মেয়েটি শব্দের দিকে তাকাল। জামাসপ সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সাফওয়ান বলল, ভাই-বোনের মিলন হচ্ছে।

জামাসপ জিজ্ঞেস করল, এই লাশগুলো কোথা থেকে এল?

সাফওয়ান পুরো ঘটনা শোনাল। জামাসপ বলল, চলুন, দেখে আসি কোথাও আরও কোনো দস্যু লুকিয়ে আছে কিনা।

সাফওয়ান বলল, চলুন।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, আর আমি?

সাফওয়ান বলল, ইচ্ছে হলে এখানে থাকো। আর আমাদের সঙ্গে যেতে চাইলে যেতে পার।

মেয়েটি বলল, আমি তোমাদের সঙ্গে যাব। আমার খুব ভয় লাগছে।

তিনজন হাঁটতে শুরু করল। তারা পাথরের বেষ্টনি থেকে বেরিয়ে গেল। ভেড়া-বকরিগুলো নিশ্চিন্তে চরে বেড়াচ্ছে। জামাসপ বলল, আর কেউ অবশিষ্ট নেই। হয় সব মারা গেছে, না হয় এক-দুজন যারা রক্ষা পেয়েছে, তারা পালিয়ে গেছে।

এ-সময় এক যুবক ও এ প্রৌঢ় ছুটে এল। এসেই তারা হাতজোড় করে সাফওয়ান ও জামাসপকে বলল, আমাদের দয়া করুন। এই ভেড়া-বকরিগুলোই আমাদের জীবনের অবলম্বন।

জামাসপ কঠিন কণ্ঠে বলল, কী বলছ? কারা তোমরা?

যুবক বলল, এই মেয়েটি আমার বোন। যদি তোমাদের নিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় নিয়ে যাও; আমরা কিছু বলব না। কিন্তু ভেড়া-বকরিগুলো...।

সাফওয়ান ক্ষেপে গিয়ে বলল, পশুগুলো নিজের বোন-কন্যার চেয়ে বেশি আপন, না?

যুবক বলল, বোন না থাকলে আমরা বেঁচে থাকতে পারব। কিন্তু ভেড়া-বকরিগুলো যদি না থাকে, তাহলে বেঁচে থাকা অসম্ভব। বোনের প্রতি আমার ভালবাসা আছে বটে; কিন্তু পশুগুলোর সঙ্গে বাঁচা-মরার প্রশ্ন জড়িত।

সাফওয়ান বলল, আমরা দস্যু নই। দস্যুদের মরদেহগুলো চটানের বেষ্টনির মধ্যে পড়ে আছে।

বৃদ্ধ ও যুবক দৌড়ে গেল। লাশগুলো দেখে খুশি হয়ে ফিরে এসে বলল, আহরামান আপনাদেরকে আমাদের সাহায্যে প্রেরণ করেছেন। বোনও বেঁচে গেল আবার ভেড়া-বকরিগুলোও রক্ষা পেল।

সাফওয়ান বলল, পশুগুলোকেও নিয়ে যাও, বোনকেও নিয়ে যাও।

মেয়েটি সাফওয়ানের প্রতি তাকিয়ে বলল, বোনের ঘরে থাকেন না ভাই?

আমি জরুরি এক কাজে যাচ্ছিলাম। এখানে অনেক সময় ব্যয় হয়ে গেছে।

মেয়েটি বিনয়ের সঙ্গে বলল, সামান্য সময়ের জন্য চলুন; অন্যথায় বোন খুব কষ্ট পাবে। বলেই জামাসপের প্রতি তাকাল। জামাসপ বলল, সময়ের নাজুকতা ও স্বল্পতা তো অনুমতি দেয় না।

মেয়েটি বলল, ভাইয়া, তুমি যদি আমার ঘরে পা না রাখ, তাহলে আমার হৃদয়টা ভেঙে দশ ভাগ হয়ে যাবে।

সাফওয়ান বলল, আচ্ছা চলো।

সবাই হাঁটতে শুরু করল। মেয়েটি ভেড়া-বকরিগুলো হাঁকিয়ে এগোতে লাগল।

বিয়াল্লিশ.

পাহাড়ি মেয়েটির পিতা ও ভাই সাফওয়ান ও জামাসপকে খুব শ্রদ্ধা দেখাচ্ছে। তাদের একজন পথপ্রদর্শক হিসেবে আগে-আগে আর অপরজন সেবক হিসেবে পেছনে হাঁটছে।

মেয়েটির সঙ্গে ভেড়া-বকরিগুলোর সখ্য বেশ চমৎকার। পশুগুলো যখন

ছড়িয়ে যেতে শুরু করছে, তখন মেয়েটি আওয়াজ দিচ্ছে। অমনি সবগুলো পশু তার কাছে এসে জড়ো হয়ে যাচ্ছে।

তারা একটি সমতল চটান অতিক্রম করে নিচে অবতরণ করল। এবার কিছু নিম্নভূমিতে চলে আবার উপরে উঠতে শুরু করল। এভাবে একাধিক চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে তারা একটি লোকালয়ে গিয়ে পৌঁছুল। লোকালয় বলতে গোটাকতক ঝুপড়ি মাত্র। প্রতিটি ঝুপড়ির সামনে বেশকিছু জায়গা বেড়া দেওয়া। বেড়াগুলো পাহাড়ি গাছের ডাল ও লম্বা-লম্বা ঘাসের তৈরি। এগুলো এই লোকালয়বাসীর ভেড়া-বকরির খোয়াড়। খোয়াড়ের দরজাগুলো কাঠের তৈরি। সারাদিন মাঠে চরিয়ে সন্ধ্যাবেলা পশুগুলোকে এনে খোয়াড়ে বেঁধে রাখা হয়। যেহেতু এই পল্লীর প্রতিটি পরিবারই ভেড়া-বকরি পোষে, তাই প্রতিটি ঝুপড়ির সামনেই খোয়াড় আছে।

ঝুপড়িগুলো বেশ লম্বা-চওড়া ও আরামদায়ক। বৃষ্টি ও বরফপাতের সময় আশ্রয়ের উপযুক্ত জায়গা।

সাফওয়ান দেখল, কয়েক দিক থেকে ভেড়া ও বকরির পাল ফিরে আসছে। পশুগুলোকে যারা হাঁকিয়ে নিয়ে আসছে, তারা হয়ত বয়স্কা মহিলা কিংবা তরুণী-যুবতী মেয়ে। তাতে সাফওয়ান বুঝল, এখানকার পুরুষরা ঘর-গেরস্থালির কোনো কাজ করে না। সব কাজ মহিলারাই আঞ্জাম দেয়।

সে আরও লক্ষ্য করল, এখানকার নারীগুলো বেশ সুন্দরী। তবে যে-মেয়েটি তাকে ভাই বানিয়েছে, সে এদের সকলের চে বেশি রূপসী।

মেয়েটি তার পশুগুলোকে খোয়াড়ে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর ঘরে ঢুকেই কলসি নিয়ে পানি আনতে চলে গেল। দেখাদেখি আরও কয়েকটি মেয়ে কলসি নিয়ে তার সঙ্গ নিল।

মেয়েটির ভাই ঝুপড়ির সামনে বাইরে একটি চাটাই বিছিয়ে দিল। সাফওয়ান ও জামাসপ তার উপর বসে পড়ল। বৃদ্ধ তার পুত্রকে বলল, একটি বকরি কেটে নাও। যুবক বকরি কাটতে প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। জামাসপ বলল, বকরি আমরা দুজন মিলে কাটব। তার জানা ছিল, পাহাড়ি যুবকের কাটা বকরি সাফওয়ান খাবে না। তাকে খাওয়াতে হলে আল্লাহর নাম নিয়ে বকরি যবাই করতে হবে।

যুবক বলল, আমরা আমাদের মেহমানকে এই কষ্ট দেব না।

জামাসপ বলল, কষ্টের কিছু নেই। এ বকরি যবাই করে দেবে আর তুমি চামড়াটা খসিয়ে গোশত প্রস্তুত করে ফেলবে।

সাফওয়ান বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে বকরি যবাই করে দিয়ে ফিরে এসে চাটাইয়ে বসল। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ কয়েকটি বকরির দুধ দোহন করে নিয়ে এল। দুই মেহমান অল্প-অল্প করে দুধপান করল। তারপর সাফওয়ান একদিকে সরে গিয়ে আসর নামায আদায় করল।

ইতিমধ্যে মেয়েটি পাহাড়ি ঝরনা থেকে পানি নিয়ে ফিরে এল। রান্নার কাজ শুরু হয়ে গেল।

দিবসের অবসান ঘটিয়ে সূর্য পশ্চিম আকাশে ডুবে গেছে। সাফওয়ান মাগরিবের নামায আদয় করল। নামায পড়ে ফিরে আসতে-আসতে খাবার প্রস্তুত হয়ে গেল। মেয়েটি ছাগলের ভুনা গোশত ও কাবাব-রুটি এনে সাফওয়ান ও জামাসপের সামনে হাজির করল। তারা তৃপ্তি সহকারে খাবার খেল।

আহার শেষে মেয়েটি তাদেরকে ঝুপড়ির মধ্যে নিয়ে গেল। এখানটা অন্ধকার। মেয়েটি ঝুপড়ির দুটি দরজার সামনে আগুন জ্বালিয়ে দিল। তাতে ঝুপড়ির ভেতরটা খানিক আলোকিত হয়ে গেল। মেয়েটিও তাদের কাছে গিয়ে বসল। বসতে-বসতে সাফওয়ানকে উদ্দেশ করে বলল, বলেছিলে, তুমি মুসলমান। সত্যিই কি তুমি মুসলমান?

আমি সত্যই বলেছি। আমি মুসলমান।

তোমার কি জানা নেই যে, খোরাসানের প্রতিজন নাগরিক– চাই সে ময়দানের বাসিন্দা হোক কিংবা পাহাড়ের– মুসলমানদের শত্রু?

আমি জানি।

তারপরও তুমি এই দেশে কেন এসেছ?

আমি আমার বোন থেকে কোনো কথাই লুকোব না।

সাফওয়ান মেয়েটিকে আফীরার অপহরণের পুরো ঘটনা শোনাল। পাহাড়ি কন্যা মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকল। সাফওয়ানের বলা শেষ হলে মেয়েটি বলল, ও কি খুব সুন্দরী?

খুব না অল্প, সে ভিন্ন কথা। তবে সুন্দরী বটে।

হালকা-পাতলা মানানসই গড়ন?

হ্যাঁ।

মেয়েটি তার পোশাকেরও বিবরণ দিল।

সাফওয়ান বলল, ও এমন পোশাকই পরিধান করত। তুমি দেখেছ নাকি তাকে?

হ্যাঁ। গতকাল সন্ধ্যার সময় যখন আমি বকরিগুলোকে কূপ থেকে পানি পান করানোর জন্য নিয়ে গেলাম, তখন কয়েকজন ইরানি এক মেয়েকে নিয়ে কূপ

অতিক্রম করছিল। মেয়েটি অতিশয় রূপসী ছিল। ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার ছিল। খুব চিন্তিত ও বিষণ্ন মনে হচ্ছিল। আমার ধারণা, ও-ই সেই মেয়ে।

নিশ্চয়ই সে-ই ছিল। আমরা ওকেই খুঁজে ফিরছি।

কিন্তু মেয়েটির পরিচয় কী? আপনার কী হয়?

আমি আর সে এক ধর্মের অনুসারী। আমিও মুসলমান, সেও মুসলমান। আমার সঙ্গে আরব থেকে এসেছে।

পাহাড়ি মেয়েটির মুখে চঞ্চলতা ফুটে ওঠল। মুচকি হেসে বলল, ও বুঝেছি, ও তোমার বাগদত্তা– হবু স্ত্রী। পরক্ষণেই মুখটাকে গম্ভীর করে বলল, আচ্ছা, লোকগুলো তার পিছু নিল কেন? ওরা তাকে তুলে আনল কেন?

জামাসপ বলল, এর জবাব আমার কাছে শোনো। ওই ইরানিদের মধ্যে একজনের নাম ফায়রোজান। লোকটি মারাদশাহজাহানের জাগিরদার। আরব মেয়েটির প্রতি সে আসক্ত হয়ে পড়েছিল। তাকে তুলে আনবার ধান্ধায় ছিল। হেরাতে মওকা পেয়ে গেল আর নিয়ে এল।

শুনে মেয়েটি বলল, সত্য কথা হলো, আমাদের পুরুষদের চারিত্রিক অবস্থা দুর্বল হয়ে গেছে।

সাফওয়ান খুব বিস্মিত হলো যে, একটি পাহাড়ি কন্যার এমন চমৎকার বুঝ! সে জিজ্ঞেস করল, এত অভিজ্ঞতা তুমি কোথায় পেয়েছ?

মেয়েটি বলল, আমি কিছুদিন বলখ নগরীতে বসবাস করেছি। আমার আব্বাজান এক ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট থেকে কিছু ঋণ গ্রহণ করেছিলেন এবং জামানতস্বরূপ আমাকে তার কাছে রেখে এসেছিলেন। সে-সময় আমার বয়স ছিল আট-নয় বছর। আমি লোকটির ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করেছি। কিছু লেখাপড়াও শিখেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত...।

এ-পর্যন্ত বলে মেয়েটি লজ্জিত হয়ে থেমে গেল। জামাসপ বলল, যখন শোনাতে শুরু করেছ, সবটুকু শুনিয়ে ফেলো।

মেয়েটি আবার বলতে শুরু করল, আমার আকার-গঠন ও রূপ-সৌন্দর্য কেমন তা তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছেন। লোকটি আমাকে বেশ গুরুত্ব দিল ও আদর-যত্ন করতে শুরু করল। তার আপন কন্যাদের চেয়ে আমি যেন তার বেশি প্রিয়। তার বড় মেয়েটির বয়স আমার চেয়ে বেশি ছিল এবং খুব বুদ্ধিমতি ছিল। সে ও তার মা আমাকে সাবধান করে দিল, খবরদার ওনার খপ্পরে পড়ো না যেন। আমি নিজেও খুব আত্মমর্যাদাসম্পন্ন

মেয়ে ছিলাম। আমি আব্বাজানকে ডেকে পাঠালাম এবং তাকে ঘটনার ইতিবৃত্ত শোনালাম। তিনি কয়েকটি ছাগল বিক্রি করে লোকটির ঋণ আদায় করে দিলেন এবং আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাই আমাকে বহু কিছু বুঝতে সহায়তা করেছে। আমার মনে হয়, ওরা আপনাদের মেয়েটিকে বলখে নিয়ে থাকবে।

জামাসপ বলল, আমারও এই ধারণা।

মেয়েটি বলল, আমি আমার হবু ভাবীর সন্ধানে ভাইয়ের সঙ্গে বলখ যাব।

তুমি? সাফওয়ান বিস্মিত চোখে মেয়েটির প্রতি তাকিয়ে বলল।

পাহাড়ি মেয়েটি শান্তকণ্ঠে বলল, হ্যাঁ। আমার মনে হয়, আমি তোমাদের অনেক সাহায্য করতে পারব।

সাফওয়ান বলল, কিন্তু তোমার বাপ-ভাই তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে দেবেন কেন?

মেয়েটি বলল, তারা কোনো আপত্তি করবে না। আমি তো বরং মনে করি, তারা খুশি হবে। এ-ব্যাপারে আপনাদের কিছু ভাবতে হবে না। আমিই এ-সমস্যার সমাধান করে নেব।

মেয়েটি নাচতে-নাচতে ভেতরে চলে গেল এবং পিতা-মাতার সঙ্গে কথা বলে ফিরে এল। বলল, অনুমতি পেয়ে গেছি।

রাত অনেক হয়ে গেছে। সাফওয়ান ইশার নামায আদায় করল এবং সবাই ঝুপড়িঘরে শুয়ে পড়ল।

সকালে জাগ্রত হয়ে প্রয়োজনাদি সারল এবং নাস্তা করে তিনজন রওনা হলো।

তেতাল্লিশ.

গোয়েন্দারা ইয়ায্দাজার্দকে সঠিক তথ্যই দিয়েছিল। ইসলামি বাহিনী মারাদশাহজাহান থেকে রওনা হয়ে মারাদরোদের নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল। অগ্রবাহিনী এক মনযিল আগে আর অবশিষ্ট সৈন্য পেছনে।

আহনাফ ইবনে কায়েসও ইয়াযদাজার্দ-এর তথ্য সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। তারা জিম্মি মজুসি। তারা সংবাদ নিয়ে এসেছে, ইয়ায্দাজার্দ মারাদরোদ থেকে বলখ পর্যন্ত দালাল প্রেরণ করে মজুসিদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলেছেন এবং মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলার জন্য পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি সৈন্য ভর্তি করে নিয়েছেন।

আহনাফ (রা.)-এর কাছে মোট সৈন্য ছিল দশ হাজার। তার মধ্য থেকেও কয়েকটি স্থানে তাঁকে কিছু সৈন্য রেখে আসতে হয়েছে। ফলে তাঁর সৈন্যসংখ্যা দশ হাজারের নিচে নেমে এসেছে। তবে এই সেনাস্বল্পতার জন্য তার কোনো ভাবনা নেই। তার শুধু একটিই চিন্তা– যেভাবে হোক ইয়ায্দাজার্দকে হত্যা কিংবা গ্রেফতার করতে হবে, যাতে ইরান অভিযানের সমাপ্তি ঘটে। আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশনা মোতাবেক তিনি খোরাসান অভিযানের ছোট-থেকে-ছোট এবং বড়-থেকে-বড় যে-কোনো পরিস্থিতি লিখে তাঁর খেদমতে প্রেরণ করছেন। হযরত উমর (রা.) বিশেষভাবে এ-অভিযানের প্রতি দৃষ্টি রাখছেন। তিনি পরিস্থিতি অনুপাতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.)-এর সাহায্যার্থে সৈনিক প্রেরণ করে আসছেন। তবু এ-যাবত যে-সৈন্য এসেছে, প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই অপ্রতুল। তথাপি আহনাফ ইবনে কায়েস একের-পর-এক নগরী জয় করে চলেছেন। ইতিমধ্যে ইরানের গুরুত্বপূর্ণ নগরী হেরাত ও মারাদশাহজাহান জয় করে তিনি খোরাসানের দিকে অগ্রযাত্রা শুরু করেছেন। এসব সংবাদ হযরত উমর (রা.)-এর কাছে পৌঁছে গেছে। এক পর্যায়ে তিনি তথ্য পেলেন যে, ইয়ায্দাজার্দ পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের সমাবেশ ঘটিয়েছে। এ-সংবাদে তিনি ভাবনায় পড়ে গেলেন। কুফায় নির্দেশ পাঠালেন, যেন তারা আহনাফ ইবনে কায়েসের সাহায্যার্থে যত বেশি সম্ভব সৈন্য প্রেরণ করে। কুফাকে তিনি এই আদেশও পাঠালেন যে, তারা যেন এই সহযোগী বাহিনীর কাছে আলকামা ইবনুন্-নায্রি, রিব্য়ী ইবনে আমির আত-তামীমি, আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আকীল আছ-ছাকাফি ও ইবনুল আরাবি হামাদানিকেও প্রেরণ করা হয়।

এরা কজন ছিলেন যুদ্ধাভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। হযরত উমর (রা.)-এর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি আরবের প্রতিটি গোত্রের কে কোন বিদ্যায় পারদর্শী, তা ভালোভাবে জানতেন। তাদের কারা যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ, কারা অর্থনৈতিক বিষয়ে পারদর্শী, কারা রাষ্ট্রপরিচালনায় দক্ষ, কারা রাজনীতিবিদ ইত্যাদি সব তাঁর জানা ছিল।

কুফার গভর্নর এসব কমান্ডারদের অধীনে কয়েকটি সেনা-ইউনিট পাঠিয়ে দিলেন। তারা এখনও আহনাফ ইবনে কায়েসের নিকট গিয়ে পৌঁছায়নি। তবে তিনি তাদের রওনা হওয়ার সংবাদ পেয়ে গেছেন। কিন্তু আহনাফ (রা.) সাহায্যের অপেক্ষা বসে থাকবার মতো সেনাপতি নন। তাঁর বাহিনীর একজন সৈনিকও এমন মানসিকতা পোষণ করে না। তাঁরা

বীর ও সাহসী লড়াকু। যুদ্ধই তাদের দিন-রাতের ব্যস্ততা। জিহাদ তাঁদের জীবনের অংশ। শাহাদাত তাঁদের জীবনের একমাত্র কাম্য। সেজন্য কোনো ভয়-ডর তাঁদের কাছে ঘেষতে পারত না। নিজের সংখ্যাস্বল্পতা ও প্রতিপক্ষের সংখ্যাধিক্যের বিষয়টিকে তাঁরা কোনোই গুরুত্ব দিতেন না। তাঁরা আল্লাহর উপর ভরসা করে যুদ্ধ করতেন। তাই তাঁরা সফল হতেন। এছাড়া আরও একটি বিষয় এই ছিল যে, তাদের মূল কমান্ড ছিল আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.)-এর হাতে। মুজাহিদরা তাকে বেশ সমীহ করে চলত। একবার এমন ঘটল যে, এক যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজিত হলো। তাতে তারা এত অনুতপ্ত হলো যে, যার-যার ঘরে ফিরে এসে চুপচাপ বসে রইল। লজ্জায় কাউকে মুখ দেখাতে পারল না। হযরত উমর (রা.)- সান্ত্বনা দিতে তাদের ঘরে-ঘরে এলেন। কিন্তু লজ্জায় তারা তার প্রতি মুখ তুলে তাকাতে পারল না। খলীফার ভয়ে সবাই থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। হযরত উমর (রা.) তাদের সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন–

'পরাজয়বরণ করে তোমরা অন্যায় করেছ বটে। এখন আল্লাহর কাছে তাওবা করো, ক্ষমা চাও, আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দেবেন। এই পরাজয়-কলঙ্ক যদি মুছতে চাও, তাহলে নতুন করে জিহাদের প্রস্তুতি নাও। জয় ছিনিয়ে আনো। তাহলে একদিকে যেমন আল্লাহ খুশি হবেন, অপরদিকে তোমাদের বিগত পরাজয়ের গ্লানিও মুছে যাবে।'

মুসলমানরা তখনই দ্বিতীয় অভিযানের জন্য বেরিয়ে পড়ল এবং এমন জীবনবাজি যুদ্ধ করল যে, যারা দেখেছিল, তারা থ বনে গিয়েছিল। তারা বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল এবং তাদের অনুশোচনা দূর হয়ে গিয়েছিল।

ইরান অভিযানে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) এগিয়ে চলছেন। মারাদরোদ থেকে দু-মনযিল পথ দূরে থাকতে গোয়েন্দারা তাঁকে সংবাদ জানাল, ইয়াযদাজার্‌দ অল্প কিছু সৈন্য মারাদরোদে রেখে অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে বলখ চলে গেছেন। এ-সংবাদে মুসলমানরা আনন্দিত হলো না। কারণ, তারা ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর সঙ্গে সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ করতে চাচ্ছিল। অথচ সে পালিয়ে গেল।

যেহেতু মারাদরোদ পৌঁছুতে আর দু-মনযিল পথ বাকি, তাই আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) অগ্রবাহিনীর সঙ্গে ডান বাহিনীকেও রওনা করিয়ে দিলেন। বাম বাহিনীকে পাঠালেন তার একদিন পর। আর অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে তিনি নিজে তৃতীয় দিন রওনা হলেন।

মারাদরোদে দুর্গপতির কাছে দশ হাজার সৈন্য ছিল। দুর্গপতি দুর্গের নিরাপত্তার সকল আয়োজন সম্পন্ন করে রেখেছে। তবে নগরীর নিরাপত্তা বিধান করা তার সাধ্যের অতীত বিধায় তার জন্য সে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ফলে নগরবাসী মহা ভাবনায় পড়ে গেল। তারা ভয়ে দুর্গে এসে আশ্রয় নিতে শুরু করল। কিন্তু দুর্গটি এত বড় নয় যে, নগরীর সব অধিবাসীকে আশ্রয় দিতে পারে।

অগত্যা দুর্গপতি দুর্গের ফটক বন্ধ করে দিল। তাতে নগরবাসী সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠল। যেহেতু সর্বত্র আগুনের মতো সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে যে, মুসলমানরা আসছে, তাই নগরী ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাওয়াও তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে।

কিন্তু সিদ্ধান্ত কিছু একটা নেওয়া তো দরকার। সেমতে নগরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ একত্র হয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, মুসলমানদের কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে নিরাপত্তা নেওয়া হবে। তারা একটি প্রতিনিধিদল গঠন করে প্রেরণ করেন। এরা সর্বপ্রথম অগ্রবাহিনীতে গিয়ে পৌঁছুল। সেখান থেকে তাদেরকে আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.)-এর নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

মারাদরোদের মজুসি প্রতিনিধিদল দেখল, মুসলমান নিম্নপদের হোক বা উচ্চপদের, সাধারণ সৈনিক হোক কিংবা অফিসার, সকলের পোশাক একরকম। তাদের মাঝে কোনো প্রকার ভেদাভেদ নেই। না নেতাসুলভ ঠাঁট আছে, না আড়ম্বরপূর্ণ সরঞ্জাম। সবাই শাদা পোশাক পরিহিত। সকলের তাঁবুতে কম্বলের বিছানা।

দৃশ্যটি তাদের কাছে ইসলামি সারল্যের সবাক্ প্রতিচ্ছবি মনে হলো। সেনাপতি শাদা পোশাক পরিধান করে একজন সাধারণ মানুষের মতো কম্বলের উপর বসে আছেন।

মুসলমানদের এই সরলতা লোকগুলোর উপর বিরাট প্রভাব ফেলল। তারা আহনাফ ইবনে কায়েসের নিকট নিরাপত্তার আবেদন জানাল। আহনাফ (রা.) বললেন, নিরাপত্তা পেতে হলে তোমাদেরকে আমাদের সঙ্গে সন্ধি করতে হবে। সন্ধির জন্য তিনটি শর্ত আছে। প্রথমত, তোমরা মুসলমান হয়ে যাও– আমাদের ভাই হয়ে যাও। তখন সরকার পরিচালনায়ও তোমাদেরকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত, যদি মুসলমান হতে সম্মত না হও, তাহলে জিযিয়া দাও। জিযিয়া

হলো নিরাপত্তাকর। এর বিনিময়ে আমরা তোমাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করব, শত্রুর হাত থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করব আর তোমরা স্বাধীনভাবে তোমাদের ধর্ম পালন করবে। তৃতীয়ত, যদি এই শর্তও মেনে নিতে সম্মত না হও, তা হলে তরবারির সিদ্ধান্ত মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে যাও।

প্রতিনিধিদল জিযিয়ার শর্ত মেনে নিল। দু-পক্ষে সন্ধি হয়ে গেল। সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করা হলো এবং প্রতিনিধিদল নগরীতে ফিরে এল। এই সন্ধিচুক্তিতে নগরবাসী খুব আনন্দিত হলো।

মারাদরোদের প্রতিনিধিদল যেদিন ফিরে এল, তার পরদিন থেকে ইসলামি বাহিনীর আগমন শুরু হয়ে গেল। নগরীর মজুসিরা এই বাহিনীকে স্বাগত জানাল।

এই দৃশ্য দেখে দুর্গের অধিবাসীরা খুবই অনুতপ্ত হলো। তারা বুঝে ফেলল যে, নগরবাসী মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করে নিয়েছে। ফলে তাদের মনোবল স্তিমিত হয়ে গেল। তা ছাড়া দুর্গের অধিপতি সম্রাট ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর প্রতি অসন্তুষ্টও ছিল। সে-কারণে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তার ইচ্ছেও হচ্ছিল না। সে দুর্গের অফিসার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শের জন্য তলব করল। সবাই সিদ্ধান্ত নিল, মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করে নেওয়া হোক।

দুর্গবাসীদেরও একটি প্রতিনিধিদল ইসলামি বাহিনীর সেনাপতি আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.)-এর নিকট এল এবং সন্ধির প্রস্তাব পেশ করল। আহনাফ (রা.) জিযিয়ার শর্তে তাদের সঙ্গেও সন্ধি করে নিলেন। মজুসিরা দুর্গের ফটক খুলে দিল। মুসলমানরা ইরানের এই ঐতিহ্যবাহী দুর্গটিও জয় করে নিল।

অল্প কদিনের মধ্যেই নগরবাসী ও দুর্গের অধিবাসীরা জিযিয়ার অর্থ পরিশোধ করে দিল। তারা ইসলামের শাসনের মাঝে শান্তিতে ও নিরাপত্তায় বসবাস রতে লাগল।

খোরাসান প্রদেশে মারাদরোদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল ছিল। এটি পদানত হওয়ায় খোরাসানের চাবি মুসলমানদের হাতে চলে এল। মহান আল্লাহ এই অঞ্চলটাকে কোনো রক্তপাত ছাড়া মুসলমানদের হাতে তুলে দিলেন। তাতে তারা যারপরনাই আনন্দিত হলো এবং মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করল।

চুয়াল্লিশ.

সাফওয়ান ভেবে কূল পাচ্ছিল না যে, পাহাড়ি মেয়েটিকে তার পিতা ও ভাই কীভাবে অচেনা-অজানা দুজন পুরুষের সঙ্গে আসবার অনুমতি দিল! তার ছাড়া মেয়েটি বেশ রূপসীও। দস্যু-তস্কররা এমন মেয়েদের সন্ধানেই তো ঘুরে বেড়ায়।

তিনজন পথ চলছে। মেয়েটি সাফওয়ান ও জামাসপকে আপন বানিয়ে নিয়েছে। রাতের বেলা বেশিরভাগ সময় তাদেরকে পাহাড়ি চটান বা গুহায় অতিবাহিত করতে হচ্ছে। সাফওয়ান ও জামাসপ মেয়েটির আরাম ও নিরাপত্তার প্রতি খুব লক্ষ্য রাখছে। যদিও পাহাড়ি মেয়েরা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ও নির্ভীক হয়ে থাকে।

সাফওয়ান তার জন্যও ঘোড়া প্রস্তুত করে নিয়েছিল। অশ্বারোহণে তার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সাফওয়ানকে বিস্মিত করে তুলল। একদিন সাফওয়ান বলল, আচ্ছা বোন, আজ বেশ কদিনই হলো তুমি আমাদের সঙ্গে আছ; অথচ আজ পর্যন্ত তোমার নামটা জানা হলো না। কী নাম তোমার?

মেয়েটি মুচকি হেসে বলল, নাম জানা খুব জরুরি নাকি?

সাফওয়ান বলল, একসঙ্গে যখন আছি, তা একে-অপরের নামটা তো অন্তত জানা থাকা দরকার।

মেয়েটি বলল, বোনের নাম জরিনা। ভাইয়ের নাম?

সাফওয়ান বলল, আমার নাম সাফওয়ান।

মেয়েটি জামাসপের দিকে তাকিয়ে বলল, আর ওই ভদ্রলোকের নাম কী?

জামাসপ বলল, আমার নাম জামাসপ।

জরিনা জিজ্ঞেস করল, আপনার বাড়ি কোথায়?

সহসা জামাসপের চেহারাটা মলিন হয়ে গেল এবং তাতে বিষণ্নতা ফুটে ওঠল। বলল, আমি যাযাবর, আমার কোনো ঠিকানা নেই!

জরিনা হেসে ওঠল। বলল, যাযাবর?

জামাসপ গম্ভীরমুখে উত্তর দিল, হ্যাঁ বেটী, আমি যাযাবর–ভবঘুরে।

জরিনা বলল, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি বোধহয় আপনার জীবনের কোনো বেদনার ইতিহাস স্মরণ করিয়ে আপনাকে কষ্ট দিয়ে ফেলেছি।

সাফওয়ান বলল, তুমি ঠিকই ধরেছ। তার একটি পুরনো ঘটনা মনে পড়ে গেছে। আমি আশা করি, আর কোনো প্রশ্ন করে তুমি তার ইতিহাসকে তাজা করবে না।

একদম না। বোকামি যতটুকু করেছি, তার জন্য খুব আক্ষেপ লাগছে।

আক্ষেপের কিছু নেই। আচ্ছা, একটা কথা বলবে জরিনা।

বলব বই কি।

তোমার পিতা ও ভাই আমাদের একজনকেও চেনেন না। তারপরও তোমাকে আমাদের সঙ্গে আসতে দিলেন। কী বুঝে দিলেন?

হঠাৎ জরিনার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বিমর্ষ মুখে বলল, এর কী উত্তর দেব আমি তোমাকে।

আমিও সম্ভবত কথাটা জিজ্ঞেস করে তোমাকে কষ্ট দিয়ে ফেলেছি। ঠিক আছে, এর কোনো উত্তর তোমাকে দিতে হবে না।

জরিনা বলল, প্রশ্ন যখন করে ফেলেছ, উত্তর আমি দেব। আগেও কিছুটা বলেছি। ব্যাপার হলো, এ-অঞ্চলের মানুষ মেয়েদেরকে ভালো বোঝে না। অথচ মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি কাজ করে। আমাদেরকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। আমিও একবার নিলামে ওঠেছিলাম। ওরা পঞ্চাশটি ভেড়া দাম হেঁকেছিল। এক বৃদ্ধ সওদাগর এই দাম দিতে সম্মতও হয়েছিল। ক্রয়-বিক্রয় ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখন সে ভেড়া নিয়ে এল, তখন পালের অর্ধেক পশু ছিল বৃদ্ধা ও অকর্মা। সে-কারণে এই সওদা আর হয়নি।

সাফওয়ান কথা কেটে বলল, এই সওদাগর কীসের ব্যবসা করত?

জরিনা বলল, দাস-দাসীর। কয়েক বছর আগেও কদিন পর-পরই সওদাগররা আসত। এসে সুন্দরী মেয়েদেরকে চড়া দামে কিনে নিয়ে যেত। পাহাড়ি লোকেরা বিনিময়ে ছাগল-ভেড়া গ্রহণ করত– নগদ অর্থ নিত না। এই ক-বছর হলো সওদাগররা আসে না।

সাফওয়ান বলল, মনে হয় এখন আর সুন্দরী মেয়েদের প্রয়োজন পড়ে না।

জরিনা পোড়খাওয়া অভিজ্ঞজনের মতো বলল, পুরুষের জন্য রূপসী নারী হলো খেলনা। আর সুদর্শন খেলনার প্রয়োজনীয়তা সব সময়ই থাকে।

সাফওয়ান বলল, তাহলে সওদাগররা আসা বন্ধ করে দিল কেন?

জরিনা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, বড়-বড় যেসব শহরে নারীর হাট বসত, শুনেছি মুসলমানরা সেগুলো দখল করে নিয়েছে। ফলে এই বাণিজ্য মন্দা হয়ে গেছে।

সাফওয়ান বুঝল, জরিনা এই ব্যবসাটিকে খুবই খারাপ মনে করে।

সাফওয়ান বলল, তুমি যদি পিতা-মাতার কাছে থাকতে, তাহলে তো তোমার বিনিময়ে তারা চাহিদাসংখ্যক বকরি পেয়ে যেত।

জরিনা বলল, তারা এর চেয়েও বেশি পেয়ে গেছে

কীভাবে? সাফওয়ান বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

জরিনা উত্তর দিল, তুমি দস্যুদের হাত থেকে যে ভেড়া-বকরিগুলো রক্ষা করেছ, সেগুলোর সংখ্যা দুশোরও বেশি। যদি তুমি ওদের সঙ্গে লড়াই না করতে, তাহলে ওরা আমাকে ও পশুগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে যেত।

সাফওয়ান বলল, ভাগ্য যদি সহায়তা করে, আল্লাহ যদি আমাকে আমার লক্ষ্যে সফল করেন আর এই অঞ্চলের উপর মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে তোমার সুখ ও সম্মানের জীবন শুরু হয়ে যাবে।

জরিনা বলল, তোমার সঙ্গে আমার এখনও কোনো কষ্ট নেই।

সাফওয়ান বলল, সম্ভাবনা আছে, আগামীতে এর চেয়েও বেশি কষ্ট ভোগ করতে হবে।

জরিনা বলল, যত কষ্টই ভোগ করতে হয় আমি খুশীমনে সব বরণ করে নেব। যদি জীবন দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তাতেও পরোয়া করব না।

সাফওয়ান বলল, তুমি খুব নির্ভীক ও কষ্টসহিষ্ণু মেয়ে। আমার খুব আনন্দ লাগছে যে, আমার বোনও আমারই মতো।

জরিনা মুচকি হেসে বলল, মানে তুমিও কষ্টসহিষ্ণু। আর কী-কী?

সাফওয়ান বলল, আমার বোন যখন অমন, তাহলে আমিও তেমন।

জরিনা বাস্তবিকই নির্ভীক ও কষ্টসহিষ্ণু মেয়ে। এখন তার মধ্যে এই চেতনাও জন্মে গেছে যে, যে-কোনোভাবে সম্ভব হোক আরব মেয়েটিকে খুঁজে বের করতে হবে, সাফওয়ান যার অনুসন্ধান করছে। সে আফীরা, ফায়রোজান ও তার সঙ্গীদের দেখেছে।

যখনই কোনো পথিক বা জনবসতি সামনে পড়ছে, জরিনা ও জামাসপ তাদেরকে জিজ্ঞেস করে-করে আফীরার তথ্য নিচ্ছে। একাধিক সূত্রে যা জানা গেল, তাতে বোঝা গেল, ওরা বলখের দিকেই গেছে।

বলখ একটি প্রসিদ্ধ নগরী। এমন একস্থানে অবস্থিত, যেখান থেকে তুর্কিস্তান ও চীনের সীমান্ত একেবারে কাছে।

এরা বলখ পৌঁছে গেল। জরিনা সাফওয়ানকে বলে রেখেছে, তুমি কারও সঙ্গে কথা বোলো না। মজুসিরা যদি জানতে পারে তুমি মুসলমান, তাহলে তিজনকেই মেরে ফেলবে বা গ্রেফতার করবে।

সাফওয়ান মুখে পট্টিটা বেঁধে নিয়েছে। সাফওয়ান ও জামাসপ একজনও এর আগে না বলখ এসেছে, না এই নগরীটি চোখে দেখেছে, না এর অলি-

গলি সম্পর্কে অবগত আছে, না এখানকার কাউকে তারা চেনে। অবশ্য জরিনা বছরকয়েক এখানে থেকেছে। মেয়েটি এখানকার কয়েকজন নারী ও পুরুষকে চেনে। ঘটনাচক্রে পথে তার এক বান্ধবীকে পেয়ে গেল। মেয়েটির নাম পারভিন। পারভিন জরিনার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। দেখামাত্র পারভিন জরিনাকে জড়িয়ে ধরল এবং তার ঘরে মেহমান হওয়ার আমন্ত্রণ জানাল।

জরিনা বলল, আমার সঙ্গে এরাও দুজন আছে।

পারভিন বলল, অসুবিধা নেই। আমার ঘর অনেক বড়। আমি আমার বান্ধবীর সঙ্গীদেরও খোশ আমদেদ জানাচ্ছি।

জরিনা বলল, চলো যাই। ঘরে গিয়ে আগে শোনো আমরা এখানে কেন এসেছি। তারপর যদি আমাদেরকে ঘরে জায়গা দিতে রাজি হও, তাহলে আমরা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হব।

পারভিন সাফওয়ানের প্রতি তাকিয়ে বলল, তুমি বোধহয় একে লুকোতে চাচ্ছ। এ তো আমাদের জাতি ও আমাদের দেশের মানুষ নয়। মুসলমানদের গুপ্তচর মনে হয়। তা-ই যদি সত্য হয়, তাহলে আমার ঘর অপেক্ষা এর ভালো আশ্রয় আর হতে পারে না।

জরিনা বলল, এ গোয়েন্দা নয়। চলো যাই।

পারভিন জরিনাদের নিয়ে রওনা হলো এবং ঘরে গিয়ে পৌঁছুল। তার ঘরটা নগরীর নিরাপত্তা-প্রাচীরের কাছে সাধারণ বসতি থেকে দূরে আলাদা। সংসারে একমাত্র বৃদ্ধ পিতা ছাড়া আর কেউ নেই। বৃদ্ধ খুবই ভদ্র মানুষ। কাপড়ের ব্যবসা করেন। নগরীর সম্মানিত ব্যক্তিদের একজন। তিনিও মেহমানদের স্বাগত জানালেন। ঘোড়াগুলোকে নিয়ে আস্তাবলে বাঁধলেন এবং তাদের কুশল জিজ্ঞেস করলেন।

পারভিন ও তার পিতা মেহমানদেরকে ভেতরে একটি কক্ষে নিয়ে বসাল। জরিনা আফীরার অপহরণ, সাফওয়ান ও জামাসপের তার অনুসন্ধানে আসা এবং স্বয়ং তাকে দস্যুদের হাত থেকে রক্ষা করার সব কাহিনী শোনাল। পারভিন বলল, খুবই ভালো হলো যে, তোমরা আমাকে পেয়ে গেছ। ওই মেয়েটি কোথায় আছে, আমি জানি। তার অনুসন্ধানে আমি তোমাদের সাহায্য করব। সাফওয়ানের ঘর থেকে বের হওয়া চলবে না। তার জন্য বিরাট ঝুঁকি আছে। শাহেনশাহ ইয়ায্দাজার্দ মারাদরোদ থেকে এখানে এসেছেন। এই অঞ্চলের মানুষ মুসলমানদের প্রতি বেজায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেছে।

সাফওয়ান তথ্য পেল, ইয়ায্‌দাজার্‌দ পালিয়ে এখানে চলে এসেছে। একটি বিষয়ে সে ভীষণ আনন্দিত হলো যে, পারভিন জানে, আফীরা কোথায় আছে। সাফওয়ান ও জামাসপ জরিনার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ যে, তার সুবাদে তারা বলখে চমৎকার একটি আশ্রয় পেয়ে গেছে। আর এমন একটি মেয়ে তাদের হাতে এসেছে, যে তাদেরকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

পঁয়তাল্লিশ.

মারাদরোদ রক্তপাত ছাড়া মুসলমানদের দখলে এসে পড়েছে। তার আশপাশের সব কটি নগরী ও বসতির অধিবাসীরা মুসলমানদের আনুগত্য বরণ করে নিয়েছে। প্রতিটি শহর ও গ্রামাঞ্চলের মানুষ জিযিয়ার শর্ত মেনে নিয়েছে।

মুসলমানরা যেসব অঞ্চলের উপর দখল প্রতিষ্ঠিত করত, সেসব অঞ্চলে অর্থ ও ফৌজদারি আদালত প্রতিষ্ঠা করে উক্ত অঞ্চলেরই কিছু যোগ্য ব্যক্তিকে বিচারক নিযুক্ত করে দিত। তবে আপিল আদালতে কোনো অমুসলিমকে নিয়োগ দিত না, যাতে নিম্ন আদালতে যদি কোনো অবিচার হয়ে যায়, তাহলে আপিল আদালত যেন সুবিচার নিশ্চিত করতে পারে।

এসব আদালতে যেসব আইন প্রয়োগ করা হতো, তা এমন কোমল ও সহনীয় হতো যে, প্রতিজন মানুষ তা দ্বারা উপকৃত হতে পারত। মুসলমানরা বিগত কালের অবিচারমূলক সকল আইন রহিত করে দিত। ফলে জনগণ মুসলমান ও ইসলামি সরকারের সমর্থক, হিতকামী ও সহযোগী হয়ে যেত।

বিজিত অঞ্চলে মুসলমানরা বিগত দিনের সব ধরনের কর মওকুফ করে দিত, যা আদায় করতে-করতে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষ নিঃস্ব হয়ে যেত। শুধু জিযিয়া নামক এক ধরনের কর উসুল করা হতো। জিযিয়া এমন এক সামান্য কর, যা সব শ্রেণীর মানুষ অনায়াসে আদায় করতে সক্ষম হতো।

এসব কারণে মুসলমানদের বিজিত অঞ্চলের অমুসলিম নাগরিকরা ইসলামি সরকারকে করুণা ও আশীর্বাদ মনে করত। তারা হৃদয়ের সুষমা ঢেলে প্রার্থনা করত, যেন এই সরকার আজীবন বহাল থাকে।

অনেক সময় এমনও হতো যে, মানুষ স্বপ্রণোদিত হয়ে খুশীমনে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে ইসলামি বাহিনীর সাহায্যার্থে স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরত। মুসলমানের দলে যোগ দিয়ে আপন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত।

মারাদরোদের দখল সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং তার সরকার কাঠামো সুসংহত করে আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) বলখের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এখন খোরাসানে একমাত্র বলখই এমন একটি অঞ্চল অবশিষ্ট রয়ে গেল, যেখানে দুশমন ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে এবং ইয়ায্‌দাজার্‌দ তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে অবস্থান করছে। এটিই ইরানের সর্বশেষ অঞ্চল, যেটি মুসলমানদের এখনও দখলে আসেনি।। মুসলমানরা পুরোপুরি নিশ্চিত যে, ইয়ায্‌দাজার্‌দ বলখে অবশ্যই মোকাবেলায় অবতীর্ণ হবে। এটিই তার শেষ ভরসা, শেষ অবলম্বন ও শেষ আশ্রয়।

আহনাফ ইবনে কায়েস গোয়েন্দাদের মাধ্যমে তথ্য জেনেছেন, বলখে মজুসিদের প্রায় সত্তর হাজার সৈন্য আছে। বিপরীতে তাঁর সৈন্য মাত্র দশ হাজার। এই স্বল্পসংখ্যক সৈনিক মজুসিদের পাষাণহৃদয় বিশাল সেনাবাহিনীর মোকাবেলায় কিছুই নয়। সাতের বিপরীতে এক। একের মোকাবেলায় সাত।

কুফা থেকে সহযোগী বাহিনী রওনা হয়েছে বটে; কিন্তু এখনও তাদের একটি ইউনিটও এসে পৌঁছায়নি। তাই বলে সহযোগী বাহিনীর অপেক্ষায় মারাদরোদের সেনাছাউনিতে বসে থাকা আহনাফ ইবনে কায়েসের বীরত্বপূর্ণ স্বভাব সমর্থন করে না। তাঁর ভালোভাবেই জানা আছে, অব্যাহত পরাজয়ের কারণে মজুসিদের অন্তরে মুসলমানদের ভয় ধরে গেছে। মারাদরোদে দীর্ঘ অবস্থানের ফলে এই ভীতি কমে যেতে পারে। তাই তিনি বিলম্ব করা সমীচীন মনে করছেন না। তিনি মনে-মনে বলখ অভিমুখে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। কিন্তু কৌশলগত কারণে বাহিনীর সেনা-অফিসারদের সঙ্গে এ-বিষয়ে পরামর্শ করা আবশ্যক মনে করলেন। একদিন ছোট-বড় সকল অফিসারকে নিজের তাঁবুতে ডেকে পরামর্শে বসলেন। তিনি বললেন–

'আপনারা সকলেই জানেন যে, ইয়ায্‌দাজার্‌দ এখান থেকে পালিয়ে বলখ চলে গেছে। তার কাছে সত্তর হাজার সৈন্য আছে। সেখানে তার বাহিনী ও জনসাধারণ মন খুলে মোকাবেলা করবে। বিপরীতে আমাদের সৈন্য খুবই কম। এমতাবস্থায় আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন, আমরা বলখের উদ্দেশ্যে যাত্রা করব, নাকি সহযোগী বাহিনী এসে পৌঁছা পর্যন্ত অপেক্ষা করব।'

আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) সকল অফিসারের প্রতি তাকালেন। সবাই

নীরব এবং পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। বেশকিছু সময় এই নীরবতার মধ্যে কেটে গেল। কেউ কোনো কথা বলল না। অবশেষে আহনাফ (রা.) পুনরায় বললেন, তাহলে কি আমি ধরে নেবে, আপনারা কেউই সার্থক পরামর্শ দিতে সক্ষম নন?

এবার এক অফিসার মুখ খুলল। বলল, আমার মতে আমরা সবাই এজন্য নীরব রয়েছি যে, মহামান্য সেনাপতি যদি কিছু একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়ে থাকেন, তাহলে পরামর্শ দেওয়া ঠিক হবে না। আর যদি কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন।

আহনাফ (রা.) বললেন, আমি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি।

উক্ত অফিসার বললেন, আমার অভিমত হলো, আমাদেরকে এখানে বসে থাকা ঠিক হবে না। অন্যথায় দুশমন মনে করবে, আমরা ভয় পেয়ে গেছি। কাজেই কালবিলম্ব না করে আমাদের অগ্রযাত্রা শুরু করে দেওয়া দরকার। তবে সফরের গতি হবে ধীর, যাতে কিছু-না-কিছু সহযোগী ইউনিট এসে পৌঁছুতে পারে।

আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) বললেন, আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আপনি আমার অভিমতের অনুরূপ পরামর্শই দিয়েছেন।

আরেক অফিসার বলল, এই মত আমারও। কিন্তু তাতে আমি এটুকু যোগ করতে চাই যে, যে-সহযোগী ইউনিটগুলো আসছে, তাদের কাছে নির্দেশনা প্রেরণ করা হোক, যেন তারা তাড়াতাড়ি চলে আসে।

আরেক অফিসার বলল, আমারও এই অভিমত।

আরেকজন বলল, আমি মনে করি, পরামর্শে দূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হয়নি। সহযোগী বাহিনী কী পরিমাণ আসছে, তা আমাদের জানা নেই। আমরা যদি অগ্রযাত্রা শুরু করি আর মাঝপথে চার হাজার সহযোগী সৈন্য এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়, তারপরও কি আমরা মজুসিদের মোকাবেলার যোগ্য হব? আমি মনে করি, হব না। কারণ, বলখে মজুসিরা শেষ যুদ্ধ লড়বে এবং জীবনের বাজি লাগাবে। আমরা যদি এই যুদ্ধে পরাজিত হই, তাহলে পরিস্থিতি মোড় ঘুরে দাঁড়াবে। আমাদের এতগুলো জয় হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাছাড়া আমীরুল মুমিনীনের কাছে আমরা মুখ দেখাতে পারব না। তাই আমার অভিমত হলো, সহযোগী বাহিনী এসে পৌঁছা পর্যন্ত আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। যদি সহযোগী সৈন্য কম আসে, তাহলে দরবারে-খেলাফতে আরও সাহায্যের আবেদন পাঠাতে হবে।

আরেক অফিসার বলল, আপনি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। আপনার মতামতে যুক্তিও আছে। তবে এই চিন্তা-চেতনা ইসলামি ভাবধারা ও ইতিহাসের পরিপন্থী। আজ পর্যন্ত যেসব অমুসলিমের সঙ্গে মুসলমানদের মোকাবেলা হয়েছে, তাতে সংখ্যার কোনো সমতা ছিল না। প্রতিটি যুদ্ধই অসম হয়েছে। মুসলমান এই সমতায় বিশ্বাসও করে না যে, সংখ্যার স্বল্পতা ও আধিক্যের উপর জয়-পরাজয় নির্ভরশীল হবে। মুসলমান বিশ্বাস করে, জয়-পরাজয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আল্লাহ যাকে খুশি জয়, যাকে খুশি পরাজয় দান করেন।

আমাদের ভরসা একমাত্র আল্লাহরই উপর। তাঁরই সাহায্যের উপর নির্ভর করে আমরা যুদ্ধ করি। কাজেই আমার অভিমত হলো, বলখ অভিমুখে ধীরগতিতে অগ্রযাত্রা করা হোক এবং সহযোগী বাহিনীর কাছে দূত প্রেরণ করে আবেদন জানানো হোক, যেন তারা তাদের গতি বাড়িয়ে দেয় এবং দ্রুত এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়।

চতুর্থ অফিসার বলল, কিন্তু তখন যদি কোনো বিরূপ ফল ফলে আর তার জন্য আমীরুল মুমিনীন ভর্ৎসনা করেন, তার কী উত্তর হবে?

পঞ্চম অফিসার বললেন, আমীরুল মুমিনীনকেও বিস্তারিত লিখে একজন দূত প্রেরণ করা হোক। তাতে লিখতে হবে, বিলম্ব করলে মজুসিদের সাহস ও সেনাসংখ্যা বেড়ে যাওয়া আশঙ্কা ছিল। তাই আমরা সহযোগী বাহিনীর এসে পৌঁছার অপেক্ষা করিনি।

সবাই এই অভিমতের উপর একমত হয়ে গেল। আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম, তুমি সঠিক পরামর্শ দিয়েছ। আমিও এ-চিন্তাই করেছিলাম। কিন্তু আপনাদের উপর সিদ্ধান্ত চাঁপিয়ে না দিয়ে সকলের সঙ্গে পরামর্শই করে নিলাম। পরামর্শের মাধ্যমে আমি আপন মতের অনুকূর-প্রতিকূল সব অভিমত জেনে নিলাম। অবশেষে সকলে একটি মতের উপর একমত হলাম। আল্লাহ আমাদের সিদ্ধান্তে বরকত দান করুন।

পরামর্শ বৈঠক মুলতবি হয়ে গেল। পরদিন সেনাপতি আহনাফে (রা.) রওনার ঘোষণা করিয়ে দিলেন। মারাদরোদ অবস্থানের জন্য পাঁচশো মুজাহিদকে আলাদা করে নিলেন। অবশিষ্ট সৈন্য রওনার প্রস্তুতি শুরু করে দিল।

মারাদরোদের মজুসিরা কল্পনাও করেনি যে, মুসলমানরা এত অল্প কজন সৈন্য নিয়ে অভিযানে রওনা হবে। কিন্তু যখন শুনল, মুস্লমানরা রওনা হচ্ছে, তখন তাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

অবশেষে একদিন ইসলামি বাহিনী বলখের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। প্রথমে অগ্রবাহিনী যাত্রা শুরু করল। তারপর কাল্‌ব এগোতে লাগল। তারপর সাকা রওনা হলো। সাকা ও কালবের মধ্যখানে একটি ইউনিটের সঙ্গে আরবের নারীদের রাখা হলো।

বাহিনী অগ্রসর হচ্ছে খুবই মন্থর গতিতে। কিন্তু ইতিমধ্যে তাদের অগ্রযাত্রার সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর গোয়েন্দাদের কানেও খবর গেল। কিন্তু তাদের বিশ্বাস হলো না। পরে যখন গোপনে তথ্য নিল, তখন তারা শিউরে ওঠল। ইয়ায্‌দাজার্‌দকে এই অভিযানের সংবাদ জানাতে তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠল।

মুসলমানরা এখনও দুই মনযিল পথ অতিক্রম করেনি। ইতিমধ্যে পাঁচ হাজার সৈন্যের একটি সহযোগী বাহিনী এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হলো। দুই খ্যাতনামা সেনা-অফিসার আলকামা ইবনুন-নায্‌রি ও রিব্‌য়ী ইবনে আমের আত-তামীমি তাদের সঙ্গে আছেন। এই বাহিনীটিকে পেয়ে মুসলমানরা খুব খুশি হলো।

ছেচল্লিশ.

পারভিন মেয়েটি যদিও রূপরানী নয়,তবে সুন্দরী বটে। শরীরের আকার-গঠন খুবই চমৎকার। এমন মেয়েরা বেশ চঞ্চল ও প্রাণবন্ত হয়ে থাকে। পারভিনও খুব চঞ্চল মেয়ে।

একদিন পারভিন জরিনাকে উদ্দেশ করে বলল, জরিনা, তোমার সেই বুড়োটা তোমার বিরহে এখনও কাতরায়।

জরিনা হেসে বলল, বেটা এখনও বেঁচে আছে?

শুধু বেঁচে আছে নয়– এখন আগের চেয়ে অনেক টনটনে হয়ে গেছে। একদিন আমার সঙ্গে চলো; দেখবে, তোমাকে কত খাতির-যত্ন করে।

আমি যাব কেন ওর কাছে?

যেতে তো হবেই। এখন তো তুমি পরীর চেয়েও বেশি সুন্দরী হয়ে গেছ। এখন তোকে দেখে বৃদ্ধ তার সমস্ত ধন-ঐশ্চর্য তোমার পায়ের উপর ঢেলে দেবে।

তার কোনো সম্পদের প্রয়োজন নেই আমার।

তোমার তার সম্পদের প্রয়োজন নেই বটে; কিন্তু তার তো তোমাকে প্রয়োজন আছে।

এজন্যই তো লোকটা আব্বাজানকে ঋণের জালে ফাঁসিয়েছিল। এখন কী ফাঁদ আছে তার?

এখন সে শাহেনশাহ ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর অনুচর।

হোক গে। ওসবে আমার কিছু যায়-আসে না। আচ্ছা, তুই তো আফীরার কোনোই খোঁজ নিস্‌নি।

নেইনি মানে? তোমার বৃদ্ধের উল্লেখ কেন করলাম?

কেন করেছ?

ফায়রোজান তারই বাড়িতে এসে ওঠেছে।

দুজন কক্ষে বসে কথা বলছিল। ফায়রোজানের উল্লেখ শুনে সাফওয়ানও এখানে এসে পড়ল। জিজ্ঞেস করল, কী বললে? কার বাড়িতে ওঠেছে?

পারভিন উত্তর দিল, ফারাওয়ান্দার বাড়িতে।

ফারাওয়ান্দা কে?

জরিনাকে জিজ্ঞেস করো। পারভিন জরিনার প্রতি তাকিয়ে চঞ্চল মুখে বলল।

জরিনা বলল, সেই বৃদ্ধ ধনবান লোকটি, যার বাড়িতে আমি নিষ্পেষিত হয়েছিলাম।

সাফওয়ান চমকে উঠে বলল, কী! কী বললে! আফীরাও কি ওখানে আছে?

পারভিন বলল, আমি আফীরাকে ওখানে দেখিনি।

সাফওয়ান বলল, কিন্তু ফায়রোজান যখন ওখানে অবস্থান নিয়েছে, তখন আফীরাও ওখানেই আছে নিশ্চয়ই।

পারভিন বলল, ফারাওয়ান্দা রূপের পুজারি। সেজন্য ধারণা করা যায়, ফায়রোজান আফীরাকে ওখানে রাখেনি।

ঠিক এ-সময় জামাসপ এসে উপস্থিত হলো। তার চেহারা প্রমাণ করছে, সে গুরুত্বপূর্ণ কোনো সংবাদ নিয়ে এসেছে এবং তা শোনানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে।

সাফওয়ান তার মুখপানে তাকিয়ে বলল, তুমি নিশ্চয়ই কোনো সংবাদ নিয়ে এসেছ?

জামাসপ বলল, হ্যাঁ, আমি একটি সংবাদ নিয়ে এসেছি। আমি ফায়রোজানকে দেখেছি। দেখে আমি তার পিছু নিয়েছিলাম। কিন্তু সে একস্থানে এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল, যেন হঠাৎ ভূমি তাকে গিলে ফেলেছে!

সাফওয়ান বলল, তুমি তো তাকে মোটে দেখেছ। পারভিন জানে, এখানে সে কোথায় ওঠেছে।

জামাসপ বিস্মিত হলো। বলল, তুমি ফায়রোজানকে চিনলে কী করে?

পারভিন বলল, ঘটনাচক্রে। আমি না ফায়রোজানকে চিনতাম, না আফীরাকে। একদিন আমি বাড়ি ফিরছিলাম। সে-সময় কয়েকজন ইরানিকে ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখলাম। তাদের সঙ্গে একটি মেয়ে ছিল। পরীর মতো চেহারা। তাকে খুবই চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছিল। আমাদের দেশের মেয়ে মনে হলো না। পোশাকও ছিল আমাদের চেয়ে ভিন্ন ধরনের এবং বিস্ময়কর। আমি বুঝে ফেললাম, ওরা একে কোথাও থেকে অপহরণ করে এনেছে। কোনো কারণ ছাড়াই আমার মনে তার প্রতি সমবেদনা জেগে গেল। তারা চলে গেল আর আমিও বাড়িতে ফিরে এলাম। কিছুদিন পর এক প্রয়োজনে আমি ফারাওয়ান্দার বাড়ির ওদিকে গেলাম। আমি সেই বাড়ি থেকে দুই ব্যক্তিকে বের হতে দেখলাম। আমি তাদেরকে চিনে ফেললাম। এদেরকেই আমি মেয়েটির সঙ্গে দেখেছিলাম। আমি বুঝে ফেললাম, এরা ফারাওয়ান্দার বাড়িতে ওঠেছে। এ-কারণে যখন জরিনা আফীরার কথা উল্লেখ করেছিল, তখন আমি বলেছিলাম, আমি জানি, সে কোথায় আছে। পরে একদিন আমি ওপথে আসছিলাম। ফারাওয়ান্দা এক ব্যক্তিকে ফায়রোজান বলে ডাক দিল। আমি মোড় ঘুরিয়ে তাকালাম। দেখে চিনে ফেললাম, এ তো আরব মেয়েটির সঙ্গে এসেছিল। এভাবে আমি ফায়রোজানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি।

জামাসপ জিজ্ঞেস করল, ফারাওয়ান্দার বাড়ি কোনটি?

পারভিন বলল, তুমি এখানকার এলাকা ও অলি-গলি চেন না। তাই আমি যদি বলিও, তুমি চিনবে না। আমার সঙ্গে চলো; আমি বাড়িটা দেখিয়ে দিই।

জরিনা বলে উঠল, ওর যাওয়া ঠিক হবে না।

পারভিন বলল, সবচেয়ে ভালো হবে তুমি আমার সঙ্গে চলো।

জরিনা বলল, যাব।

সাফওয়ান বলল, সবকিছু জানা থাকা সত্ত্বেও একে তুমি ফারাওয়ান্দার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাচ্ছ পারভিন?

পারভিন বলল, কেন, সে এই পরীটাকে ভর্তা বানিয়ে খেয়ে ফেলবে নাকি?

সাফওয়ান বলল, আচ্ছা, আমি এখানে এভাবে আর কতদিন লুকিয়ে বসে থাকব?

পারভিন বলল, মনে করো, এই নগরীর শুধু মানুষই নয়– দরজা-জানালাও তোমার শত্রু।

সাফওয়ান বলল, আমি তা বুঝি। কিন্তু এতদিনে আমি হাঁপিয়ে ওঠেছি।

পারভিন বলল, আফীরার সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত লুকিয়েই থাকতে হবে।

সাফওয়ান বলল, যাহোক, তোমরা ফারাওয়ান্দার বাড়িতে কখন যাবে?

পারভিন বলল, জরিনা যখন যায়।

জরিনা বলল, চলো, আমি এখনই যেতে প্রস্তুত আছি।

পারভিন বলল, হাত-পা ধুয়ে পোশাক বদল করো। সাজগোজ করে নাও। তারপর চলো।

পারভিন জরিনাকে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর যখন দুটি মেয়ে সেজে-গুজে এল, তখন জরিনাকে ঠিক অপ্সরীর মতো মনে হলো।

সাফওয়ান ও জামাসপ তাদের অপেক্ষা করতে লাগল। দুপুরের সময় দুজন ফিরে এল। এসেই পারভিন বলল, বড় অঘটন ঘটে গেছে!

সাফওয়ান ভয় পেয়ে গেল। মনে করল, আফীরার কোনো বিপদ হয়ে গেছে। শঙ্কিতমুখে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে?

পারভিন বলল, মুসলমানরা আক্রমণ করতে-করতে এগিয়ে আসছে।

সাফওয়ান স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, আল্লাহর শোকর!

সাফওয়ানের প্রতিক্রিয়ায় পারভিন বিস্মিত হলো। বলল, এই খবরে তুমি খুশি হয়েছ মনে হয়?

সাফওয়ান বলল, সংবাদটা খুশিরই বটে। ইয়ায্‌দাজার্‌দ এখানে আছেন কিনা তাই।

পারভিন বলল, এ-কথার অর্থ কী? তুমি কী বোঝাতে চাচ্ছ?

সাফওয়ান কিছু বলতে-বলতে থেমে গেল। সে বলতে চাচ্ছিল, ইয়ায্‌দাজার্‌দ এখানে আছে। মুসলমানরা এসে হয় তাকে মেরে ফেলবে নতুবা গ্রেফতার করে নেবে। কিন্তু সহসাই তার মাথায় চিন্তা এল, পারভিন মজুসি আর ইয়ায্‌দাজার্‌দ মজুসিদের সম্রাট। হতে পারে বিষয়টি তার কাছে অপ্রীতিকর ঠেকবে আর তাতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠবে। কিন্তু সাফওয়ান মিথ্যাও তো বলতে পারে না। তাই বলল, বলতে চেয়েছিলাম, ইয়ায্‌দাজার্‌দ যেহেতু এখানে আছেন, তাই মুসলমানরা এসে পড়লে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে। তখন আল্লাহ্ যাকে খুশি বিজয় দান করবেন আর যাকে খুশি পরাজিত করবেন।

পারভিন বলল, তোমার এ-ধরনের কথা না বলা উচিত। মনে রাখতে হবে, ইয়ায্‌দাজার্‌দ আমাদের সম্রাট।

সাফওয়ান বলল, আমি সাবধান থাকব। আচ্ছা, আফীরার কোনো সন্ধান পেয়েছ কি?

এ-মুহূর্তে নগরীতে ও নগরবাসীদের মনে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে। সর্বত্র এক ধরনের ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে।

ফারাওয়ান্দা-ফায়রোজানও ভীত হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় আমাদের পক্ষে আফীরার সন্ধান বের করা সম্ভব হয়নি। তবে আমার মনে হয়, সে ফারওয়ান্দার বাড়িতেই আছে; কিন্তু বাইরে আসা-যাওয়া করে না। মুসলমানরা খুব কাছাকাছি চলে এসেছে।

কত কাছে?

এ-তথ্য কেউ জানাতে পারেনি যে, মুসলমানরা কত কাছে চলে এসেছে। শুধু এটুকু জানতে পেরেছি যে, তারা খুব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে।

সাফওয়ান বলল, আমাকে ফারাওযান্দার বাড়িটা একটু দেখিয়ে দেবে?

ওই তো সামান্য দূরে।

আমি সেই বাড়িটি চিনে রাখতে চাই, আফীরা যেখানে গৃহবন্দি হয়ে আছে।

আমি নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু ভয় করছি, কেউ তোমাকে দেখে ফেলে কিনা। দেখলে তো সমস্যা হয়ে যাবে।

জামাসপ বলল, আমি যাব তোমাদের সঙ্গে।

পারভিন বলল, ঠিক আছে, আমি তোমাদের নিয়ে যাব। তবে তোমাকে ওয়াদা দিতে হবে সাফওয়ান, বাড়িটি দেখে তুমি ক্ষুব্ধ হয়ে অস্বাভাবিক কোনো আচরণ করবে না।

সাফওয়ান বলল, আমি ওয়াদা দিলাম।

জামাসপ বলল, আজই যদি দেখিয়ে আন, তাহলে ভালো হবে।

পারভিন বলল, আজই চলো।

রাতের বেলা সাফওয়ান ও জামাসপ পারভিন ও জরিনার সঙ্গে বেরিয়ে গেল। কয়েকটি গলি ও রাস্তা অতিক্রম করে তারা এক চৌরাস্তায় গিয়ে উপনীত হলো। পারভিন বড় একটি প্রাসাদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলল, এটি ফারাওয়ান্দার বাড়ি।

সাফওয়ান ও জামাসপ বাড়িটির চারদিকে চক্কর লাগাল। একটি বহুতল আলিশান ভবন।

তারা চাঁদের আলোয় বাড়িটি ভালোভাবে দেখে নিল এবং নিরাপদে ফিরে এল। ভাগ্য ভালো ছিল যে, কেউ তাদের দেখেনি।

সাতচল্লিশ

ইয়ায্‌দাজার্‌দ বলখে চলে এসেছিলেন। তার সঙ্গে ছিল বিপুলসংখ্যক সৈনিকের বিশাল এক বাহিনী। দুর্গে অত জায়গা নেই যে, তাতে এত মানুষের ঠাঁই হতে পারে। তাই গোটা বাহিনী দুর্গের বাইরে বিস্তীর্ণ এক মাঠে ছাউনি ফেলে অবস্থান গ্রহণ করল। ইয়ায্‌দাজার্‌দ, তার সহচরবৃন্দ ও উপদেষ্টামণ্ডলি দুর্গের ভেতরে বিভিন্ন মহলে অবস্থান নিয়েছেন। যেহেতু বলখের অবস্থান মারাদরোদ থেকে অনেক দূরে এবং অঞ্চলটি নিরাপদ ও শক্তিশালী, তাই সম্রাট, তাঁর সহচর, উপদেষ্টা, অফিসার ও সৈনিক সবাই চিন্তামুক্ত হয়ে গেছেন। এখানেও উৎসব-আনন্দের আসর শুরু হলো।

বড়রা যা করে, দেখাদেখি ছোটরাও তাতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এটিই জগতের সাধারণ নিয়ম। তাই শাসকদের অনুসরণে বলখের জনসাধারণও নাচ-গান ও মদ-নারীতে মেতে ওঠল। মানুষ ভোগ-বিলাসিতায় ডুবে গেল। কিন্তু এই একতারা-দোতারা, ঢোল-তবলা আর নূপুর-নিক্কনের সুর-ঝংকার বেশিদিন গুঞ্জরিত হতে পারল না। এরই মধ্যে গোয়েন্দারা উৎসবের আসরগুলোকে ম্লান ও নিস্তেজ করে দিল। আনন্দের মুহূর্তগুলোকে বিষাদের কালো ছায়ায় পরিণত করে দিল।

গোয়েন্দারা সংবাদ নিয়ে এল, মুসলমানরা ধেয়ে আসছে।

একটিমাত্র সংবাদের তারা সবকিছু এলোমেলো করে দিল। আনন্দের স্থলে সবার মুখে বিষাদের ছায়া নেমে এল। সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠল।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ, তার উপদেষ্টামণ্ডলি ও মজুসি জনসাধারণের ধারণা ছিল, মুসলমানরা বলখে অভিযান পরিচালনার সাহস দেখাবে না। মারাদরোদ পর্যন্তই এসেই তারা থেমে যাবে এবং সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করবে। আর যখন খাকান ও তুর্কিস্তানের সাহায্য এসে পৌঁছুবে, তখন তারা মারাদরোদে অভিযান চালিয়ে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবে।

কিন্তু অল্প দিন পরই যখন তারা শুনল, মুসলমানরা এগিয়ে আসছে, তখন বিস্ময়ের সঙ্গে চিন্তা আর ভীতিও তাদের চেঁপে ধরল। ইয়ায্‌দাজার্‌দ মজুসিদের সাহস ধরে রাখতে ঘোষণা করিয়ে দিলেন, ফারগানা থেকে সহযোগী বাহিনী রওনা হয়েছে এবং সেখান থেকে সংবাদ এসেছে, মুসলমানরা বলখ এসে পৌঁছামাত্র আক্রমণ চালিয়ে তাদের নিঃশেষ করে ফেলা হবে।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ আরও ঘোষণা দিলেন, এই যুদ্ধে তিনি নিজে লড়াই

করবেন। এখানে তিনি শেষবারের মতো ভাগ্যের পরীক্ষা নেবেন। তিনি বিনোদনের আসর পরিত্যাগ করে যুদ্ধের ময়দানের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন। প্রতিদিন দুর্গ থেকে বের হয়ে সামরিক মহড়ার ব্যবস্থা করছেন এবং সৈনিকদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন, আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছি, তোমরাও তৈরি হয়ে যাও।

খোরযাদের এ-পর্যন্ত আশা ছিল, মুসলমানরা পরাজিত হবে আর তার রাজকুমারীকে পাওয়ার পথ সুগম হবে। কিন্তু ইয়ায্‌দাজার্‌দ স্বয়ং কোনোখানে মুসলমানদের মোকাবেলা করলেন না আর তিনি যেখান থেকেই চলে এলেন, মুসলমানরা এগিয়ে এসে সেটি দখল করে নিয়েছে। এমনকি খোরাসানের সিংহভাগ এলাকাই মুসলমানদের হাতে চলে গেছে। তাতে খোরযাদের আশা ভেঙে গেছে যে, না, মুসলমানদের পরাজয় হবে না।

একদিন খোরযাদ ইয়ায্‌দাজার্‌দকে বলল, মুসলমানরা বলখের দিকে এগিয়ে আসছে। আমাদের অফিসার ও সৈনিকদের মাঝে শঙ্কা ছড়িয়ে পড়েছে।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ বললেন, বিষয় তো এমন নয়। আমি বাহিনী পর্যবেক্ষণ করছি। সৈনিক ও অফিসারদের মনোবল অটুট দেখেছি।

খোরযাদ বলল, শাহেনশাহ্‌র উপস্থিতিতে তাদের মাঝে জোশ সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু আসলে তারা সন্ত্রস্ত।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ বললেন, এবার আমি তাদের সঙ্গেই থাকব।

খোরযাদ বলল, তাহলে অবশ্য নিশ্চিত হওয়া যায় যে, জয় আমরাই পাব।

এমন সময় রাজকুমারী ওখানে এসে উপস্থিত হলো। মেয়েটি সম্ভবত এইমাত্র গোসল করে এসেছে। রেশমের মতো চুলগুলো তার পিঠের উপর ছড়িয়ে রয়েছে। কয়েকটি বেয়াড়া চুল তার চাঁদসুন্দর ললাট ও গোলাপবরণ গণ্ডদ্বয়ের উপর ঝুলে আছে। মেয়েটির পরিধানে রেশমি পোশাক আর মণিমুক্তার অলংকার। তাতে তার রূপ বহুগুণ বেড়ে গেছে।

খোরযাদ মেয়েটির প্রতি তাকাল। আর তাকিয়েই রইল। যেন তার চোখ দুটো আটকে গেছে রাজকুমারীর মুখমণ্ডলে। রূপরানী রাজকুমারী লজ্জা পেয়ে চোখ অবনত করে ফেলল।

শাহেনশাহ ইয়ায্‌দাজার্‌দ মেয়েটিকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। মেয়েটি সামনে এলে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান। কিন্তু আজ তেমন কোনো লক্ষণ পরিলক্ষিত হলো না। ম্লানমুখে বললেন, তুমি এসেছ মা! ইয়ায্‌দান

তোমার কল্যাণ করুন। খোরযাদ বলছে কি জান? মুসলমানদের আক্রমণের সংবাদ শুনে আমাদের অফিসার ও সৈনিকরা নাকি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেছে।

রাজকুমারী বলল, আমিও শুনেছি। তবে মানুষ এ-কথাও বলাবলি করছে যে, শাহেনশাহ যদি উপস্থিত থাকেন, তাহলে সৈনিকরা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।

খোরযাদ বলল, কোনো-কোনো মোসাহেব চাচ্ছে না যুদ্ধ হোক।

ইয়ায্দাজার্দ বললেন, আমিও একথা শুনেছি। বিষয়টি আমি তদন্ত করিয়ে দেখছি, কারা যুদ্ধ চায় না। তবে হতে পারে, সংবাদটি সত্য নয়।

আমি শাহেনশাহকে একটি বিষয় বলবার সাহস দেখাতে পারি কি?

বলো।

আমি রাজকুমারী সম্পর্কে বলতে চাচ্ছিলাম।

আমাদের শর্ত এখনও বহাল আছে। তুমি যদি এই অঞ্চলেও কোনো এক রণাঙ্গনে মুসলমানদের পরাজিত করতে পার, তাহলে আমি তোমার আবেদন মঞ্জুর করে নেব।

আমার ধারণা হলো, শাহেনশাহ যদি আমার আকাঙ্খাটা পূরণ করে দেন, তাহলে আমি অধিক বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারব।

কিন্তু আমার ধারণা হলো, এই শর্তের কারণে তুমি যুদ্ধে বেশি বীরত্বের প্রমাণ দিতে পারবে।

আমি শুনেছি, ফায়রোজান আরব দুহিতাকে তুলে এনেছে।

শাহেনশাহ ইয়ায্দাজার্দ সহসা চকমিত হয়ে ওঠলেন। বললেন, তাই নাকি? তা এখানে নিয়ে এল না কেন?

আসল ব্যাপার হলো, ফায়রোজান নিজেই মেয়েটির প্রতি আসক্ত। তাই এনে তাকে লুকিয়ে রেখেছে।

ইয়ায্দাজার্দ ক্ষেপে উঠে বললেন, কত বড় দুঃসাহস! লোকটা মৃত্যুকে আহ্বান জানাচ্ছে নাকি?

কিন্তু তার মৃত্যুতে আরব দুহিতা শাহেনশাহর হাতে আসবে না।

আমি অত কথা শুনতে চাই না। আরব সুন্দরীকে রাজমহলে আসতেই হবে।

এই অধম তার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে।

চেষ্টা করো। আমি তোমাকে পুরস্কার দিয়ে লাল করে দেব।

বিনিময়ে আমি আমার আবেদনের মঞ্জুরি চাই।

আমি ওয়াদা দিচ্ছি, আরব দুহিতা যেদিন আমার হেরেমে আসবে, সেদিন রাজকুমারীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে যাবে।

আপনি নিশ্চিত থাকুন। খুব তাড়াতাড়ি আমি আরব রূপসীকে খুঁজে বের করে রাজমহলে পৌঁছিয়ে দেব।

এ-সময় এক অফিসার এসে উপস্থিত হলো। তার চেহারা থেকে উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছে।

ইয়ায্দাজার্দ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এত বিমর্ষ কেন?

অফিসার বলল, আমি একটি দুঃসংবাদ শোনাতে উপস্থিত হয়েছি মহারাজ! ইসলামি বাহিনী দুর্গের সম্মুখে এসে পড়েছে!

ইয়ায্দাজার্দ-এর যেন কথাটি বিশ্বাস হলো না। তিনি চিৎকারের মতো শব্দ করে বললেন, কী বললে? মুসলমানরা এসে পড়েছে?

অফিসার বলল, এসে পড়েনি– আসছে। দুর্গের প্রহরীরা আমাকে সংবাদটা দিয়েছে।

ইয়ায্দাজার্দ বললেন, চলো, নিজচোখে দেখে আসি। আর তুমিও চলো রাজকুমারী।

রাজকুমারী বলল, চলুন। আমিও ইসলামি বাহিনী দেখব।

ইয়ায্দাজার্দ উঠে দাঁড়ালেন। খোরযাদ-রাজকুমারীও ওঠল। সবাই প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেল। ঘোড়ায় চড়ে পাঁচিলের নিকটে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে পাঁচিলে উঠতে শুরু করল। দেখে আরও কয়েকজন অফিসার ও মোসাহেব ছুটে এল এবং সম্রাটের পেছনে-পেছনে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল।

সবাই পাঁচিলে উঠে গেল। কয়েকজন সৈনিক পাঁচিলের উপর টহল দিচ্ছিল। তারা শাহেনশাহকে দেখে একদিকে সরে দাঁড়াল।

রাজকুমারীর মুখের উপর সূর্যের আলো পড়ছিল। তাতে তার সৌন্দর্য আরও বেড়ে গেল। অফিসার ও মোসাহেবরা আড়চোখে তাকে দেখছিল।

ইয়ায্দাজার্দ বুরুজে প্রবেশ করে মারাদরোদের পথের দিকে তাকালে শুরু করলেন। ওদিক থেকে ইসলামি বাহিনী এগিয়ে আসছে। রোদের কিরণে মুসলমানদের অস্ত্রগুলো ঝিকমিক করছে। তারা অত্যন্ত জাঁকজমক ও দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে আসছে।

এটি আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.)-এর বাহিনী। কুফা থেকে যে-সহযোগী বাহিনীগুলো রওনা হয়েছিল, তারা এসে আহনাফ (রা.)-এর বাহিনীর সঙ্গে মিশে গেছে। আলকামা ও রিব্য়ী আগেই এসে পৌঁছেছেন। তাদের পরে ক্রমে যোগ দিয়েছেন আবদুল্লাহ ইবনে আবী আকীল আস-

ছাফাকি ও ইবনে উম্মে আযাল আল-হামাদানি। মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা এখন চব্বিশ হাজার।

ইয়ায্দাজার্দ, রাজকুমারী, খোরযাদ ও অন্যান্য অফিসাররা ইসলামি বাহিনীর আগমন দেখছে। বাহিনীটি আসতে থাকল আর ময়দানে ছড়িয়ে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করতে লাগল।

মুসলমানরা ঘোড়া থেকে নেমেই পরম উদ্দীপনার সঙ্গে তাঁবু স্থাপন করতে শুরু করল, যেন এত দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করা সত্ত্বেও তারা ক্লান্ত হয়নি। সন্ধ্যা পর্যন্ত বাহিনীর আগমন অব্যাহত থাকল।

ইয়ায্দাজার্দ সূর্যাস্তের পর বুরুজ থেকে বের হয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন।

আটচল্লিশ.

যেদিন ইসলামি বাহিনীর বলখের দোরগোড়ায় এসে উপনীত হলো, সেদিন সন্ধ্যায় ইয়ায্দাজার্দ যখন পাঁচিল থেকে নেমে প্রাসাদের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন ঘটনাচক্রে জামাসপ কী এক প্রয়োজনে ওদিকে গিয়েছিল। ইয়ায্দাজার্দকে দেখামাত্র যেন তার মাথায় আগুন ধরে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে জামাসপ ইয়ায্দাজার্দের দিকে ছুটে গেল। ইয়ায্দাজার্দ সৈনিকদের পাহারায় পথ চলছিলেন।

জামাসপ সৈনিকদের নিকটে পৌঁছে গেল। সৈনিকরা তাকে প্রতিহত করল। বাধার সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে জামাসপ বলল, আমি শহেনশাহকে সালাম জানাতে চাই।

সৈনিকরা হেসে বলল, শাহেনশাহকে বলছ কেন, বলো শাহজাদীকে অভিবাদন জানাতে এসেছি, যার জগতপোড়ানো রূপ তোমাকে পাগল বানিয়েছিল। যাও, নিজের পথ দেখো।

জামাসপ বলল, তোমরা ভুল বুঝেছ।

এক সৈনিক হেসে সামনে এগিয়ে গেল। জামাসপ ফিরে এল এবং পারভিনের বাড়িতে চলে এল। সাফওয়ান মাগরিবের নামায আদায় করে বসে আছে। সে জামাসপকে দেখল। জামাসপের চোখ দুটো যেন আগুনের গোলা।

সাফওয়ান জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার, কারও সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া হয়েছে নাকি?

জামাসপ উত্তর দিল, না।

তাহলে চোখ দুটো আগুনের মতো লাল কেন?

আজ ইয়ায্দাজার্দ আমার সামনে পড়ে গিয়েছিল। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে

রাখা সত্ত্বেও মেজাজটা চড়ে গিয়েছিল। আমি তার দিকে ধেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সৈনিকরা মনে করল, রাজকুমারীকে দেখে আমি পাগল হয়ে গেছি। তারা আমার সঙ্গে রসিকতা করল এবং আর কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করল না।

কিন্তু তুমি ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর দিকে ধেয়ে গিয়েছিলে কেন?

মুসলমানদের প্রতি সহমর্মিতা আর তার প্রতি বিদ্বেষের কারণে। একদিন আমি তোমাকে জানাব, ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর প্রতি আমার বিদ্বেষের হেতু কী।

যাক, সে তোমাদের নিজস্ব ব্যাপার। আমি এসব জানতে চাইব না।

মুসলিম বাহিনী এসে পড়েছে। আমার ভয় হচ্ছে, আপামণিকে ওরা অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলবে কিংবা উত্তেজনাবশত ফায়রোজান তার কোনো ক্ষতি করে ফেলবে। তাই আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আজ রাতেই আমি আপামণিকে উদ্ধারের চেষ্টা করব।

এমন ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে অবতীর্ণ হওয়ার অনুমতি আমি তোমাকে কীভাবে দেব? আমি তো বরং নিজেই সংকল্প নিয়েছি, আজ রাতে আমিই ভাগ্যের পরীক্ষা দেব।

এতক্ষণে জরিনা-পারভিনও সেখানে এসে পড়ল। জরিনা বলল, কীসের ভাগ্য পরীক্ষা সাফওয়ান ভাই?

সাফওয়ান বলল, আফীরা উদ্ধারের।

জরিনা বলল, আমি পারভিন থেকে অনুমতি নিয়েছি। এখন আমি ফারাওয়ান্দার কাছে যাচ্ছি। তিনি আমাকে যেতে বলেছেনও। রাতে ওখানেই থাকব। আফীরা যদি ওখানে থেকে থাকে, তাহলে আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব।

তোমরাই বলেছ, ফারাওয়ান্দা ভালো মানুষ নয়। আমি আমার বোনকে একাকি তার প্রাসাদে যাওয়ার ও ওখানে রাতযাপনের অনুমতি দিতে পারি না।

আমি এমন একটা কৌশল ঠিক করে রেখেছি, যার ফলে আমাদের কাজও হয়ে যাবে আবার আমাকে কোনো ক্ষতিরও সম্মুখীন হতে হবে না।

তুমি যে-কৌশলই অবলম্বন কর না কেন, ঝুঁকি কিন্তু থেকেই যাবে। আমিও একটি পরিকল্পনা ঠিক করে রেখেছি।

কী পরিকল্পনা?

আমি আজ মধ্যরাতে যাব। কোনো দিক থেকে প্রাসাদে ঢুকে পড়ব এবং আফীরাকে নিয়ে ফিরে আসব।

এই বুদ্ধিও ঠিক আছে। কিন্তু তোমার একা যাওয়া সঙ্গত হবে না।

কারণ, প্রাসাদ সম্পর্কে তোমার পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। কোথায় কী আছে, তোমার জানা নেই। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো।

সপ বলল, জরিনা ঠিকই বলেছে। ওর থেকে তুমি অনেক সহযোগিতা পাবে। সেই সঙ্গে আমিও আবেদন জানাব যে, আমাকেও নিয়ে যাবেন। একজন অপেক্ষা দুজন ভালো হবে।

পারভিন বলল, আমি একজন আর বাদ গিয়ে লাভ কী। আমিও যাব।

জরিনা বলল, এত লোক যাওয়া ঠিক হবে না। আমি তো যাব প্রাসাদের অভ্যন্তরে পথ দেখানোর জন্য। জামাসপ যাবে, তারা একজন অপরজনকে সাহায্য করবে। তুমি বাদ থাকো।

সাফওয়ান বলল, জরিনা ঠিকই বলেছে পারভিন।

পারভিন বলল, ঠিক আছে, আমি গেলাম না। আমি বসে-বসে তোমাদের অপেক্ষা করব। খাবার প্রস্তুত আছে; আগে খেয়ে নাও।

তারা বড় একটি কক্ষে চলে গেল। সবাই খানা খেল। সাফওয়ান এশার নামায আদায় করল এবং বসে সবাই কথা বলতে লাগল। যখন মধ্যরাত ঘনিয়ে এল, তখন সাফওয়ান, জামাসপ ও জরিনা কালো চাদরে আবৃত হয়ে ঘর থেকে বের হলো।

সুনসান অলিগলি। আঁধারে ছেয়ে আছে প্রকৃতি। আকাশে চাঁদ উঠবে মধ্যরাতের পর। তিনজন অতিশয় সতর্কতার সঙ্গে চুপিচুপি ফারাওয়ান্দার মহলের পেছনে পৌঁছে গেল। সাফওয়ান তার পকেট থেকে একটি রেশমের দড়ি বের করল এবং তার কিছু অংশ দলা করে সজোরে ছাদের উপর ছুঁড়ে মারল। দড়ির মাথায় ফাঁস বাঁধা ছিল। সাফওয়ান দড়িটা নিচের দিকে টান দিল। তাতে দড়ি নিচে পড়ে গেল– তার ফাঁস কোনো কিছুতে আটকাল না।

সাফওয়ান দ্বিতীয়বার চেষ্টা করল। তারপর তৃতীয়বার। কিন্তু সব কবারই দড়ি কোনো বস্তুতে না আটকে নিচে চলে এল।

এবার জামাসপ চেষ্টা শুরু করল। কিন্তু সে-ও সফল হলো না। সাফওয়ান পুনরায় দড়িটা হাতে নিল এবং বিসমিল্লাহির রাহমানির বলে সজোরে ছুঁড়ে মারল। দড়ি ছাদে গিয়ে পতিত হলে সাফওয়ান আস্তে করে নিচের দিকে টান দিল। কিন্তু এবার দড়ি নামল না। সাফওয়ান খুব খুশি হলো। বলল, আল্লাহর শোকর, দড়ি আটকে গেছে!

প্রথমে সাফওয়ান একাই সজোরে দড়ি টেনেছিল। তাতে কোনো নড়চড়

হয়নি। পরে সাফওয়ান ও জামাসপ দুজনে একসঙ্গে ধরে টানল। তাতেও দড়ি নড়ল না। দড়ি ভালোভাবেই আটকে গেছে।

জামাসপ বলল, আগে আমি উপরে উঠি।

সাফওয়ান বলল, না প্রিয়। আগে আমি উঠব। উঠে যখন আমি রশি নাড়া দেব, তখন তুমি উঠে এসো।

জামাসপ বলল, আর জরিনা?

জরিনা বলল, আমি ভাইজানের পরে উঠব।

সাফওয়ান বলল, ঠিক আছে।

সাফওয়ান ঢালটা পিঠে ঝুলিয়ে তলোয়ারটা দাঁতে চেঁপে ধরে রশি বেয়ে তরতর করে ছাদে উঠে গেল।

ততক্ষণে আকাশের পূর্ব দিগন্ত থেকে চাঁদ উঁকি দিতে শুরু করেছে। ছাদের উপর জোসনার আবছা আলো ছড়িয়ে পড়েছে। সাফওয়ান দেখল রশিটা কোথায় আটকাল। দেখল, সেটি পাথরে গাঁথা একটি গজাল। রশির ফাঁসবাঁধা মাথাটা এসে তাতেই শক্তভাবে আটকে গেছে। সাফওয়ান নিশ্চিত হলো, নিচের চাঁপে রশি একটুও নড়াচড়া করছে না– ভয়ের কোনো কারণ নেই।

এবার সাফওয়ান রশিটা নাড়া দিল। সংকেত পেয়ে জরিনা চড়তে শুরু করল। কিন্তু মেয়েটি একনাগাড়ে উঠতে পারল না। কয়েকবারই পা পিছলে নিচে পড়ে গেল। বেশ করার চেষ্টা করার পর উপরে পৌঁছে গেল। জরিনা ছাদের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার পর সাফওয়ান ইচ্ছে করলে মেয়েটির হাত ধরে তুলে ফেলতে পারত। কিন্তু আদর্শিক কারণে সে তা করল না। বরং সে উপর থেকে নিজের পাগড়িটা ঝুলিয়ে দিল। জরিনা রশি ও পাগড়ি উভয়ের সাহায্যে ছাদে উঠে গেল।

সাফওয়ান পুনরায় রশি নাড়া দিল। এবার জামাসপ উপরে উঠে এল। জরিনা তাদের নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল এবং একটি দীর্ঘ গলিপথ অতিক্রম করে এমন একস্থানে গিয়ে দাঁড়াল, যেখানে এদিক-ওদিক কতগুলো কক্ষ।

সমগ্র প্রাসাদ নীরব-নিস্তব্ধ। পিনপতনের শব্দটিও কোথাও নেই। একটি কক্ষেও আলো নেই। তারা কয়েকটি কক্ষ অতিক্রম করে একটি কক্ষের সম্মুখ দিয়ে যেতে শুরু করলে কক্ষের ভেতর থেকে আরবি কবিতা পাঠের শব্দ কানে এল। সাফওয়ান কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনল। কণ্ঠটা চিনে ফেলল সাফওয়ান। এই কণ্ঠ আফীরার। সাফওয়ান দাঁড়িয়ে-

দাঁড়িয়ে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি শুনল। তার একটি পঙ্‌ক্তির মর্ম হলো, 'আফসোস, বাতাসও বুঝি গিয়ে সাফওয়ানকে আমার দুর্দশার সংবাদটা জানাতে পারল না। অন্যথায় সিংহহৃদয় মুজাহিদ নিঃসন্দেহে এতক্ষণে এখানে পৌঁছে যেত!'

সাফওয়ান আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। বলে ওঠল, আমি এসে পড়েছি আফীরা। কথাটা সাফওয়ান অলক্ষ্যে খানিক শব্দ করেই বলে ফেলল। জামাসপ তাড়াতাড়ি সাফওয়ানের মুখটা চেঁপে ধরে বলল, এ আপনি কী করছেন! ভুল করছেন তো! চুপ থাকুন!

সাফওয়ানের সম্বিত ফিরে এল। বুঝতে পারল আসলেই সে ভুল করে ফেলেছে। এটা তো কথা বলবার জায়গা নয়।

সাফওয়ান দরজার কাছে চলে গেল। দেখল দরজায় তালা ঝুলছে। ওরা আফীরাকে ভেতরে আটকে রেখে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিয়েছে।

সাফওয়ার খঞ্জরের বাঁট দ্বারা তালায় বাড়ি মারল। আঘাত খেয়ে তালা খুলে গেল। সাফওয়ান ঝটপট ভেতরে ঢুকে পড়ল। ভেতরটা অন্ধকার। ফিস্‌ফিস করে বলল, আফীরা!

আফীরা হঠাৎ চমকে উঠে বলল, কে কথা বলছ?

সাফওয়ান এগিয়ে গিয়ে আফীরার একটা হাত ধরে ফেলল এবং তাকে টেনে বাইরে নিয়ে এল। এতক্ষণে বেশ আলো ছড়িয়ে পড়েছে। সেই আলোতে আফীরা সাফওয়ানকে দেখে বলল, উহ্ সাফওয়ান তুমি?

সাফওয়ান আফীরাকে কথা না বলতে ইঙ্গিত করল এবং বলল, আমার সঙ্গে এস।

জরিনা আগে-আগে হাঁটছে। অন্য সবাই তার পেছনে। তারা ছাদে উঠে গেল। প্রথমে জামাসপ দড়ি বেয়ে নিচে নামল। তারপর জরিনা ও আফীরা। সকলের শেষে সাফওয়ান নেমে এল।

ততক্ষণে চাঁদটা বেশ উপরে ওঠে গেছে। জোসনাও বেড়ে গেছে। পথ-ঘাট এখন আগের মতো অন্ধকার নয়। তারা সন্তর্পণে পা টিপে-টিপে রওনা হলো।

ঊনপঞ্চাশ.

পথে কোনো মানুষের সঙ্গে তাদের দেখা হলো না। তারা সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে আফীরাকে নিয়ে পারভিনের বাড়িতে এসে পড়ল। পারভিন এখনও জেগে আছে এবং তাদের অপেক্ষায় বসে-বসে প্রহর গুণছে। এরা যখন এসে পৌঁছুল, ততক্ষণে জোসনা ফুটতে শুরু করেছে।

সময়টা চান্দ্রমাসের শেষ দশক হওয়ায় জোসনা কিছুটা ফিকে। তথাপি বেশ আলো আছে।

চাঁদের আলোতে পারভিন, জরিনা ও আফীরার চেহারা চকমক করছে। আফীরার চেহারায় লালিমার স্থলে হলদে ভাব বেড়ে গেছে। তার রংটা বাসন্তি হয়ে গেছে। তাতে তাকে আগের চেয়ে বেশি সুন্দর লাগছে। জরিনা বলল, আমি ওকে দেখেছিলাম এবং প্রথম দৃষ্টিতেই ওর প্রতি আমার সহমর্মিতা জন্মে গিয়েছিল।

পারভিন মুচকি হেসে বলল, আমি তো এই প্রথমবার দেখলাম। তাতেই তার আকার-গঠন আমাকে ভক্ত বানিয়ে ফেলেছে।

আফীরা ইরানি ভাষা তেমন জানে না। তাই জরিনা ও পারভিন যা কিছু বলল, সাফওয়ান আরবিতে তার তরজমা করে শোনাল। আফীরা মুচকি হেসে বলল, আমি এদের কৃতজ্ঞতা আদায় করছি।

জামাসপ বলল, আপামণির বিশ্রামের প্রয়োজন। এখন আর কথা না বলে ওকে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দাও।

সাফওয়ান বলল, তা বটে। কিন্তু মন তো চায়, সব কথা এখনই জিজ্ঞেস করি। তবে তাতে ওর কষ্ট হবে। আচ্ছা, ওকে তোমরা বিশ্রাম করতে দাও।

জামাসপ বলল, না জানি আপামণি কত দিন যাবত বিশ্রামের সুযোগ পায়নি!

আফীরা বলল, আমি অনেক কষ্ট ভোগ করেছি। সারা রাত জেগে ও আল্লাহর সমীপে দু'আ করে কাটিয়েছি। আর দিন অতিবাহিত করেছি এই ভাবনা ও ভয়ে যে, না জানি ওরা আমার সঙ্গে কোনো অসদাচরণ করে বসে।

সাফওয়ান বলল, এখন তোমরা বিশ্রাম নাও, ইনশাআল্লাহ সকালে কথা হবে।

আফীরার জন্য আলাদা কক্ষে বিছানা পাতা হলো। সবাই শুয়ে পড়ল।

সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে সাফওয়ান ও আফীরা ফজর নামায আদায় করল। তারপর দুজন কালামে পাক তিলাওয়াত করল। ইতিমধ্যে পারভিন নাস্তা প্রস্তুত করল। সবাই নাস্তা খেল। আফীরার আগুনবরণ চেহারাটা ফিকে হয়ে গেছে এবং খানিক হলুদবরণ ধারণ করেছে। কিন্তু তাতে মেয়েটিকে আগের চে আরও বেশি চিত্তাকর্ষী মনে হচ্ছে। পারভিন ও জরিনা আড়চোখে কেবলই তাকে দেখছে। সাফওয়ান মুচকি হেসে বলল, নজর লাগিয়ে দেবে নাকি তোমরা ওকে?

জরিনা বলল, আমাদের নজর অমন নয়। তবে মন চাচ্ছে, ওকে অন্তরের মাঝে বসিয়ে রাখি কিংবা চোখের মধ্যে লুকিয়ে রাখি।

আফীরা মনকাড়া ডাগর চোখ দুটো তুলে জরিনার প্রতি তাকাল এবং মুচকি হাসল। জরিনা বলল, কেউ যদি এর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে তুলে এনে থাকে, আমি তার কোনো দোষ দেখি না। এ তো পরীর চেয়েও বেশি রূপসী।

সাফওয়ান আফীরার প্রতি তাকিয়ে বলল, খুব তো বীরত্ব দেখাতে। তখন কোথায় গিয়েছিল তোমার বীরত্ব।

আফীরা বলল, তোমার তো নিজের বীরত্বের উপর বেজায় দম্ভ। সে-সময় যদি তুমি আমার সঙ্গে থাকতে, তাহলে দেখতে আমি কী করেছি।

সাফওয়ান বলল, কী আর করেছ। চুপচুপ ফায়রোজান ও তার সাথীদের সঙ্গে চলে এসেছ!

আফীরা বলল, অথচ ঘটনা এমন ঘটেনি।

সাফওয়ান বলল, তাহলে কী ঘটেছে বিস্তারিত শোনাও।

আফীরা বলল, এখন নয়। আগে গোসল করে পোশাক পালটে নিই। তারপর শোনাব।

সাফওয়ান বলল, কিন্তু তোমার পোশাক তো এখানে নেই।

আফীরা বলল, প্রস্তুত তো হতে পারে।

পারভিন বলল, আমি কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সবাই বসে এখনই সিলিয়ে ফেলব।

পারভিন তৎক্ষণাৎ ওঠে গেল এবং উন্নতমানের কয়েক গজ ফুলদার কাপড় নিয়ে এল। আফীরা নিজে কাপড় কাটল এবং তিনজন বসে পোশাক তৈরি করে ফেলল। সালোয়ার বানাল, কামিজ বানাল।

আফীরা গোসল করে নতুন পোশাক পরল। মাথার চুল শুকিয়ে চিরুনি করল। চুলগুলো দুটি বেণী করে বুকের উপর ছেড়ে দিল। এই পোশাকে মেয়েটি আরও কমনীয় হয়ে ওঠল। তাকে আরও সুন্দর দেখাল।

এমন সময় পারভিনের পিতা বাড়িতে এলেন। লোকটির নাম জাপান। আরবি পোশাক পরিহিত এক অপরিচিত মেয়েকে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। পারভিনকে জিজ্ঞেস করলেন, এই মেয়েটি কে?

পারভিন বলল, আব্বাজান, এ এক আরব দুহিতা। ফায়রোজান একে অপহরণ করে এনেছিল। জামাসপ ও জরিনা এর সন্ধানে এখানে এসেছিল। এসে পেয়ে গেল।

জাপান বললেন, কিন্তু মেয়েটি মুসলমান। মুসলিম বাহিনী বলখের বাইরে ছাউনি ফেলেছে। এ-মুহূর্তে বলখের প্রতিজন নাগরিক মুসলমানদের

শত্রু। একজন বলখিও যদি এই মেয়েটির তথ্য পেয়ে যায়, তাহলে আমরা বিপদে পড়ে যাব।

পারভিন বলল, আমি একে লুকিয়ে রাখব, কারও সামনে আসতে দেব না।

জামাসপ বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা অতিশীঘ্র এখান থেকে চলে যাব।

জাপান বললেন, আমি একথা বলছি না যে, তোমরা চলে যাও। আমি বলছি, তোমরা সতর্কতার সঙ্গে থাকো। এই মেয়েটিকে বাগানে লুকিয়ে রাখো– ওখানে যেন কেউ যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করো।

পারভিন বলল, আমরা সবাই বাগানে চলে যাচ্ছি।

জাপান চলে গেছেন। পারভিন আফীরা, জরিনা, সাফওয়ান ও জামাসপকে নিয়ে বাগানে চলে গেল।

বেশ চমৎকার ও মনোরম একটি বাগান। বাগানের একধারে কয়েকটি কক্ষও তৈরি করা হয়েছে। সর্বত্র সবুজের সমারোহ। সবাই সবুজ ঘাসের উপর বসে পড়ল। সাফওয়ান বলল, এবার তোমার কাহিনী শোনাও। আফীরা তার অপহরণের কাহিনী শোনাতে শুরু করল

'আমি ফ্রেগাসের সঙ্গে বাগানে গেলাম। ফুল আমার খুব প্রিয় ছিল। এই ফুলপ্রীতিই আমাকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিল। বাগানটা ছিল বেশ চমৎকার। ফল ও ফুলে পরিপূর্ণ ছিল। ফুলের সৌরভ মউমউ করছিল। নানা জাতের ও নানা বর্ণের খুশবুদার ফুল দেখে আমি বিমোহিত হয়ে গেলাম। আমি এক শেড থেকে আরেক শেডে, সেখান থেকে অন্য শেডে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। মন চাচ্ছিল, সবগুলো ফুল ছিঁড়ে ফেলি। ফ্রেগাস একধারে বসে ছিল। আমি একটি শেডে দাঁড়িয়ে ফুল ছিঁড়ে-ছিঁড়ে শুকতে শুরু করলাম। হঠাৎ কীসের একটা শব্দ আমার কানে এল। মনে করলাম ফ্রেগাস আসছে। আমি বিষয়টিকে গুরুত্ব দিলাম না। হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে আমাকে পাঞ্জা করে ধরে ফেলল। আমি মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম, কয়েক ব্যক্তি মুখোশ পরে দাঁড়িয়ে আছে। দুজন আমাকে ধরে ফেলল। আমি শক্তি প্রয়োগ করলাম এবং তাদের কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম। কিন্তু ততক্ষণে আমি হাঁপাতে শুরু করেছি। আমি ঝটপট খঞ্জরের উপর হাত রাখলাম। কিন্তু আক্রমণ করার আগেই তিন-চারজন লোক আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা আমাকে ধরে ফেলল। আমি খুব ছটফট করলাম। তাদের হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু

সম্ভব হলো না। অবশেষে আমি অসাড় হয়ে গেলাম। তারা আমাকে রেশমের দড়ি দ্বারা বেঁধে নিল এবং নিয়ে রওনা হলো। আমি দেখলাম, ফ্রেগাস মাটিতে পড়ে আছে।

'তারা আমাকে বাগানের বাইরে নিয়ে এল এবং একটি ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিল। একজন আমাকে বলল, যদি সুবোধ মেয়েটির মতো চুপচাপ বসে থাক, তাহলে তোমাকে কোনো কষ্ট দেওয়া হবে না। অন্যথায় যদি কোনো শব্দ কর বা অন্য কোনো আচরণ কর, তাহলে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

'আমি নিরুপায়ের মতো ঘোড়ার পিঠে চুপচাপ বসে রইলাম। বুঝে ফেললাম, আমার সম্পর্কে যে-ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তা বাস্তবায়িত হতে চলেছে। আমি মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করলাম, তুমি আমার সম্ভ্রমের হেফাজত করো। নিজের জীবনের চেয়ে সম্ভ্রম বেশি প্রিয় ও মূল্যবান।

'তারা ঘোড়ার লাগাম ঢিলা করে দিল। ঘোড়া দ্রুতগতিতে ছুটে চলল।

'রাতে তারা একটি গ্রামে অবস্থান করল। সে-সময় আমার বন্ধন খুলে দিল। আমি চেষ্টা করলাম, যদি ওরা আমার থেকে উদাসীন হয়ে পড়ে, তাহলে আমি পালিয়ে যাব। কিন্তু তারা পূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে আমাকে পাহারা দিল। তারপর রাত পোহাবার পর সকাল-সকাল আবার রওনা দিল।

'এ-সময় এলাকাটা পাহাড়ি হওয়ার কারণে আমরা ধীরগতিতে চলছিলাম। আমার ধারণা ছিল, তুমি আমার সন্ধানে বের হবে। আমি একটু পর-পর পেছনে ফিরে তাকাতে থাকলাম। আমার মনে হচ্ছিল, যেন তুমি আমার পেছনে-পেছনে আসছ।

'তারা আমাকে এই শহরে নিয়ে এল এবং সেই বাড়িটিতে রাখল, যেখান থেকে তোমরা আমাকে তুলে এনেছ। তারা আমাকে বাধ্য করার চেষ্টা করল, যেন আমি মজুসি ধর্ম গ্রহণ করি এবং যে-লোকটি আমাকে তুলে এনেছে, তার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হই। কিন্তু আমি সম্মত হলাম না। তারা আমাকে কষ্ট দিতে শুরু করল। আমাকে একটি কুঠুরিতে আটকে রাখল। খাবার-পানি বন্ধ করে দিল। আমি অনাহারে দিন কাটাতে লাগলাম আর আল্লাহর সমীপে দু'আ করতে থাকলাম, যেন তিনি আমাকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেন। এই অবস্থায় আমি সুযোগ পেলেই নামায পড়তাম। তাতে বেশ শান্তি ও সান্ত্বনা পেতাম।

'এভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এবার বোধহয় ওরা মনে

করল, না খাওয়ার কারণে আমি মরে যাব। তাই সামান্য খাবার-পানি দিতে শুরু করল। অবশেষে এমন চরম এক দুরাবস্থার মধ্যে রাতে তোমরা পৌঁছে গেলে এবং আমাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে নিয়ে এলে। আমি মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। তিনিই এই কঠিন পরীক্ষার মধ্যে আমাকে দৃঢ়পদ ও অবিচল রেখেছেন। অবশ্য একটা ভয় এখনও রয়ে গেছে যে, ওরা আমার সন্ধানে এখানে এসে পড়ে কিনা।'

পারভিন বলল, তুমি ভয় করো না। এখানে কেউ আসতে পারবে না।

পঞ্চাশ.

ইসলামি বাহিনী একদিকে ছাউনি স্থাপন করে অবস্থান গ্রহণ করেছে। অপরদিকে মজুসি বাহিনী পূর্ব থেকেই অবস্থান নিয়ে আছে। দুই বাহিনীর মধ্যখানে দুর্গ। দুর্গটি উভয় বাহিনীর মাঝে আড়াল তৈরি করে রেখেছে। তৃতীয় দিকে শহর। চতুর্থ দিকে উন্মুক্ত ময়দান।

ইয়ায্দাজার্দ-এর আশা ছিল, খাকান কিংবা তুর্কিস্তান থেকে অবশ্যই সাহায্য আসবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো দিক থেকে একজন সৈনিকও আসেনি। তবে জগত যেমন আশার পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, তেমনি ইয়ায্দাজার্দও আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষার প্রহর গুণছে।

স্বয়ং ইয়ায্দাজার্দ-এর কাছে মুসলমানদের তিনগুণ সৈন্য আছে। এর বাইরে বলখের প্রতিজন যুবক মুসলমানদের শত্রু এবং তারা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যুদ্ধে অংশ নিতে প্রস্তুত। এই যুবকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগুনের মতো জ্বলে আছে। কারণ, মুসলমানরা তাদের দেশ ইরানের বৃহৎ অংশ দখল করে তাদের রাজাকে রাজধানী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আর এখন তাকে ধাওয়া করতে বলখ আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছে।

কিন্তু বলখের সুশীল শ্রেণীর মানুষ যুদ্ধের পক্ষপাতী নয়। তারা মুসলমানদের কীর্তি শুনেছেন। তাই তারা যুদ্ধের উপর সন্ধিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন যে, ইয়ায্দাজার্দ মুসলমানদের সঙ্গে সমঝোতা করে নিন। যদি তার পক্ষে সন্ধি করা সম্ভব না হয়, তাহলে তিনি চীন চলে যান আর বলখবাসী সন্ধি করে যুদ্ধের আগুন থেকে নিজেদের রক্ষা করুক।

এই সন্ধি ও শান্তিপ্রিয় সুশীলদের একজন হলেন পারভিনের পিতা জাপান। একদিন জাপান সাফওয়ানকে বললেন, আচ্ছা, যদি সন্ধি না হয় এবং যুদ্ধই স্থির হয়, তাহলে কী হবে?

সাফওয়ান বলল, ইরান ও ইসফাহান অতিক্রম করে আর সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার কোনো পরিকল্পনা মুসলমানদের ছিল না। তারা খোরাসান আক্রমণের জন্যও একদম প্রস্তুত ছিল না। তারা চাচ্ছিল, খোরাসান ইয়ায্দাজার্দ-এর শাসনাধীন থাকুক। কিন্তু ইয়ায্দাজার্দ তাতে সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। তিনি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলমানদের অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে বিদ্রোহ করাতে চাইলেন এবং নিজেও সামরিক প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। ফলে বাধ্য হয়ে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) খোরাসানের উপর সেনা-অভিযান পরিচালনার আদেশ জারি করলেন এবং এই নির্দেশনা প্রদান করলেন যে, ইয়ায্দাজার্দকে হয় জীবিত গ্রেফতার করে নিয়ে আস, নতুবা হত্যা করে ফেলো। এখন যদি ইয়ায্দাজার্দ সন্ধি না করেন– ধারণা এটাই যে, তিনি সন্ধি করবেন না– তাহলে যুদ্ধ হবে এবং মুসলমানরা সেই মুহূর্তটি পর্যন্ত লড়ে যাবে, যতক্ষণ-না ইয়াযদাজার্দ-এর পতন ঘটে।

জাপান বললেন, মুসলমানরা যদি বলখ দখল করে নেয়, তাহলে আমাদের কী দশা হবে?

সাফওয়ান বলল, আপনি ও আপনার কন্যা পারভিন আমাদের বিরাট উপকার করেছেন। ইনশাআল্লাহ আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না। আপনারা নিরাপত্তা পাবেন। শুধু তা-ই নয়– আপনি যার জন্য সুপারিশ করবেন, তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে।

জাপান জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু আপনার অফিসার আপনার নিরাপত্তা গ্রাহ্য করবে কি?

সাফওয়ান বলল, মুসলমানদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব আছে, সাম্য আছে। একজন সৈনিকেরও– সৈনিক বলছি কেন– একজন গোলামেরও সেই ক্ষমতা আছে, যা আছে একজন অফিসার, সেনাপতি ও রাষ্ট্রপ্রধানের। কোনো গোলাম যদি কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা জনবসতিকে নিরাপত্তা প্রদান করে, তাহলে সেই নিরাপত্তা সব মুসলমানের পক্ষ থেকে পরিগণিত হয়।

জাপান বিস্মিত হয়ে বললেন, বড় আজব কথা তো!

সাফওয়ান বলল, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সকল মুসলমান যখন সমান, তখন তাদের দায়-দায়িত্বও সমান। আর দায়িত্ব যখন সমান, তখন অধিকার-ক্ষমতাও সমান।

জামাসপ বলল, আজ আমি একটি তথ্য ফাঁস করছি। তা হলো, সাফওয়ান কোনো সাধারণ মানুষ নন। মুসলমানরা হেরাত জয় করার পর ইনি হেরাতের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছেন এবং যে-বাহিনীটি বলখ অবরোধ করেছে, তার সেনাপতি একে এই নিযুক্তি দান করেছেন।

জাপান বললেন, একে প্রথমবার দেখেই আমি বুঝে নিয়েছিলাম, ইনি সাধারণ আরব নন– কোনো সম্মানিত ও ক্ষমতাবান ব্যক্তি হবেন। আমার ধারণা হলো, ইয়ায্‌দাজার্‌দ পরাজিত হবেন এবং বলখ মুসলমানদের হাতে চলে যাবে। এই পরিস্থিতিতে...।

সাফওয়ান কথা কেটে বলল, ইনশাআল্লাহ আপনাকে, আপনার পরিবারের সকল সদস্যকে এবং আত্মীয়-স্বজনকে কেউ কোনো প্রকার কষ্ট দেবে না।

জাপান বললেন, তার মানে আপনি আমাদের নিরাপত্তা দিয়ে দিয়েছেন?

সাফওয়ান বলল, হ্যাঁ।

জাপান বললেন, আপনাকে ধন্যবাদ। এবার শুনুন, ফারাওয়ান্দা ও ফায়রোজান পারভিন ও জরিনার উপর সন্দেহ করেছে যে, ওরা আরব মেয়েটিকে কারও ইঙ্গিতে অপহরণ করেছে। কয়েকজন মহিলাকে তারা বিষয়টি তদন্তের জন্য এখানে পাঠিয়েছিল। কিন্তু যেহেতু তোমরা বাগানে ছিলে, তাই তারা তোমাদের দেখেনি। তোমরা বাগানের বাইরে এসো না। তবে যদি তারা তোমাদের সন্ধান পেয়েও যায়, আমি জীবন দিয়ে হলেও তোমাদের রক্ষা করব।

সাফওয়ান বলল, আমি আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করছি।

এ-সময় একদিকে বিরাট হট্টগোল শোনা গেল। পারভিন ও জরিনা ওখানে উপস্থিত ছিল না। জাপান ঘাবড়ে ওঠলেন। তিনি বললেন, ইয়ায্‌দান দয়া করুন। ফারাওয়ান্দা ও ফায়রোজান তোমাদের সন্ধান পেয়ে গেল না তো! ওরা লাঠিয়াল-গুন্ডাদের নিয়ে আসছে না তো!

সাফওয়ান বলল, আপনি একদম ঘাবড়াবেন না। ইনশাআল্লাহ কোনো গুন্ডা-বদমাশ আমাদের একবিন্দু ক্ষতি করতে পারবে না।

জাপান চলে গেলেন। সাফওয়ান ও আফীরা সেখানে রয়ে গেল। জামাসপও জাপানের পেছনেই চলে গেল।

সাফওয়ান বলল, না জানি তোমার কারণে কী-কী বিপদ ভোগ করতে হয়।

আফীরা মাথা তুলে মনকাড়া চোখ দুটো দ্বারা সাফওয়ানের প্রতি

তাকিয়ে দূরদর্শিনীর মতো বলল, আমার কারণে তোমাকে আর কোনো বিপদ ভোগ করতে হবে না।

সাফওয়ান আফীরার বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিল। বলল, জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে গেছে। তুমি অপহৃতা হয়েছ। পাহাড়ি অঞ্চলে এসেছ। এক যুবক বিস্ময়কর পন্থায় তোমাকে উদ্ধারও করেছে। জানি না, এই অবদানের মূল্যায়নে তুমি কিছু ভাবছ কিনা!

আফীরা বলল, আবার সেই আয়্‌রিমার্কা কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে।

সাফওয়ান বলল, আচ্ছা, ফায়রোজান যে তোমাকে তুলে আনল, এই হতভাগাও বোধহয় এই রোগের রোগী। তুকি কী জান?

আফীরা বলল, একথা তুমি তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো।

তুমি কবিতায় আমার নাম উচ্চারণ করেছিলে। সান্ত্বনার জন্য আমার এ-ও অনেক।

এই ভরসায় থেকো না।

এবার আমি তোমার আব্বুকে বলব, আমার দাসীর প্রয়োজন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তিনি তোমার হাত আমার হাতে ধরিয়ে দেবেন।

তোমার কথাকে তিনি পাগলের প্রলাপ মনে করবেন।

জান, আমি হেরাতের গভর্নর?

জানি। আর আমি নাহ্‌মা গোত্রের...।

সাফওয়ান কথা কেড়ে নিয়ে বলল, দুলালী।

না, বীরাঙ্গনা মেয়ে।

সাফওয়ান হেসে ওঠল। বলল, এমন বীরনারী যে, কয়েকজন মুখোশধারীকে দেখে ভয় পেয়ে গেছে।

যদি তুমি তখন ওখানে থাকতে...।

তাহলে আমি কোনোমতেই ওদেরকে তোমাকে নিতে দিতাম না। সংখ্যায় ওরা যতই হোক সব কজনকে মাটিতে লুটোপুটি খেতে দেখতে।

অত পারদর্শিতা দেখিয়ো না। কত কী পারতে, থাকলে বুঝতাম।

হঠাৎ সাফওয়ানের কী একটা কথা মনে পড়ে গেল। বলল, একটা কথা বলো তো আফীরা!

আফীরা বলল, ক্ষমা করো ভাই। তোমার চাহনিতে দুষ্টুমির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

সাফওয়ান বলল, আমি ফ্রেগাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি।

বলো, কী জিজ্ঞেস করবে?

তোমার অপহরণে ওর হাত ছিল কি?

আমার ধারণা, ওর অবশ্যই আগে মুখোশধারীদের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছিল। কারণ, ওরা যেদিক থেকে আসছিল, ওদিকে ওর মুখ ছিল। ফলে ওদের আগমন নিশ্চয়ই দেখেছে। অথচ আমাকে সাবধান করেনি।

জামাসপও এমনটি মনে করে।

এ-সময় জামাসপ ও জাপান ফিরে এল। জাপান কিছুটা উদ্বিগ্ন। তবে জামাসপ নিশ্চিন্ত। জামাসপ বলল, মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে এসেছে। ইয়ায্‌দাজার্‌দও দুর্গ ত্যাগ করে বাইরে চলে এসেছেন। মজুসি সৈন্যরাও মোকাবেলার জন্য সারিবদ্ধ হতে শুরু করেছে। দুর্গের অধিবাসীরা সৈন্যদের উৎসাহিত করতে পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে হল্লা করছে।

সাফওয়ান বলল, মুসলমানরা যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। অথচ আফসোস, আমি পিঞ্জিরায় আবদ্ধ হয়ে আছি।

জাপান বলল, তুমি কী করতে?

সাফওয়ান বলল, যদি ময়দানে পৌঁছে যেতে পারতাম, তাহলে যুদ্ধ করতাম। আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন?

জাপান বলল, কী সাহায্য চাও তুমি?

আপনি কোনো প্রকারে আমাকে দুর্গ থেকে বাইরে বের করে দিন। তাতে আপনারও বিরাট উপকার হবে। আমি সেনাপতিকে আপনাদের অনুগ্রহের কথা অবহিত করব।

জাপান বললেন, আমি চেষ্টা করব।

একান্ন.

ইসলামি বাহিনীর সেনাপতি আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.)-এর বাহিনী বলখের সম্মুখে এসে অবস্থান গ্রহণ করেছে। আর মজুসি গোয়েন্দারা দুর্গের ভেতরে ও বাইরে তথ্য সংগ্রহে তৎপরতা চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে তারা তথ্য সরবরাহ করেছে যে, মজুসি সৈন্যের সংখ্যা পঁচাত্তর হাজারেরও বেশি। তবে তাদের মাঝে বীরত্বপূর্ণ জোশ-জযবা নেই। অবশ্য তরুণ-যুবক নাগরিকদের মাঝে বেশ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আহনাফ (রা.) অপেক্ষা করলেন, মজুসিরা আগ বাড়িয়ে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হোক। কিন্তু তারা এই সাহস দেখাল না। কিন্তু যেহেতু আহনাফ যুদ্ধকে দীর্ঘতা দান করায় আগ্রহী নন, তাই একদিন তিনিই তার বাহিনীকে

রণাঙ্গনে নামিয়ে দিলেন। তিনি মায়মানা, মায়সারা ও কাল্‌ব গঠন করলেন। বিষয়টি মজুসিরা দেখল। তারা ইয়ায্‌দাজার্‌দকে অবহিত করল। ইয়ায্‌দাজার্‌দ দুর্গের সৈন্যদেরকে সারিবদ্ধ করে দিলেন।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর জানা ছিল, ইসলামি বাহিনীর সেনাসংখ্যা তার বাহিনীর তুলনায় খুবই কম। তাই তিনি যুদ্ধের ডংকা বাজিয়ে আক্রমণের আদেশ জারি করলেন। ইরানি সৈন্যরা এমন ধারায় অগ্রসর হলো, যেন উত্তাল সমুদের বিক্ষুব্ধ ঊর্মিমালা ধেয়ে আসছে। স্বেচ্ছাসেবী মজুসি যুবকরাও বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে।

মুসলমানরা বুঝে ফেলল, মজুসিরা প্রথা অনুযায়ী একজনে-একজনে, দুজনে-দুজনে যুদ্ধের সূচনা করতে চাচ্ছে না। বরং তারা একযোগে ব্যাপক আক্রমণের লক্ষ্যে এগিয়ে আসছে। সেজন্য তারাও মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। তাদের ধারণা ছিল, মজুসিরা তির দ্বারা যুদ্ধের সূচনা করবে। কিন্তু যখন দেখল যে, তারা অগ্রসর হচ্ছেই, তখন বুঝে নিল, না, তারা হাতাহাতি যুদ্ধ করতে চাচ্ছে। তাই তারাও তিরে হাত লাগাল না।

মুসলমানদের অগ্রবাহিনীতে আলকামা ইবনুন-নায্‌রি, মায়সারায় রিবয়ী ইবনে আবী আকীল আছ-ছাকাফি, কাল্‌বে আহনাফ ইবনে কায়েস এবং সাকায় ইবনে উম্মে গাযাল আল-হামাদানি কমান্ডার নিযুক্তি হলেন।

অনুরূপ ইয়াযদাজার্‌দও অগ্রে, মায়মানায় ও মায়সারায় তার বিখ্যাত কমান্ডারদের নিযুক্তি দিলেন।

মুসলমানরা আপন জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে আছে। মজুসিরা অগ্রসর হচ্ছে। তারা খাপখোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে রেখেছে। রোদের মধ্যে তরবারিগুলো ঝিকমিক করছে।

যখন মজুসিরা মুসলমানদের অনেক কাছে চলে এল, তখন আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) প্রথমবারের মতো আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুললেন। মুসলমানরা সতর্ক হয়ে গেল। যখন উভয় বাহিনীর মধ্যকার দূরত্ব আরও কমে এল, তখন আহনাফ (রা.) দ্বিতীয় ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। এবারকার তাকবীরধ্বনি শোনামাত্র মুসলমানরা কোষ থেকে তরবারিগুলো বের করল।

ঠিক এ-সময় মজুসিরা অগ্রসর হয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে বসল। মুসলমানরা ঢাল দ্বারা তাদের আক্রমণ প্রতিহত করল। কিন্তু তারা নিজেরা আক্রমণ করল না। তাদের কোষমুক্ত তরবারিগুলো মাথার উপর উত্তোলিত হয়ে চমকাতে শুরু করল।

মুসলমানদের নিয়ম ছিল, তাদের কমান্ডার তিনবার তাকবীরধ্বনি তুলত। প্রথম ধ্বনিতে মুসলিম সৈন্যরা সতর্ক হয়ে যেত। দ্বিতীয় ধ্বনিতে অস্ত্র সামলে নিত এবং তৃতীয় ধ্বনিতে আক্রমণ চালাত। আজকের যুদ্ধে সেনাপতি এখনও তৃতীয় ধ্বনি উচ্চারণ করেননি। তাই তারা নিজেরা আক্রমণ করে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকল।

এবার আহনাফ ইবনে কায়েস তৃতীয় ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। জবাবে সমস্ত মুসলিম সৈনিক সমকণ্ঠে চিৎকার করে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলল। তাদের এই আকাশ-কাঁপানো ধ্বনি শুনে মজুসিরা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠল। তাদের ঘোড়াগুলো ভড়কে গেল এবং তাদের রনডংকার আওয়াজ এই তাকবীরের আওয়াজের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল।

সেনাপতির তৃতীয় ধ্বনির জবাব দিয়েই মুসলমানরা যার-যার অঙ্গন থেকে সম্মুখপানে এগোতে শুরু করল। বিশেষ করে অগ্রবাহিনীর ইউনিটগুলো জোরদারভাবে মজুসিদের উপর আক্রমণ শুরু করল। তাদের নাঙা তরবারিগুলো চকমকিয়ে ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হলো এবং মজুসিদের ঢাল ফস্‌কে-ফস্‌কে সৈনিক ও ঘোড়াগুলোর গায়ে গিয়ে আঘাত হানতে শুরু করল। প্রথম আক্রমণেই মুসলমানরা বহুসংখ্যক মজুসিকে আহত করে তুলল। আহত সৈনিকরা ভূ-তলে লুটিয়ে ছটফট করতে শুরু করল।

মজুসিরা উদ্দীপ্ত ও উত্তেজিত হয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাল। তাদের আক্রমণে অল্প কজন মুসলমান আহত হলো। এভাবে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এবং ধীরে-ধীরে যুদ্ধের গতি বাড়তে লাগল। কম-বেশি উভয়পক্ষে আহত ও নিহত হতে শুরু করল।

মুসলমানদের অগ্রবাহিনী মজুসিদের সারিগুলো ভেদ করে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে এবং তাদের মেরে-কেটে অগ্রসর হচ্ছে। মজুসিরা পায়ে-পায়ে তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু মুসলমানদের বীরত্ব প্রমাণ করছে, তারা প্রতিহত হতে ময়দানে অবতীর্ণ হয়নি। তারা পরম উদ্দীপনা ও প্রবল বীরত্বের সঙ্গে মজুসিদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। জীবনপাত ও রক্তপাত ঘটিয়ে তারা সম্মুখপানে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা প্রতিপক্ষের একটি সারিকে তছনছ করে আরেকটির উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। তারপর আরেকটির উপর।

মুসলমানরা মজুসিদের যে-সারিগুলোকে ভেদ করে যাচ্ছে, তাদের মাঝে যুদ্ধের স্পৃহা বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু পেছনের সারিগুলো থেকে এগিয়ে-আসা-

মুসলমানরা সেগুলোতে ছড়িয়ে গিয়ে পরম সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করছে। মজুসিরা মুসলমানদের উপর আর মুসলমান মজুসিদের উপর জোরদার আক্রমণ চালাচ্ছে।

এতক্ষণে যুদ্ধ অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। অত্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ চলছে। মুসলমান মজুসিদেরকে মজুসিরা মুসলমানদেরকে হত্যা করছে। মাথার উপর মাথা, দেহের উপর দেহ লুটিয়ে পড়ছে। রক্তের বৃষ্টি হচ্ছে। যোদ্ধারা রক্তে রঞ্জিত হয়ে চলছে।

উভয় পক্ষ্যেই চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। অত্যন্ত জোশ, উদ্দীপনা ও শক্তিমত্তার সঙ্গে আক্রমণ চালাচ্ছে। মজুসিরা এই বুঝে আক্রমণ করেছিল যে, মুসলমানরা সংখ্যায় নগণ্য; দু-চারটি আক্রমণেই তারা পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু যখন মুসলমানরা উলটো তাদের সারি ভেদ করা এবং অবলীলায় তাদের হতাহত করা শুরু করল, তখন তাদের ধারণা পালটে গেল এবং আত্মরক্ষার লড়াই লড়তে বাধ্য হলো।

মুসলমানরা অত্যন্ত জোরদার আক্রমণ চালাচ্ছে এবং অতিশয় জোশ-জযবা ও শক্তিমত্তার সঙ্গে তরবারি পরিচালনা করছে। তাদের রক্তপিপাসু তরবারিগুলো মৃত্যুর ফেরেশতায় পরিণত হয়েছে। তাদের তরবারি যারই মাথায় গিয়ে আঘাত হানছে, মাথাটা দু-ভাগ করে ফেলছে। যার কাঁধে পতিত হচ্ছে, পাঁজর পর্যন্ত ফাঁক করে দিচ্ছে। যার ঘাড়ে পতিত হচ্ছে, তার মস্তক উড়িয়ে দিচ্ছে।

ঘোর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। লাশের উপর লাশ পড়ছে। রক্তের নালা প্রবাহিত হচ্ছে। মুসলমানদের বীরোচিত আক্রমণ মজুসিদের মনে ভয় ধরিয়ে দিতে শুরু করেছে। যুদ্ধের অঙ্গন প্রতি মুহূর্তে সম্প্রসারিত হচ্ছে। মুসলমানরা মজুসিদের সারি ভেঙে-ভেঙে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে।

যে-সময় এ-ময়দানে যুদ্ধ চলছিল, তখন জামাসপ, সাফওয়ান ও জাপান দুর্গের পাঁচিলের দেওয়াল ভাঙছিল। জাপানের বাড়িটা পাঁচিলের ঠিক নিচে। সাফওয়ানের আবেদন অনুযায়ী জাপান তাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন, ঠিক আছে তুমি পাঁচিল ভেঙে বেরিয়ে যাও।

অল্পক্ষণের মধ্যেই পাঁচিলে এত বড় একটা ছিদ্র হয়ে গেল, যার মধ্যদিয়ে একসঙ্গে দুজন মানুষ যাওয়া-আসা করতে পারবে। সাফওয়ান জাপানকে বলল, আমি বলেছি, ইয়ায্‌দাজার্‌দ পরাজয়বরণ করবেন এবং দুর্গ অবশ্যই মুসলমানদের দখলে চলে যাবে। আপনি যদি মুসলমানদেরকে

আরও বেশি কৃতজ্ঞতাপাশে আটকাতে চান, তাহলে এপথে তাদেরকে দুর্গে ঢুকতে অনুমতি দিয়ে দিন।

জাপান নিমরাজি হয়ে গেলেন। সাফওয়ান ছিদ্রপথে ঝটপট বাহিনীতে পৌঁছে গেল এবং মায়সারার কমান্ডার রিবয়ী ইবনে আমেরের সঙ্গে সাক্ষাত করে সব ঘটনা ব্যক্ত করে এক হাজার সৈনিকের জন্য আবেদন জানাল।

কমান্ডার রিবয়ী ইবনে আমের তৎক্ষণাৎ তাকে এক হাজার সৈনিক দিয়ে দিলেন। এরা দশ-দশজন ও বিশ-বিশজনের দলে বিভক্ত হয়ে পাঁচিলের কাছে পৌঁছে গেল এবং ছিদ্রপথে দুর্গের ভেতরে ঢুকে জাপানের বাড়িতে গিয়ে সমবেত হতে শুরু করল।

যখন পুরো এক হাজার সৈনিক এসে পড়ল, তখন সাফওয়ান তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হলো এবং গলিপথ অতিগক্রম করে বড় রাস্তায় গিয়ে ওঠল। মুসলমানদের দেখামাত্র মজুসিরা ভয়ে-আতঙ্কে কাঁপতে শুরু করল এবং পালিয়ে ঘরে-ঘরে ঢুকে যেতে লাগল।

সাফওয়ান সোজা পাঁচিলের উপর উঠে গেল। পাঁচিলে মজুসি সৈনিক খুব অল্প ছিল। এরা পৌঁছেই ওদের মেরে-কেটে সাফ করে ফেলল এবং বলখের দুর্গ থেকে ইরানি পতাকা নামিয়ে ইসলামি পতাকা উড়িয়ে দিল।

এ-সময় পাঁচিলের উপর যত মুসলমান ছিল, সবাই উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে ওঠল।

ইয়ায্দাজার্দ ও তার সহচররা হঠাৎ সচকিত হয়ে ওদিকে তাকাল। পাঁচিলের উপর মুসলমানদের দুঃসাহসিকতা দেখামাত্র তাদের বীরত্ব পানি হয়ে গেল। ইয়ায্দাজার্দ ধরে নিলেন, তার পরাজয় অবধারিত হয়ে গেছে। তিনি মনোবল হারিয়ে শেয়ালের মতো লেজ গুটিয়ে পালাতে শুরু করলেন।

সম্রাটের পলায়নে সৈনিকদের পা উপড়ে গেল। এ-যুদ্ধেও মজুসিদের শোচনীয় পরাজয় ঘটল। তারা চতুর্দিক থেকে পালাতে লাগল। মুসলমানরা ধাওয়া করে-করে তাদের হত্যা ও গ্রেফতার করতে শুরু করল।

ইয়ায্দাজার্দ যদি সাহসিকতার পরিচয় দিতেন, মনোবল না হারাতেন এবং দূরদর্শিতার সঙ্গে সৈন্যদের কাজে লাগাতেন, তাহলে হয়ত তাকে পরাজয় বরণ করতে হতো না।

কিন্তু মুসলমানদেরকে পাঁচিলের উপর দেখামাত্র তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠলেন। ফলে তাকে পরাজিত হতে হলো।

বায়ান্ন.

সাফওয়ান আরও একটি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এই দিল যে, যখন সে পাঁচিলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন পঞ্চাশজন সৈনিকের একটি ইউনিটকে দুর্গের ফটক দখল করতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছিল, কোনো মজুসিকে দুর্গ থেকে বের হতেও দেবে না, কাউকে ঢুকতেও দেবে না। শুধু মুসলিম সৈনিকদেরকে দুর্গে ঢুকতে দেবে।

এই ইউনিটটি ফটকে গিয়ে প্রহরীদের হত্যা করে ফেলল এবং দখল করে ফটকটি খুলে দিল। সাফওয়ানের ধারণা ছিল, মজুসিরা পরাজিত হয়ে যখন পালাতে শুরু করবে, তখন তারা দুর্গে ঢোকার চেষ্টা করবে। কিন্তু তারা দুর্গের দিকে ফিরেও তাকাল না, সোজা জায়হুন নদীর দিকে পালিয়ে গেল। দুর্গের পাঁচিলের উপর ইসলামি পতাকা উড়তে দেখার পর ওমুখো না-হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল।

ইয়াযদাজার্দ নিজে রণাঙ্গনে উপস্থিত থেকে যুদ্ধে পরাজিত হলেন। আর এই পরাজয়ের ঘটনা ঘটল এমন পরিস্থিতিতে যে, তার কাছে মুসলমানদের কয়েকগুণ বেশি সৈন্য ছিল। অথচ তিনি জানতেন, এ-যুদ্ধে পরাজিত হলে তার শেষ আশাটুকুও নিঃশেষ হয়ে যাবে। সেজন্য তাকে যুদ্ধে জীবনের বাজি লাগানোর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ভীতি ও শঙ্কা তাকে এমনভাবে চেঁপে ধরল যে, ভিনি শক্তপায়ে দাঁড়াতে পারলেন না– পালাতে বাধ্য হলেন।

আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.)-ও পাঁচিলের ইসলামি পতাকা ও মুসলিম সৈনিকদের দেখলেন। তিনি খুব বিস্মিত হলেন যে, মুসলমানরা দুর্গে ঢুকল কীভাবে! অনেক চিন্তা করলেন; কিন্তু কিছুই মাথায় ধরল না। মুসলমানরা অনেক দূর পর্যন্ত মজুসিদের ধাওয়া করল। যখন তারা আয়ত্বের বাইরে চলে গেল, তখন মুসলমানরা ফিরে এল।

আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) সর্বাগ্রে মজুসিদের সেনানিবাস দখল করলেন। এখানে বিপুল পরিমাণ গনিমত মুসলমানদের হস্তগত হলো।

তারপর তিনি শহীদদের একত্রিত করে তাদের জানাযার নামায আদায় করলেন এবং বড়-বড় গর্ত খুঁড়ে এক-একটি গর্তে কয়েকজন করে শহীদকে যুদ্ধের পোশাকে দাফন করলেন।

মুসলমান শহীদ হয়েছেন তিনশো পঞ্চাশজন। মজুসি মারা গেছে প্রায় আড়াই হাজার। পাঁচ হাজারেরও বেশি মজুসি মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার হয়েছে।

আহনাফ (রা.) তাঁর বাহিনীটিকে ক্যাম্পেই থাকতে দিলেন। মুসলমানরা ছাউনি থেকে তাদের মালপত্র নিয়ে এল।

এবার আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) কয়েকজন কমান্ডারকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গের দিকে অগ্রসর হলেন। এতক্ষণে সাফওয়ান দুর্গের দখল বুঝে নিয়েছে। সে-ও কয়েকজন অশ্বারোহীকে নিয়ে আহনাফ (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রওনা হয়েছে। দুর্গের ফটকে পৌঁছুলে দেখতে পেল, কয়েকজন বিশিষ্ট মজুসি বাইরে বের হওয়ার জন্য ফটকের প্রহরীদের কাছে বিনীত আবেদন জানাচ্ছে। কিন্তু প্রহরীরা অনুমতি দিচ্ছে না। মজুসিরা খুবই পীড়াপীড়ি করছিল। প্রহরীরা সাফওয়ানকে দেখেই বলল, ওই তো আমাদের কমান্ডার এসে পড়েছেন। আপনারা তার থেকে অনুমতি নিন।

মজুসিদের একজন ফায়রোজান, একজন ফারাওয়ান্দা এবং আরও দুজন। ফায়রোজান সাফওয়ানকে চিনে ফেলেছে। কিন্তু সাফওয়ান তাকে চিনতে পারেনি। ফায়রোজান তার কাছেও বের হওয়ার আবেদন জানাল। এখনও সাফওয়ান কোনো উত্তর দেয়নি, এমন সময় জামাসপ এসে হাজির। ফায়রোজানকে দেখেই জামাসপ বলল, আহরামান তোকে ধ্বংস করুন; যাচ্ছিস্ কোথায় তুই?

ফায়রোজান জামাসপের প্রতি তাকাল। কিন্তু তার চোখের চাহনি বলছিল, জামাসপকে সে চেনেনি। সাফওয়ান জামাসপকে জিজ্ঞেস করল, চেন নাকি একে? কে লোকটা?

জামাসপ বলল, এ-ই তো সেই বজ্জাত, যে আপামণিকে অপহরণ করে এনেছিল।

সাফওয়ানের শরীরটায় যেন আগুন ধরে গেল। রাগে-ক্ষেতে চোখ দুটো লাল হয়ে গেল। কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এরই মধ্যে ফায়রোজান ঝটপট খাপ থেকে তরবারি বের করল এবং সাফওয়ানের উপর আক্রমণ চালাতে উদ্যত হলো। জামাসপ ঝট করে খঞ্জরের বাঁট দ্বারা তার ডান হাতের কব্জির উপর আঘাত হানল। তাতে তরবারিটা হাত থেকে ছুটে পড়ে গেল। মুসলমান রক্ষীরা তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে গ্রেফতার করে ফেলল।

এ-সময় আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) ফটকে প্রবেশ করলেন। সাফওয়ানকে দেখেই বিস্মিত হয়ে ওঠলেন। বললেন, কী ব্যাপার, তুমি?... তুমি এখানে কীভাবে?

সাফওয়ান মেজাজটাকে স্বাভাবিক করে সেনাপতিকে সালাম করলেন। আহনাফ (রা.) সাফওয়ানকে বলখের দুর্গের ভেতরে দেখে এতটাই বিস্মিত

হলেন যে, সালাম দিতে ভুলে গেলেন। আগন্তুক হিসেবে তাঁকেই আগে সালাম দেওয়ার কথা ছিল। সাফওয়ান সালাম দিলে তিনি খুবই লজ্জিত হলেন। সালামের উত্তর দিয়ে তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন, তোমাকে দেখে আমি এতটাই বিস্মিত হয়েছি যে, সালামের কথা ভুলে গেছি।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি হেরাত থেকে এখানে কীভাবে এসেছ?

সাফওয়ান বলল, আল্লাহ এনেছেন। তিনি একটি অজুহাত তৈরি করে দিয়েছেন, যার পথ ধরে আমি এখানে এসে পড়েছি এবং বলখের দুর্গজয়ে অংশগ্রহণ করেছি।

আহনাফ (রা.) আবারও বিস্ময় প্রকাশ করলেন। বললেন, তার মানে মুসলমানদেরকে দুর্গে তুমি ঢুকিয়েছ?

সাফওয়ান বলল, আপনার আগমনের আগেই আমি দুর্গে এসেছিলাম। জাপান নামক এক সম্মানিত মজুসির বাড়িতে উঠেছিলাম। আজ যখন আপনি যুদ্ধ শুরু করে দিলেন, তখন আমি আর বসে থাকতে পারলাম না। জাপানের কাছে আবেদন জানালাম, আমাকে দুর্গ থেকে বের হওয়ার সুযোগ করে দিন। তার বাড়ির দেওয়াল ছিল পাঁচিলের সঙ্গে লাগোয়া। সেই দেওয়াল ভেঙে ফেললেন। আমি দুর্গের বাইরে এলাম এবং এক হাজার মুসলমানকে এনে পাঁচিলে উঠিয়ে দিলাম। বুরুজ থেকে মজুসি পতাকা নামিয়ে ইসলামি পতাকা উড়িয়ে দিলাম।

আহনাফ (রা.) বললেন, তোমার এই অভিযানই ইয়ায্দাজার্দকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে পালাতে বাধ্য করেছিল। এই জয়ের কৃতিত্ব আমি তোমার মাথায় রাখলাম।

সাফওয়ান বলল, দুর্গজয়ের অভিযানে জাপান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। আমি তাকে, তার পরিবারের সকল সদস্যকে এবং আত্মীয়-স্বজনকে নিরাপত্তা দিয়েছি।

আহনাফ (রা.) বললেন, তুমি খুব ভালো করেছ। জাপান যত লোকের জন্য সুপারিশ করবে, আমি তাদের প্রত্যেককে নিরাপত্তা দেব।

ঘটনাক্রমে তখন জাপানও সেখানে এসে হাজির হলো। লোকটি আরবি জানে না। জামাসপ তাকে সেনাপতির বক্তব্য ফারসিতে অনুবাদ করে শোনাল। তিনি খুব খুশি হলেন। সাফওয়ান সেনাপতির সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেনাপতি আহনাফ (রা.) তার কৃতজ্ঞতা আদায় করলেন।

জাপান সেনাপতিকে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন। সাফওয়ান বলল, চলুন, ওখানে বসে আপনাকে বলব, আল্লাহ আমাকে এখানে কীভাবে এনেছেন।

সেনাপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। সাফওয়ান জামাসপকে বলল, ফায়রোজানকেও ওখানে নিয়ে আস।

সেনাপতি আহনাফ (রা.) ভেতর থেকে দুর্গটা দেখলেন। বিশাল এলাকা। পাঁচিল আগেই দেখেছেন। খুবই মজবুত ও দুর্ভেদ্য। এই দুর্গ জয় করা সহজ ছিল না। তিনি বললেন, মহান আল্লাহ দয়া করে এমন সূত্র তৈরি করে দিয়েছেন, যার বদৌলতে আমরা অতি সহজে দুর্গটি জয় করে নিতে সক্ষম হয়েছি। ইয়ায্‌দাজার্‌দ সামান্য মোকাবেলা করেই পালিয়ে গেল আর আমরা দুর্গ জয় করে নিলাম।

সেনাপতি আহনাফ (রা.) জাপানের বাড়িতে গেলেন। জাপান তাঁর জন্য গালিচার ফরাশ তৈরি করলেন। কিন্তু তিনি গালিচায় বসলেন না। বললেন, আল্লাহর জমিন অপেক্ষা উন্নত ফরাশ আর নেই। বলেই তিনি মাটিতে বসে পড়লেন। তাঁর একপার্শ্বে সাফওয়ান বসল। সম্মুখে জাপানও মাটিতে বসে পড়ল। জামাসপ ফায়রোজান ও তার সঙ্গী বন্দিদের নিয়ে এসেছে। আহনাফ (রা.) সাফওয়ানকে উদ্দেশ করে বললেন, এবার বলো, এখানে তুমি কীভাবে এসেছ?

সাফওয়ান বলল, হেরাতে কমান্ডার আমের আহত হয়েছিলেন, সে তো আপনি জানেন। তাঁর এক মেয়ে ছিল আফীরা। এই হতভাগা (ফায়রোজানকে দেখিয়ে) তাকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছে।

সাফওয়ান সেনাপতিকে আফীরার পুরো ঘটনা শোনাল– তার অপহরণ, নিজের ও জামাসপের তার অনুসন্ধানে বের হওয়া সব ঘটনা। জামাসপ জরিনা ও পারভিনের ইতিবৃত্তও শোনাল। শুনে সেনাপতি আহনাফ (রা.) বললেন, জামাসপ অনেক বড় কাজ করেছে। আমি তার কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। জরিনা এখন কোথায় আছে?

জরিনা, আফীরা ও পারভিন দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। জরিনা এগিয়ে এসে সেনাপতিকে অভিবাদন জানাল। সেনাপতি তাকে দু'আ দিলেন এবং তার কৃতজ্ঞতা আদায় করলেন। জরিনা বলল, পারভিন আমাদের অনেক সাহায্য করেছে।

সেনাপতি পারভিনকে তলব করলেন। পারভিন এসে সেনাপতিকে অভিবাদন জানাল। সেনাপতি তাকেও দু'আ দিলেন এবং তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

জামাসপ সেনাপতিকে অবহিত করল, ফায়রোজান দুর্গের ফটকে সাফওয়ানের উপর সংহারী আক্রমণ করেছিল। তার ব্যাপারে আদেশ কী?

আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) ফায়রোজানের প্রতি তাকালেন। বললেন, এ এক আরব দুহিতাকে অপহরণ করে বিপদে ফেলেছে। আবার হত্যার উদ্দেশে একজন মুসলমানের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

ফায়রেজানকে যখন সেনাপতির আদেশ সম্পর্কে অবহিত করা হলো, তখন সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, আমি ইসলাম গ্রহণ করছি।

ইসলামের বিধান হলো, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কোনো অমুসলিম যুদ্ধাপরাধী যদি ইসলাম কবুল করে নেয়, তাহলে তার দণ্ড মওকুফ হয়ে যায়।

ফায়রোজানকে ইসলামে দীক্ষিত করে নেওয়া হলো এবং বিধান অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ তার দণ্ড মওকুফ করে তাকে মুক্তি দেওয়া হলো। মুসলমানদের এই বিধান ও বিষয়টি জাপানের মনে খুব প্রভাব সৃষ্টি করল। ফলে তিনিও কন্যা পারভিনসহ মুসলমান হয়ে গেলেন।

আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) জাপানকে বেশ মর্যাদা দিলেন। বলখের গভর্নরের সমস্ত জায়গির তাকে দিয়ে দিলেন এবং তাকে এই অধিকার প্রদান করলেন যে, তুমি যাকে ইচ্ছা নিরাপত্তা দিয়ে দাও।

বলখের দুর্গ মুসলমানদের পদানত হয়ে গেল। বলখবাসী জাপানের মাধ্যমে জিযিয়া আদায় করে নিরাপত্তা নিয়ে নিল। তিনি সেনাপতিকে সুপারিশ করিয়ে বহু গরিব নাগরিকের জিযিয়া মওকুফ করিয়ে দিলেন। তাতে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল এবং তিনি সকলের প্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে গেলেন।

সেনাপতির অনুমতিক্রমে সাফওয়ান আফীরার উদ্ধার ও বলখজয়ের সুসংবাদ দিয়ে হেরাতে আমেরের কাছে একজন দূত প্রেরণ করল। বলখের দুর্গ থেকেও বিপুল পরিমাণ মালে-গনীমত হস্তগত হলো। এই গনীমত মুসলমানদের মাঝে বণ্টিত হলো।

তেপ্পান্ন.

ইয়ায্‌দাজার্‌দ ও তার বাহিনী এমন বিপর্যস্ত হয়ে পলায়ন করেছিল যে, জায়হুন নদীর কূলে গিয়েই তবে শ্বাস নিল। খোরাসানের সীমান্ত জায়হুন পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। নদীর ওপারে তুর্কিস্তানের সীমান্ত। তুর্কিস্তানের রাজধানী হলো ফারগানা। সেকালে তুর্কিস্তানের সম্রাটের উপাধি ছিল খাকান।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ একটি নয়– সাহায্যের আবেদন জানিয়ে খাকানের কাছে

কয়েকটি পত্র প্রেরণ করেছেন। কিন্তু খাকান বিষয়টিকে মোটেও গুরুত্ব দেননি। মুসলমানরা তার থেকে অনেক দূরে ছিল। তিনি শুনেছেন, যে-রাষ্ট্র মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার উপর আক্রমণ চালিয়ে মুসলমানরা দেশটিকে তছনছ করে ফেলে। তাই তিনি অযথা মুসলমানদের শত্রুতা ক্রয় করতে চাচ্ছিলেন না। আর সেজন্যই তিনি ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর কোনো পত্রের উত্তর দেননি।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ যখন জায়হুনের তীরে গিয়ে উপনীত হলেন, তখন বহুসংখ্যক ইরানি সৈন্য মানসিক বিপর্যয়ের কারণে নদীতে পড়ে গেল এবং ঘোড়াসহ পানিতে ডুবে গেল।

জায়হুন ছিল তুর্কিস্তান ও খোরাসানের সীমানানির্ধারক নদী। কোনো এককালে তুর্কিস্তানের সম্রাট ছিলেন আফরাসিয়াব আর ইরানের সম্রাট ছিলেন কাউস। দীর্ঘদিন যাবত দুজনের সম্পর্ক ছিল বিরোধপূর্ণ। প্রায়ই দুই দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ হতো। যুদ্ধ দুজনকেই ধ্বংসের অতলে তলিয়ে দিল। কিন্তু জায়হুন নদী সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত একই গতিতে প্রবহমান রয়েছে।

নদীটি ছিল খুবই চওড়া ও গভীর। নৌযান ছাড়া পার হওয়া যেত না। ইয়ায্‌দাজার্‌দ ও তার সৈনিকদের জন্য অনেকগুলো নৌকার ব্যবস্থা করা হলো। এই বাহিনী কয়েক দিনে নদী পার হয়ে গেল। মুসলমানরা যদি এই বাহিনীটিকে ধাওয়া করে এগিয়ে যেত, তাহলে নদী পার হওয়া তাদের পক্ষে কঠিন হতো। বিপুলসংখ্যক মজুসি নদীতে ডুবে মারা যেত, এমনকি ইয়ায্‌দাজার্‌দও যদি ডুবে মরত কিংবা মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার হতো, তাহলে বিস্ময়ের কোনো কারণ থাকত না।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ নদী পার হয়ে ফারগানার দিকে অগ্রসর হলেন। খাকানকে তার আগমনের সংবাদ জানালেন। তিনি রাজকীয় জাঁকজমকের সঙ্গে পথ অতিক্রম করছিলেন। তার কাছে এখনও বিপুল পরিমাণ ঐশ্বর্য আছে। আছে বহু মাল-সরঞ্জাম, সৈন্য ও দাস-দাসী। তিনি গাশাব গিয়ে পৌঁছুলেন এবং মাঅরাউন্নাহারের দিকে অগ্রসর হলেন। এই নদীটি পার হয়ে তিনি ফারাগানার দিকে রওনা হলেন। ফারগানা সেখান থেকে বেশি দূরে নয়।

সমগ্র তুর্কিস্তানে ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর আগমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। ইরান সম্রাটের দেশ-বিদেশে বেশ খ্যাতি ছিল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তুর্কিস্তানের সকল নাগরিক তাকে একনজর দেখার জন্য পথের দু-ধারে

এসে-এসে সমবেত হতে লাগল। তারা ইরানের রাজকুমারী ও রাজপরিবারের মেয়েদের দেখে খুবই প্রীত ও প্রভাবিত হলো। ওদের প্রতি তাদের মনে সহমর্মিতা ও সহানুভূতি জাগ্রত হলো। আর এই সহানুভূতি মুসলমানদের প্রতি বিরোধ ও বিদ্বেষে পরিণত হতে লাগল। তুর্কিস্তানিরা মুসলমানদের গালমন্দ করতে শুরু করল।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ ফারগানার নিকটে গিয়ে পৌঁছুলেন। খাকান তাকে স্বাগত জানাতে একদল সৈনিকের সঙ্গে কয়েকজন অফিসার ও মান্যবর ব্যক্তিকে প্রেরণ করলেন। তারা এগিয়ে এসে ইয়ায্‌দাজার্‌দকে স্বাগত জানাল এবং ফারগানায় নিয়ে গেল।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ যখন নগরীতে প্রবেশ করলেন, তখন খাকান তার প্রতি খুব সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং রাজ প্রাসাদেরই একটি অংশে থকতে দিলেন। ইরানি সৈন্যরা ফারগানার বাইরে একস্থানে অবস্থান গ্রহণ করল।

কয়েক দিন পর ইয়ায্‌দাজার্‌দ খাকানকে নিবেদন জানালেন, আমি সাহায্য প্রার্থনা করতে এসেছি। আমি পুরোপুরি আশাবাদী যে, আপনি যদি আমাকে সাহায্য দেন, তাহলে আমি মুসলমানদেরকে ইরান থেকে বের করে দিয়ে দেশটির দখল পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হব। এর প্রতিদানস্বরূপ আমি আপনাকে উপঢৌকন দেব এবং যাতায়াতসহ তুর্কি বাহিনীর যাবতীয় ব্যয় আমি বহন করব।

খাকান বললেন, আগে বলুন, আপনার এরূপ বিশাল ও প্রতাপশালী সাম্রাজ্যের–আশপাশের প্রতিটি রাষ্ট্র যাকে সমীহ করত এবং যার সামনে আরব রাজ্যের কোনোই মর্যাদা ছিল না– কীভাবে এমন শোচনীয় পরাজয়ের সম্মুখীন হলো?

ইয়ায্‌দাজার্‌দ বললেন, দেখুন, ভুখা-নাঙ্গা, রুগ্ন ও বলহীন আরবদের মোকাবেলায় আমি আমার অপার শক্তিশালী সৈন্যদের প্রেরণ করেছিলাম। অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছে। কোনো যুদ্ধেই তারা কাপুরুষতা ও দুর্বলতা দেখায়নি। কিন্তু তারপরও প্রতিটি যুদ্ধে আমার সৈন্যদেরই পরাজয় ঘটেছে। তা-ও আবার সংখ্যায় মুসলমানরা ছিল কম– আমরা ছিলাম বেশি। বিষয়টি ভেবে আমিও কোনো কুল পাই না।

খাকান বললেন, আমিও এমনই শুনেছি। আপনার প্রজারা কি আপনাকে সমর্থন জোগায়নি?

প্রজারা আজও আমার সঙ্গে আছে। ইরানের একজন নাগরিকও

মুসলমানদের প্রতি সন্তুষ্ট নয়। সেজন্যই আমার পুরোপুরি বিশ্বাস আছে, আপনি যখন সহযোগী বাহিনী নিয়ে যাবেন, তখন আমার প্রজারা আপনার সঙ্গে থাকবে এবং মুসলমানদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে।

আমার ইচ্ছা আছে, আমি আপনাকে সাহায্য দেব। কিন্তু ভাবছি, আমাকেও পরাজয়বরণ করতে হয় কি-না।

এমনটি কক্ষনো হতে পারে না। আমি তো মনে করি, আপনার আগমনের সংবাদ শুনেই মুসলমানরা পেছনে সরে যেতে শুরু করবে।

আপনি বলখে ভালোভাবে মোকাবেলা করেননি।

আমি মোকাবেলা করেছি। আমার কাছে এত অধিক পরিমাণ সৈন্য ছিল যে, দুর্গে তাদের সংকুলান হয়নি। অধিকাংশ সৈন্য দুর্গের বাইরে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। কিন্তু মুসলমানরা এসে এক-দুদিন অবস্থান করল এবং একদিন যুদ্ধের জন্য ময়দানে বেরিয়ে এল। আমিও দুর্গের সকল সৈন্যকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু কীভাবে জানি না, মুসলমানরা দুর্গে ঢুকে পড়ল এবং তাতে আমার সৈন্যদের সাহস ভেঙে গেল। আমরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে এলাম। মোকাবেলার অভিলাস মনেই রয়ে গেল।

বিষয়টি খুবই বিস্ময়কর। তো যাহোক, আমি আপনাকে সাহায্য দেব এবং আপনার সঙ্গে নিজেও যাব। কিন্তু এর প্রতিদানে উপঢৌকন ছাড়া আরও কিছু চাই।

আপনি যা চাইবেন, আমি সন্তুষ্টচিত্তে তা-ই আপনাকে দেব।

ভেবে-চিন্তে বলুন। পরে অস্বীকার করতে পারবেন না।

আপনি আমার রাজ্য ও রাজ্যের সমুদয় সম্পদ নিয়ে নিন।

আমি সম্মত। আমি বাহিনীকে প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ দিচ্ছি।

খাকান সেদিনই সেনাপতিকে প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ জারি করলেন। তুর্কি সৈন্যরা প্রস্তুতি শুরু করে দিল এবং অল্প কদিনের মধ্যেই প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গেল। একদিন খাকান বিশাল এক বাহিনী নিয়ে ইয়াযদাজার্দ ও তার সৈন্যদের সঙ্গে ইরানের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

এদিকে মুসলিম সেনাপতি আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) খোরাসানের মালে-গনীমত ও বন্দিদেরকে জয়ের সুসংবাদসহ আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। বিজয়ের সংবাদ দিয়ে তিনি যে-পত্রখানা প্রেরণ করেছিলেন, তাতে লিখেছেন

'আল্লাহর ফজলে খোরাসানের সব কটি প্রদেশ জয় হয়ে গেছে। আজ

এই প্রদেশগুলোতে এক আল্লাহর নাম উচ্চারিত হচ্ছে, তাওহীদের আহ্বান চলছে এবং আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। এখন দজলা থেকে শুরু করে জায়হুন পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল ইসলামি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

'ইয়ায্‌দাজার্‌দ পালিয়ে জায়হুন নদী পার হয়ে তুর্কিস্তানে খাকানের কাছে সাহায্যের আবেদন নিয়ে গেছেন। আমি ভবিষ্যত কর্মপন্থা ঠিক করার জন্য অস্থির মনে আপনার আদেশের অপেক্ষায় প্রহর গুণছি।'

দূত যখন মালে-গনীমত ও বন্দিদের নিয়ে মদীনায় পৌঁছুলেন, তখন সংবাদটি সমগ্র নগরীতে ছড়িয়ে পড়ল। গনীমতের সম্পদগুলো মসজিদের আঙিনায় স্তূপ করে রাখা হলো। অল্পক্ষণ পর আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) এসে হাজির হলেন। তিনি মসজিদের আঙিনায় স্তূপ-করে-রাখা মালামালের প্রতি ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কী?

একজন উত্তর দিল, এগুলো মালে-গনীমত।

কোথা থেকে এল?

খোরাসান থেকে।

হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, দূত কোথায়?

একজন উত্তর দিল, মসজিদে আছে।

হযরত উমর (রা.) মসজিদে প্রবেশ করলেন। মসজিদ লোকে পরিপূর্ণ। তিনি মিম্বরের কাছে গিয়ে বসে পড়লেন। দূত উঠে এগিয়ে গিয়ে আদবের সঙ্গে আমীরুল মুমিনীনকে সেনাপতি আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.)-এর পত্রখানা পেশ করলেন। হযরত উমর (রা.) পত্রখানা পাঠ করে বললেন, হায়, খোরাসান ও আরবের মাঝে যদি আগুনের নদী প্রতিবন্ধক হতো!

প্রকৃতপক্ষে হযরত উমর (রা.) পররাজ্য জয় করা পছন্দ করতেন না। কিন্তু পরিস্থিতি বাধ্য করত বলেই তিনি অপারগতাবশত অভিযান প্রেরণ করতেন।

তিনি সেনাপতি আহনাফ (রা.)-এর সাহসিকতা ও বীরত্বের খুব প্রশংসা করলেন এবং বললেন, 'আমি স্বপ্নে যে-লোকটিকে দেখেছিলাম, সে-ই খোরাসান জয় করেছে। লোকটি আহনাফই ছিল। কায়েসের পুত্র আহনাফ প্রাচ্যের মুকুট।'

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) উত্তরে আহনাফ ইবনে কায়েসকে লিখলেন, যে-পর্যন্ত পৌঁছেছ, সেখান থেকে আর সামনে অগ্রসর হয়ো না। দেখো, খাকান ও ইয়ায্‌দাজার্‌দ কী করে।

এই উত্তরপত্র যে-সময় আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.)-এর হাতে পৌঁছুল, তখন গোয়েন্দারা তথ্য নিয়ে এল, খাকান ও ইয়ায্‌দাজার্‌দ দুঃসাহসী সৈন্যদের বহর নিয়ে এগিয়ে আসছে। তারা জায়হুন নদী পার হয়ে গেছে।

বলখের অঞ্চল যুদ্ধের জন্য উপযোগী ছিল না। তার চে উত্তম জায়গা হলো মারাদরোদ। তাই মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) বলখ ছেড়ে দিলেন। তিনি মজুসিদের থেকে যে-জিযিয়া আদায় করেছিলেন, সব ফেরত দিলেন এবং বাহিনী নিয়ে মারাদরোদের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

চুয়ান্ন.

বলখের দখল পরিত্যাগ করে মারাদরোদের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে সেনাপতি আইনাফ (রা.) জিম্মি মজুসিদের থেকে সংগৃহীত জিযিয়ার অর্থ ফেরত দিয়েছিলেন। তাঁর এই ঈমানদারি ও আমানতদারি মজুসিদের উপর খুবই প্রভাব সৃষ্টি করল। তা ছাড়া যেহেতু মুসলমানরা বলখিদের সঙ্গে ব্যাপকভাবে সদ্ব্যবহার দেখাত, তাই তারা মুসলমানদের ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে গিয়েছিল। সে-কারণে মুসলমানরা যখন বলখ ত্যাগ করে রওনা হলো, তখন বলখবাসীদের মনে খুবই আক্ষেপ জাগল। তারা চিৎকার করে বলল, ইয়ায্‌দান তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনুন।

জাপান, পারভিন ও জরিনা সাফওয়ানের সঙ্গে রওনা হলো। সাফওয়ান ও আফীরা আহনাফ (রা.)-এর বাহিনীতে যুক্ত হয়ে গেল। আহনাফ (রা.) তাকে এজন্য আটকে রাখলেন যে, খাকান ও ইয়ায্‌দাজার্‌দ এলে ঘোরতর যে-যুদ্ধটি বাঁধবে, তাতে সাফওয়ানের প্রয়োজন হবে।

কিন্তু জামাসপ সাফওয়ানের সঙ্গে যেতে সম্মত হলো না। এত দিনের সম্পর্কে তার সঙ্গে সাফওয়ানের ঘনিষ্ঠতা জন্মে গেছে। আফীরাকে খুঁজে বের করার কাজে সে অনেক কষ্ট করেছে। তাই আফীরারও তার প্রতি আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। ফলে সাফওয়ান ও আফীরা দুজনের একজনও জামাসপকে ছাড়তে রাজি নয়।

কিন্তু জামাসপ এবার তাদের সঙ্গে যেতে প্রস্তুত নয়। সাফওয়ান মনে করল, লোকটা বোধহয় কোনো কারণে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছে। তাই বলল, ভাইজান, আমি মানুষ। মানুষ থেকে ভুল হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। তুমি নিশ্চয়ই আমার কোনো ভুলে অসন্তুষ্ট হয়েছ। আমি তোমাকে ভাই

বানিয়ে নিয়েছি। তুমি আমার বড় ভাই আর আমি তোমার ছোট ভাই। ছোটরা ভুল করে আর বড়রা ভুল ক্ষমা করে এ-ই জগতের নিয়ম। আমি ক্ষমা চাচ্ছি; তুমি আমাকে মাফ করে দাও।

সাফওয়ানের বিনীত বক্তব্যে জামাসপ খুবই প্রভাবিত হলো। বলল, ইয়ায্দানের কসম, তোমাদের প্রতি আমার কোনোই অসন্তুষ্টি নেই। তুমি কোনো ভুলও করনি। বরং তোমার তরফ থেকে আমি সব সময় মর্যাদা ও ভালবাসাই পেয়ে আসছি। তোমার ও আপামণির প্রতি আমি প্রবলভাবে আন্তরিক। আমি জানি, তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে আমি মনে খুবই কষ্ট পাব। কিন্তু আমি কী করব? আমি যে অপারগ! আমার জীবনেরও একটি লক্ষ্য আছে। অন্যথায় আজকের দিনটি পর্যন্ত আমার বেঁচে থাকার কোনোই আবশ্যকতা ছিল না। এতদিন আমি মরে যেতাম আর আমার হাড়-মাংস মাটির সঙ্গে মিশে যেত। তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে আমি আমার উদ্দেশ্য সাধন করতে যাচ্ছি।

সাফওয়ান বলল, আমাকে বলো, তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কী? যেভাবে তুমি আফীরার সন্ধানে আমার সঙ্গে এসেছ, তেমনি তোমার লক্ষ্য অর্জনে আমিও তোমার সঙ্গে যাব। তুমি আমাকে সাহায্য করেছ; আমিও তোমাকে সাহায্য করব।

জামাসপ বলল, আমার জীবনের উদ্দেশ্য হলো, প্রতিশোধ গ্রহণ। এমন একজন মানুষ থেকে আমাকে প্রতিশোধ নিতে হবে, যার প্রভাব আকাশছোঁয়া, যার ব্যক্তিত্বে মানুষ থরথর করে কাঁপে, যে আমার জীবনকে তিক্ত বানিয়ে তুলেছে এবং যার ধারণায় আমি মরে গেছি।

সাফওয়ান বিস্মিত চোখে জামাসপের মুখের দিকে তাকাল।

জামাসপ বলল, তুমি বিস্মিত হচ্ছ। আমার ইতিবৃত্ত তোমার জানা নেই। তাই তোমার বিস্মিত হওয়া যথার্থ। আফসোস, আজ পর্যন্ত আমি তোমাকে আমার বৃত্তান্ত জানাতে পারিনি! আমি ওয়াদা দিচ্ছি, ইয়ায্দান যদি আমাকে সফল করেন, তাহলে আমি তোমাকে খুঁজে বের করব এবং তোমার কাছে আসব। তখন বলব, কে আমাকে মৃত্যুর মুখে ছুঁড়ে দিয়েছিল। সে কেন আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছিল এবং কী কারণে আমার জীবন তিক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তারপর আর আমি তোমার থেকে আলাদা হব না; গোটা জীবন তোমার সাহচর্যে কাটাব। আর এ-মুহূর্তে আমি তোমাকে অবহিত করছি, তোমার সাহচর্য আর ইসলামি

সভ্যতাকে কাছে থেকে দেখা আমাকে ইসলামের অনেক ঘনিষ্ঠ করে দিয়েছে। আমি মনে-মনে মুসলমান হয়ে গেছি। পরে ফিরে এসে আপনরূপে আত্মপ্রকাশ করে প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দেব।'

সাফওয়ান বলল, তোমার কথাবার্তা আগেও আমাকে বিস্ময়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। আজও আমাকে অবাক করল। কারও কাছ থেকে যদি তোমার ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ নেওয়ার থাকে, নাও। সে যত বড় ব্যক্তিত্বই হোক। কিন্তু আমাকেও সঙ্গে নাও। এক অপেক্ষা দুই ভালো।

জামাসপ বলল, তোমাকে অবশ্যই সঙ্গে নিতাম, যদি-না তোমার জন্য ঝুঁকি মনে করতাম। তুমি সঙ্গী হলে আমার সমস্যা বেড়ে যাবে। আমাকে একাকি থাকা-ই সঙ্গত।

কিন্তু যদি তুমি কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে যাও?

আমি দুর্ঘটন বিপদাপদ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করব। তবে যদি শিকার হয়ে পড়ি, তাহলে সেদিনটি আমার জীবনের শেষ দিন হবে।

সাফওয়ান বলল, আমার একটি আবেদন আছে।

জামাসপ বলল, আবেদন নয়– আদেশ বলো।

সাফওয়ান বলল, না, আবেদনই। এ আদেশ এখানে অচল। তুমি ইসলামকে সত্য বলে বিশ্বাস করছ। মনে-মনে মুসলমান হয়েও গেছ। এখন কালেমা শাহাদাত পাঠ করে প্রকাশ্যে মুসলমান হয়ে যাও।

জামাসপ জিজ্ঞেস করল, তাতে লাভ কী হবে?

সাফওয়ান বলল, একজন মানুষ মুসলমান হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে আল্লাহপাকের একত্ব ও দাসত্বের কথা মুখেও স্বীকার করতে হয় এবং অন্তরেও স্বীকৃতি দিতে হয়। বলেছ, তুমি মনে-মনে মুসলমান। এখন কালেমা পাঠ করে মুখেও স্বীকার করে নাও। তাহলে ইসলামের লক্ষ্যও অর্জিত হবে, তুমিও সত্যিকার মুসলমান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে। যদি আল্লাহ না করুন, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তুমি মারা যাও এবং অমুসলিমদের হাতে জীবন হারাও, তাহলে তুমি শহীদের মর্যাদা পাবে এবং আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

জামাসপ বলল, এই যদি ব্যাপার হয়, তাহলে আমি ঘোষণা দিচ্ছি– আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ– আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।

সাফওয়ান বলল, এই ঘোষণার মাধ্যমে তুমি মুসলমান হয়ে গেছ। একজন মুসলমানের সবচেয়ে বড় কাজ হলো নামায আদায় করা। তুমি অবশ্যই নামায পড়বে।

জামাসপ বলল, নামায আমি এখনও পড়ি এবং ভবিষ্যতেও পড়ব।

জামাসপ চলে গেল। তার বিরুদ্ধে সাফওয়ান ও আফীরা দুজনই ব্যথিত হলো। জরিনাও কষ্ট পেল।

সাফওয়ান ও আফীরা জরিনা, পারভিন ও জাপানকে নিয়ে ইসলামি বাহিনীর সঙ্গে মারাদরোদ চলে এল। মারাদরোদ নগরীর সম্মুখে বিশাল বিস্তৃত এক মাঠ। এ-মাঠের বিস্তৃতি সুদূরে অবস্থিত একটি নদীর তীর পর্যন্ত। নদীটির ওপারেও বিশাল এক ময়দান। তার একদিকে একটি পাহাড়। এই ছোট মাঠটি সবুজ-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ।

আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) বড় মাঠটিতে অবস্থান গ্রহণ করলেন। তার সঙ্গে আছে চব্বিশ হাজার সৈন্য। যেহেতু বলখ থেকে বিপুলসংখ্যক তাঁবু তাদের হস্তগত হয়েছিল, তাই প্রতিজন সৈনিক একটি করে তাঁবু পেয়ে গেছে। এখন এই সুবিশাল মাঠটিতে তাঁবুর শহর আবাদ হয়ে গেছে।

বাহিনীর সঙ্গে নারীরাও আছে। তাদের জন্য নদীর কূলে ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

আফীরা, জরিনা ও পারভিন এখন অন্তরঙ্গ সঙ্গী। পরস্পর আপন বোনের মতো সম্প্রীতি তৈরি হয়ে গেছে তাদের মাঝে। জরিনাও আফীরার মতো উচ্ছল ও প্রাণবন্ত। সমস্ত নারীমহলে আফীরার অপহরণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। যেহেতু মেয়েটি খুবই রূপসী ও চরিত্রবতী ছিল, তাই তার প্রতি সকলের সহমর্মিতা ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এখন সুযোগ পেলেই তার সমবয়সী মেয়েরা তার কাছে এসে অপহরণের কাহিনী শুনছে।

একদিন জরিনা ও আফীরা পানি আনতে নদীতে গেল। নদীটা তেমন চওড়া ও গভীর নয়– খালের মতো। দুই পাড়ে নানা ধরনের গাছের সারি দাঁড়িয়ে আছে। দুজন পা ঝুঁলিয়ে পাড়ে বসে পড়ল। জরিনা বলল, তুমি কি জান আফীরা, সাফওয়ান আমার ভাই?

আফীরা জরিনার মুখপানে তাকিয়ে বলল, এ তো অনেক পুরনো কথা।

জরিনা বলল, সাফওয়ান তোমার জন্য কী পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করেছে, তা-ও তো বোধহয় জান?

আফীরা বলল, না, এ-ব্যাপারে সে আমাকে কিছুই বলেনি।

জরিনা বলল, যদি না বলে থাকে, তাহলে আমার কাছ থেকে শোনো।

তুমি কেন শোনাতে চাচ্ছ?

এইজন্য যে, আমি তোমার কাছে তার সুপারিশ করতে চাই।

কীসের সুপারিশ?

সুপারিশ ঠিক নয়– একটি অনুমতি চাচ্ছি।

কী অনুমতি চাচ্ছ? আফীরার মনে প্রচণ্ড কৌতূহল। মুখে গাম্ভীর্য।

আমি তোমাকে ভাবী বলে ডাকব। জরিনার মুখে দুষ্টু হাসি।

আফীরা লজ্জা পেয়ে গেল। লাজুক মুখে বলল, দুষ্টু মেয়ে।

জরিনা বলল, উপাধি যত মন চায় দাও। কিন্তু অনুমতি দিয়ে দাও।

আফীরা কিছু বলতে চাচ্ছিল। এমন সময় বাহিনীতে কিছু হট্টগোলের শব্দ শোনা গেল। দুজন দাঁড়িয়ে পা উঁচু করে তাকাল। কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। তারা দ্রুত কলসিতে পানি ভরে চলে এল।

ক্যাম্পে পৌঁছেই তারা শুনল, খাকান তুর্কিস্তানের বাহিনী নিয়ে এসেছেন এবং এ-ময়দানেরই শেষ প্রান্তে অবতরণ করেছেন।

পঞ্চান্ন.

খাকান ইয়াযদাজার্‌দ-এর সঙ্গে জায়হুন নদী পার হয়ে বলখ এসে পৌঁছেছেন। যেহেতু মুসলমানরা বলখ খালি করে দিয়েছিল, তাই সেখানে কোনো সংঘর্ষ হলো না। তাতে খাকান ও ইয়ায্‌দাজার্‌দ উভয় সম্রাটেরই সাহস বেড়ে গেল। দুজনই ধরে নিলেন, মুসলমানরা তাদের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছে আর সে-কারণেই তারা বলখ ত্যাগ করে চলে গেছে। তাদের মনে প্রত্যয় জন্মে গেল যে, তারা যতই সম্মুখে অগ্রসর হবে, মুসলমানরা ততই পেছনে সরতে থাকবে। এমনকি তারা ইরান ছেড়ে পালিয়ে যাবে। খাকানের অন্তরটা গর্বে ফুলে গেছে যে, তার ও তার বাহিনীর ভয়ে মুসলমানরা পিছপা হতে শুরু করেছে।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ ও খাকান উভয়েরই সঙ্গে একাধিকজন করে সুরূপা ও সুকণ্ঠী দাসী ছিল। যখন তারা নাচ-গান শুরু করত, তখন দর্শক-শ্রোতারা বিমুগ্ধ ও বিমোহিত হয়ে যেত। প্রায় প্রত্যহই দিনে বা রাতে বিনোদনের আসর জমত। এসব আসরে ইয়ায্‌দাজার্‌দ ও খাকান যার-যার পরিবারের নারী ও যুবতী-তরুণীদের নিয়ে অংশগ্রহণ করতেন। নাচ-গানের সঙ্গে মদপানেরও আসর বসত। বিনোদন যখন তুঙ্গে উঠত, তখন পর্দা উঠে যেত।

তুর্কি মেয়েরা অতটা রূপসী নয়, যতটা সুন্দরী ইরানি মেয়েরা। আবার ইরানি ললনাদের মাঝে বেশি রূপসী রাজকুমারী। যে-কোনো পুরুষের মনপাগলকরা আকর্ষণ যেন তার চেহারায়। হরিণী চোখ দুটো জাদু বর্ষায় যেন সারাক্ষণ।

খাকান মধ্যবয়সী পুরুষ। তার হেরেমে আট-নজন নারী আছে। কয়েকটি মেয়েও আছে তার। দুটি মেয়ে ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর কন্যার চেয়ে বয়সে বড়। কিন্তু রাজকুমারীর প্রতি খাকানের কুনজর পড়ে গেছে। খাকান রাজকুমারীকে ভালবাসতে শুরু করেছেন। কোনো আসরে রাজকুমারী অংশ না নিলে খাকানের জন্য সেই আসর মাটি হয়ে যাচ্ছে।

একদিন আসর বসল। উদ্দাম নৃত্য চলছে। তুর্কি মেয়েরা আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিয়ে নাচছে। বাজনা বাজছে। মদপানের পালা চলছে। কয়েকটি উর্বশী দাসী গানের সুর ধরল। তাদের সুরেলা কণ্ঠ বাতাসে মাতালতা ছড়িয়ে দিল। স্রোতাদের বিমোহিত করতে শুরু করল।

খাকান পলকহীন চোখে রাজকুমারীর প্রতি তাকিয়ে আছে। তার চোখ দুটো যেন আটকে গেছে রূপবতী যুবতীর চুম্বক চেহারায়। সহসা ঘটনাচক্রে অনিচ্ছাকৃতভাবে রাজকুমারীর দৃষ্টিও খাকানের দৃষ্টির সঙ্গে ধাক্কা খেল। তাতে খাকান মনে করলেন, হৃদয়ে-হৃদয়ে জোড়া লেগে গেছে; রাজকুমারীও তাকে ভালবেসে ফেলেছে। নেশার ঘোরে তার দেমাগ আকাশে উঠে গেল। তিনি মনে-মনে প্রেমিক থেকে প্রেমাষ্পদে পরিণত হয়ে গেলেন। তার মনে ধারণা জন্মাল, রাজকুমারী তার বিত্ত ও রাজত্বের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে পড়েছে। তিনি বললেন, আমার ভালবাসা নাও প্রিয়া।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ খাকানের প্রতি তাকালেন। কথাটা কাকে উদ্দেশ করে বললেন, বুঝতে চেষ্টা করলেন। দেখলেন, খাকান তারই কন্যা রাজকুমারীর প্রতি প্রেমকাতর চোখে তাকিয়ে আছেন। ইয়ায্‌দাজার্‌দ ইরানের এক উচ্চবংশের সন্তান। ইরানে তার বংশ অতিশয় সম্ভ্রান্ত ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন বলে পরিচিত। তার রাজ্য ও রাজত্ব যদিও পতনের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে, তবু আত্মমর্যাদা এখনও বিলুপ্ত হয়নি। তার চোখে খাকানের এই আচরণ আপত্তিকর ঠেকল। তিনি খাকানকে অপরাধটা ধরিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই কী যেন ভেবে বিরত থাকলেন।

সত্য হলো, যাযাবর জীবন, ক্ষমতাচ্যুতি ও যুদ্ধে একের-পর-এক পরাজয়বরণ তার বংশীয় কৌলিন্যে কিছুটা হলেও জং ধরিয়ে দিয়েছে।

প্রবাদ আছে, বিপদ মানুষের চরিত্র বদলে দেয়। বিপদে পতিত হলে একজন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষের মর্যাদাবোধে কিছুটা হলেও ঘাটতি তৈরি হয়। সেই ধারায় ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর আত্মমর্যাদায়ও কিছুটা ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

খাকান রাজকুমারীর দর্শনে এমন আত্মভোলা ছিলেন যে, ইয়ায্‌দাজার্‌দ যে তার প্রতি তাকিয়ে রয়েছেন, তা দেখলেনই না। না তিনি ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর মনোভাব আঁচ করতে সক্ষম হয়েছেন। মূলত সে-সময় তিনি রোমাঞ্চের জগতে অবস্থান করছিলেন। আপন পরিবেশের কোনো খবরই তার ছিল না।

রাজকুমারী তার প্রতি মনোনিবেশ করল না।

আসরে অনবরত গান চলছে। খাকানের স্ত্রীগণ ও অন্যান্য নারীরা তার প্রেমকাতর চাহনিতে সবকিছু বুঝে ফেলেছে। তার এই আচরণে তারা বুঝে ফেলেছে, রাজকুমারীর প্রতি তার ভালবাসা জন্মে গেছে। তবে এতে তাদের কোনো আপত্তি নেই। রাজকুমারী যদি তার হেরেমে প্রবেশও করে, তাতে তারা অসন্তুষ্ট হবে না। রাজার সন্তুষ্টিতেই তাদের সন্তুষ্টি। বরং এ-কাজে রাজাকে সাহায্য দিতেও তারা প্রস্তুত আছে।

খাকান যখন দেখলেন, রাজকুমারী তার প্রতি মনোনিবেশ করছে না, তখন তিনি বললেন, ওহে রূপের রানী, এদিকেও এক নজর!

রাজকুমারী চোখ তুলে তার প্রতি তাকলে তিনি বললেন, শুধু মায়াবী চোখ দুটো দ্বারা তাকালেই চলবে না– তোমার সুকোমল হাতে এক পেয়ালা মদও চাই।

রাজকুমারী কাউকে খুব কমই মদ পরিবেশন করে। সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে বসেই রইল। বিষয়টি খাকানের কাছে অপ্রীতিকর ঠেকল। তিনি পুনরায় বললেন, ওহে রূপের আধার, তোমার রূপ-সৌন্দর্যের সদকাস্বরূপ আমাকে এক পেয়ালা মদ পান করাও– শুধু এক পেয়ালা।

রাজকুমারী এবারও কোনো ভ্রূক্ষেপ করল না। মদের নেশা, সেইসঙ্গে প্রেমের নেশা ভালোমতো চেঁপে ধরেছে খাকানকে। বললেন, বুঝেছি, কুমারিত্বের লজ্জা তোমার মাঝে প্রবল হয়ে আছে। তাই আমার কাছে আসতে তুমি লজ্জাবোধ করছ। আচ্ছা, আমিই তোমার কাছে আসছি।

খাকান উঠে দাঁড়ালেন এবং রাজকুমারীর সম্মুখে গিয়ে বসলেন। তার এই আচরণ ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর কাছে খুবই আপত্তিকর ঠেকল। এতক্ষণ

পর্যন্ত তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। কিন্তু এবার আর পারলেন না। তিনি কঠিন গলায় বললেন, থামুন।

খাকান কোনো দিকে না তাকিয়েই বললেন, কার বুকে এমন পাটা আছে যে, তুর্কি রাজাকে শাসাচ্ছে!

কথাটা বলে তিনি নির্লিপ্তের মতো মোড় ঘুরিয়ে তাকালেন। ইয়ায্‌দাজার্‌দ বললেন, নিজের আসনে ফিরে যান।

খাকান হাসলেন। বললেন, ও আচ্ছা, মেজবান আদেশ করছে? খুব খু...উ...ব ভালো।

তিনি উঠে নিজের আসনে গিয়ে বসলেন। কথা আর বাড়েনি বটে; কিন্তু উভয় রাজারই মনে দাগ পড়ে গেছে। ইয়ায্‌দাজার্‌দ খাকানের আচরণে রুষ্ট হয়েছেন। আর খাকান ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর ধৃষ্টতায় অপমানিত বোধ করছেন। দুজনই মনের ব্যথা মনে শিকলে বেঁধে রেখেছেন।

বলখে উভয় সম্রাটের অবস্থান কয়েক সপ্তাহ হয়ে গেল। যুদ্ধের চে বিনোদনই তাদের বেশি ভালো লাগছে। সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার চিন্তা এখন পর্যন্ত একজনেরও মাথায় ঢোকেনি। কিন্তু যেদিন এই অপ্রীতিকর ঘটনাটি ঘটল, সেদিন থেকে ইয়ায্‌দাজার্‌দ ভাবতে শুরু করলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে ইরান থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু বিষয়টি খাকানের কাছে উপস্থাপন করতে তিনি ইতস্তত করছিলেন।

দু-তিন দিন পর একদিন অনুকূল পরিবেশ পেয়ে তিনি খাকানকে বললেন, মুসলমানদের উপর আপনার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। তারা মারাদরোদে বসেও ভয়ে থরথর করে কাঁপছে।

খাকান ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর মুখে নিজের প্রশংসা শুনে ফুলে ওঠলেন। বললেন, মুসলমানদের এমন সাহস নেই যে, আমার মোকাবেলায় মাঠে নামবে।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ বললেন, একথা সত্য। আমার আকাঙ্খা হলো, আক্রমণ চালিয়ে মুসলমানদের শেষ করে ফেলা হোক।

আলবৎ, এমনই তো হতে হবে। তা আপনি কী করতে চাচ্ছেন?

এ-সময় মুসলমানরা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে আছে। আমরা তাদেরকে শ্বাস নেওয়ার এবং আত্মসংবরণ করার সুযোগ দেব না। এর জন্য অনতিবিলম্বে তাদের উপর আক্রমণ করা আবশ্যক।

যুক্তিসঙ্গত কথা। আমাদেরকে আনন্দ ও বিনোদনের আসরগুলো মুসলমানদের পতন ঘটানোর পর অনুষ্ঠিত করা দরকার।

আমি এ-কথাটিই বলতে চাচ্ছিলাম।

ঠিক আছে, আমি আজই বাহিনীকে প্রস্তুতির আদেশ দিয়ে দিচ্ছি।

আমাদের সৈনিকরা যথেষ্ট বিশ্রাম নিয়েছে। এখন রওনা করাই যথোপযুক্ত হবে।

কালই রওনা করা হোক।

আমার আরও একটি আবেদন আছে।

বলুন।

আমরা যদি দুদিক থেকে আক্রমণ চালাই, তাহলে মুসলমানরা দিশা হারিয়ে ফেলবে এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে বাধ্য হবে। আপনি মারাদরোদের উপর আক্রমণ চালান আর আমি মারাদশাহজাহানে অভিযান পরিচালনা করি।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ খাকানের সঙ্গে থাকতে চাচ্ছেন না। তিনি ভয় করছেন, একসঙ্গে থাকলে পাছে সুযোগ পেয়ে নেশার ঘোরে খাকান তার কন্যার প্রতি আবারও হাত বাড়িয়ে ফেলেন কিনা। তাই তিনি আলাদা-আলাদা অভিযান পরিচালনার প্রস্তাব উপস্থাপন করলেন।

খাকান এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। উভয় সম্রাট আপন-আপন বাহিনীকে প্রস্তুতির আদেশ দিয়ে দিলেন। পরদিন খাকান মারাদরোদের দিকে আর ইয়ায্‌দাজার্‌দ মারাদশাহজাহানের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

ছাপ্পান্ন.

মারাদরোদে পৌঁছে খাকান ইসলামি বাহিনীর খানিক দূরে অবস্থান গ্রহণ করলেন। বিপুলসংখ্যক সৈন্য আছে তার সঙ্গে। নিজেদের বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য তুর্কিদের বেজায় দম্ভ ছিল। তারা ছিল মজুসিদের অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী। যেহেতু তাদের আগমনের সংবাদ শুনে মুসলমানরা বলখ থেকে সরে এসেছিল, তাই তাদের সাহস বেড়ে গিয়েছিল।

মুসলিম সেনাপতি আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) ভাবলেন, তুর্কিরা হঠাৎ আক্রমণ করে ফেলতে পারে কিংবা গেরিলা হামলা চালাতে পারে। তাই তিনি যে-মাঠে অবস্থান নিয়ে ছিলেন, সেখানে থাকা সঙ্গত মনে করলেন না। নদীর ওপারে যে-মাঠটি ছিল, তার একদিকে নদী এবং পিঠের দিকে একটি পাহাড়। জায়গাটা বেশ নিরাপদ। তিনি বাহিনীকে নদী পার হয়ে পাহাড়টির পাদদেশে গিয়ে ওখানে ছাউনি স্থাপনের আদেশ দিলেন।

সর্বপ্রথম পাহাড়ের একেবারে কোলঘেঁষে মহিলাদের তাঁবু স্থাপন করা হলো। তারপর তুর্কিদের প্রতিহত করতে অর্ধেক সৈন্য অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সারিবদ্ধ হয়ে গেল। বাকি অর্ধেক তাঁবু ও মালপত্র নিয়ে নদীর ওপারে চলে গেল এবং নিশ্চিন্তমনে তাঁবু স্থাপন করে সকল জিনিসপত্র ওখানে নিয়ে গেল।

তুর্কিরা মুসলমানদের এই স্থানান্তর ও গতিবিধি দেখতে থাকল। এ-সময় তারা মুসলমানদের ঘাটানো সঙ্গত মনে করল না। মালপত্র নদীর ওপারে নিয়ে যাওয়ার কাজ সম্পন্ন হলে যে-অর্ধেক সৈন্য তুর্কিদের প্রতিহত করতে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তারাও ওপারের ছাউনিতে চলে গেল।

ওপারের এই মাঠটিও এত বিশাল যে, কয়েকটি বাহিনী অনায়াসে তাতে সংকুলান হতে পারে। মুসলমানরা যেদিন উক্ত মাঠে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করল, তার পরদিন খাকানও তার বাহিনী নিয়ে নদী পার হয়ে সেই মাঠে গিয়ে অবস্থান নিল।

মুসলমানরা চাচ্ছিল, তুর্কিরা মাঠে নেমে আসুক। কিন্তু খাকান এ-কাজের জন্য কোনোই ফোরসত পাচ্ছেন না। আনন্দ-বিনোদন করেই সময় কাটাচ্ছেন তিনি। শত্রুর মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণের পরও তার এই ব্যস্ততায় কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। তাঁর কাছে সাজ-সরঞ্জাম আছে বিপুল-অগণিত। রসদও এত পরিমাণ আছে যে, তার রাক্ষুসে বাহিনী বসে-বসে ছয় মাস খেলেও ফুরোবে না। কিন্তু মুসলমানদের কাছে দু-মাসের রসদও নেই।

আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) দিনকতক তুর্কিদের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করলেন। কিন্তু তারা বের হলো না। তাই একদিন মাগরিবের নামাযের পর তিনি তার কমান্ডারদের বললেন, মনে হচ্ছে, তুর্কিরা যুদ্ধ এড়াতে চাচ্ছে। সম্ভবত তারা এই কৌশল অবলম্বন করেছে যে, যখন আমাদের রসদ শেষ হয়ে যাবে, তখন আক্রমণ চালাবে। এভাবে তারা আমাদেরকে অবরোধ করে আছে। কারণ, আমাদের একদিকে নদী, অপরদিকে পাহাড়। অবশিষ্ট দুই দিকে তারা। কিন্তু আমি যুদ্ধকে বেশি দীর্ঘতা দিতে রাজি নই। আমাদের বাহিনী আজ রাতেই প্রস্তুতি নিয়ে নিক। ইনশাআল্লাহ কাল ফজর নামায আদায় করেই আমরা মাঠে অবতরণ করব।

কমান্ডারগণ সৈনিকদের মাঝে ঘোষণা করে দিলেন। মুসলিম সৈনিকগণ প্রস্তুতি শুরু করে দিল। তারা আপন-আপন তরবারিতে ধার

দিতে শুরু করল। মুসলমানদের যুদ্ধপ্রস্তুতির প্রধান কাজই হলো তলোয়ারে শাণ দেওয়া।

পরদিন ফজর নামায আদায় করেই মুসলমানরা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ময়দানে বেরিয়ে এল। তারা মায়মানা, মায়সারা ও কাল্‌ব প্রতিষ্ঠা করে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

তুর্কিরা যখন মুসলমানদেরকে ময়দানে বেরিয়ে আসতে দেখল, তখন অফিসাররা সম্রাটকে বিষয়টি অবহিত করল। তিনিও বাহিনীকে সারিবদ্ধ হতে আদেশ দিলেন। প্রত্যেক তুর্কি অফিসার রণডংকা, পতাকা ও আপন-আপন সেনা-ইউনিট নিয়ে বেরিয়ে এল এবং সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে শুরু করল। তারাও মায়মানা, মায়সারা ও কাল্‌ব গঠন করে নিল। খাকান স্বয়ং কাল্‌বে যুক্ত হয়ে গেলেন।

সকল তুর্কি অফিসারের মাথার উপর তুর্কি পতাকা পত্‌পত্‌ করছে। প্রতিটি পতাকার কাছে রণডংকা বাজছে। অগণিত রণবাজনার ঝংকারে গোটা ময়দান গুঞ্জরিত হতে শুরু করল।

মুসলমানরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তারা তুর্কি বাহিনীকে দেখছে। যতদূর চোখ গেল, সৈন্যদের দ্বারা ময়দান ঠেসে আছে দেখা গেল। তুর্কি সৈন্যদের সংখ্যা বিপুল মনে হলো। সবদিকে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত অগণিত ছোট পতাকা উড়ছে। বড় পতাকার সংখ্যাও এত বেশি যে, গণনা করে শেষ করা যাবে না।

এতক্ষণে সূর্যটা বেশ উপরে উঠে গেছে। সমগ্র মাঠে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। সূর্যকিরণে সৈন্যদর সাজ-সরঞ্জামগুলো ঝিকমিক করছে। প্রতিজন তুর্কি অফিসার যার-যার মর্যাদা অনুপাতে রেশমি পোশাক ও সোনার অলংকার পরে আছে। উচ্চপদস্থ অফিসারদের মাথার উপর খাঁটি মুক্তার ঝালর লাগানো ও সর্বাঙ্গ সোনা-রুপার নকশাখচিত মুল্যবান কাপড়ের সামিয়ানা। খাকানের মাথার উপরও মহা মূল্যবান সামিয়ানা, যার ঝালরও মাণিক্যখচিত। পরিধানে অতিশয় দামি পোশাক। মাথার মুকুটটি অনেক বড় ও খাঁটি সোনার তৈরি, যাতে হিরা, মতি ও পান্নাখচিত। মুকুটটি এতই ঝলমল করছে যে, তাতে চোখ রাখা যাচ্ছে না।

খাকানের ইঙ্গিতে ঊর্ধ্বতন এক অফিসার তার বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলো। তার সম্মুখে রণডংকা বাজছে। অফিসার উঁচু-লম্বা শক্ত দেহের মানুষ। সে বাহিনী নিয়ে ছাউনির প্রান্তে এসে উপনীত হলো। সামিয়ানা ও ডংকা ওখানেই রয়ে গেল এবং সে ঘোড়া হাঁকিয়ে ময়দানে পৌঁছে গেল।

উভয় বাহিনীর মধ্যখানে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। তুর্কি অফিসার ময়দানে এসে পৌঁছুলে আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) মোকাবেলার জন্য এগোতে চাইলেন। দেখে আলকামা ও সাফওয়ান তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। আলকামা বললেন, মাননীয় সেনাপতি, আপনি ওই কাফেরের মোকাবেলায় যাবেন না। আপনি আমাকে অনুমতি দিন।

আহনাফ (রা.) বললেন, আমি তার মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়ার সংকল্প নিয়ে ফেলেছি। এই পতাকাটা নাও। আল্লাহ্ যদি আমাকে শাহাদাত দান করেন, তাহলে এই পতাকা তোমার। আর যদি ফিরে আসি, তাহলে তোমার থেকে নিয়ে নেব।

আহনাফ (রা.) পতাকাটি আলকামার হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজে রণাঙ্গনে নেমে পড়লেন। একহারা গড়নের মানুষ আহনাফ (রা.)। তুর্কি অফিসার তাঁকে অবজ্ঞার চোখে দেখল এবং তাঁর উপর তরবারির আঘাত হানল। আহনাফ (রা.) ঢালে নিয়ে আঘাতটা প্রতিহত করলেন এবং নিজেও আঘাত হানলেন। তুর্কি অফিসারও ঢাল দ্বারা আঘাত ঠেকিয়ে দিল। এভাবে আঘাত-পালটা আঘাত চলতে থাকল। আহনাফ (রা.)-এর যুদ্ধরীতি দেখে তুর্কি অফিসার বুঝে ফেলল, লোকটি যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ। তাই এবার সে উপর্যুপরি আঘাত হানতে শুরু করল। আহনাফ (রা.) অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকলেন। অবশেষে তিনি তেজোদীপ্ত হয়ে ওঠলেন। তিনি তুর্কি অফিসারের উপর জোরালো আক্রমণ চালালেন। তুর্কি অফিসার ঢাল এগিয়ে ধরল। আহনাফ (রা.) তার কাঁধের উপর আঘাত হানলেন। লোকটি রুপার বর্ম পরিহিত ছিল। তরবারি তার বাঁ-কাঁধটি কেটে ঘাড়টা উড়িয়ে দিল। তুর্কি অফিসার ধপাস্ করে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে তুর্কি বাহিনীতে চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যে অপর এক তুর্কি অফিসার বেরিয়ে এল। সে মুখে বিড়বিড় করতে-করতে ময়দানে অবতীর্ণ হলো। এসেই প্রবল উদ্দীপনার সঙ্গে আহনাফ (রা.)-এর উপর আক্রমণ চালাল। আহনাফ (রা.) দক্ষতার সঙ্গে তার আক্রমণ প্রতিহত করলেন এবং ঝট করে তরবারির আগাটা অফিসারের ঘোড়ার পাঁজরে ঢুকিয়ে দিলেন। ঘোড়া সন্ত্রস্ত হয়ে লাফিয়ে উঠল এবং সামনে পা দুটো উপরে তুলে আলিফ হয়ে গেল। অফিসার ঘোড়াটিকে সামলাতে এবং আত্মসংবরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আহনাফ

নিজের ঘোড়াটা এগিয়ে নিয়ে তার উপর তরবারির আঘাত হানলেন। তরবারি তার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। দেহ ও মাথা আলাদাভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ঘোড়া পালিয়ে গেল।

এই অফিসারের মৃত্যুতে তুর্কি বাহিনীতে পূর্বের চে বেশি শোর উঠল যে, তারা ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। কিছুক্ষণ পর তৃতীয় অফিসার ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে এল। এসেই সে জোরদার আক্রমণ চালাল। আহনাফ (রা.) তার আক্রমণের মশান দেখে বুঝে ফেললেন, লোকটি অভিজ্ঞ ও যুদ্ধবাজ। তিনি পূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে তার আক্রমণ প্রতিহত করলেন এবং নিজেও তার উপর আঘাত হানলেন। উভয়ের আক্রমণ-পালটা আক্রমণ চলতে লাগল। তুর্কি অফিসার দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আক্রমণ চালাতে থাকল আর আহনাফ (রা.) দক্ষতার সঙ্গে সেই আক্রমণ ঠেকাতে থাকলেন।

ঘটনাচক্রে আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) মওকা পেয়ে গেলেন। তিনি পূর্ণ শক্তিতে তুর্কি অফিসারের উপর আক্রমণ চালালেন। তরবারি অফিসারের শিরস্ত্রাণে আঘাত হানল এবং শিরস্ত্রাণের কিছু অংশ কেটে কপালটা চিরে খুলিতে গিয়ে ঢুকে পড়ল। লোকটি বিকট একটা চিৎকার দিয়ে পড়ে গেল। তুর্কি বাহিনীতে আবারও শোর ওঠল।

খাকান ঘোড়া তাঁকিয়ে ময়দানে নেমে এলেন। নিজ বাহিনীর তিনজন ঊর্ধ্বতন অফিসারের লাশ পড়ে আছে দেখলেন। তিনজনই বীর ও দুঃসাহসী যোদ্ধা ছিল। খাকান বুঝতে পারলেন যে, মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে আমি ভুল করেছি। তার অভিজ্ঞতা হলো, অনারব সৈন্যরা কাপুরুষ ও ভীরু। তাই আমার এদের সঙ্গে থাকা ঠিক হবে না। গায়ে পড়ে একটি শক্তিশালী জাতির শত্রুতা ক্রয় করার কোনো অর্থ হয় না। তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, তোমরা এক্ষুনি ফিরে আস; আমি যুদ্ধ করব না।

সঙ্গে-সঙ্গে তুর্কি বাহিনী পেছনে মোড় নিল। আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) রণাঙ্গন থেকে ফিরে এলেন। মুসলিম যোদ্ধারা তুর্কিদের উপর আক্রমণ করতে চাইল। কিন্তু আহনাফ (রা.) অনুমতি দিলেন না। বললেন, মহান আল্লাহ কাফেরদের মুখ ফিলিয়ে দিয়েছেন। তোমরা ওদেরকে ফিরে যেতে দাও। ইনশাআল্লাহ ওরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আর কোনো দিনও আসবে না।

হলোও তা-ই। খাকান দ্রুতগতিতে ফিরে গেলেন। তিনি মারাদরোদ ত্যাগ করে বলখ চলে গেলেন। সেখান থেকে জায়হুন নদী পার হয়ে সোজা

নিজ দেশে ফিরে গেলেন।

মুসলমানরা তার ক্যাম্পটি দখল করে নিল। বিপুলসংখ্যক মালে-গনীমত হাতে এল। আহনাফ (রা.) মারাদরোদ থেকে এসে পুনরায় বলখের দখল বুঝে নিলেন।

সাতান্ন.

ইয়াযদাজারদ মারাদশাহজাহান অবরোধ করে ফেলেছেন। দুর্গে মুসলমান ছিল মাত্র দুশো। যেহেতু ইয়াযদাজারদ-এর কাছে বিশ হাজারেরও বেশি সৈন্য ছিল। তাই তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, খুব তাড়াতাড়ি মারাদশাহজাহান জয় করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু মুসলমানদের সদাচারের ফলে দুর্গের অমুসলিম অধিবাসীরা তাদের এত অনুরক্ত হয়ে গিয়েছিল যে, তারা আপন সম্রাটের বিপক্ষে মুসলমানদের সঙ্গ দিল।

যেহেতু মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য ছিল, তাই দুর্গের মজুসিরা মুসলমানদের সঙ্গে পাঁচিলের উপর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ইয়াযদাজারদ যখন দুর্গে আক্রমণ চালালেন, তখন মুসলমান ও মজুসিরা একযোগে তির ও পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করল। তারা এত তীব্রতার সঙ্গে তির ছুঁড়ল এবং ছোট-ছোট পাথরখণ্ড নিক্ষেপ করল যে, রাজসেনারা পাঁচিলের কাছেই ঘেঁষতে সক্ষম হলো না।

মারাদশাহজাহানে যে-কজন মুসলমান ছিল, তারা জেনে ফেলেছে, তুর্কি রাজা খাকানও সেনা-অভিযান পরিচালনা করেছেন এবং মারাদরোদে আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.)-এর মোকাবেলায় পৌঁছে গেছেন। তাই তারা নিশ্চিত বুঝে নিল, তাদের কাছে সাহায্য পৌঁছুবার কোনোই সম্ভাবনা নেই। তবে তারা সিদ্ধান্ত নিল, জীবনের বাজি লাগিয়ে হলেও দুর্গকে রক্ষা করবে।

আমরা যে-যুগের ইতিহাস বলছি, সেই যুগের এক-একজন মুসলমান শত-শত শত্রুর বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত হতো এবং পরম বীরত্বের পরিচয় দিত। কোথায় দুশো মুসলমান, কোথায় বিশ হাজার অগ্নিপূজক। কিন্তু এমন বিশাল বাহিনীটিকেও তাদের একবিন্দু পরোয়া নেই। দুশো মুসলমান এই প্রত্যয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে যে, বিশ হাজার শত্রুসেনাকে পরাজিত করতে হবে।

অবরোধ দীর্ঘতা লাভ করল। ইয়াযদাজারদ বারকয়েক আক্রমণ চালিয়েছেন। কিন্তু মুসলমান ও দুর্গের মজুসিরা মিলে তার প্রতিটি আক্রমণকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

তবে ইয়ায্দাজার্দ এই নিশ্চয়তা নিয়ে বসে আছেন যে, হয়ত একদিন মুসলমানরা আপনা থেকেই দুর্গের দখল ছেড়ে দেবে কিংবা তিনি বলপ্রয়োগে দুর্গ জয় করে নিতে সক্ষম হবেন।

কিন্তু তার এই আশা একদিন নিরাশায় বদলে গেল, যখন শুনতে পেলেন, খাকান পরাজয় বরণ করে পালিয়ে গেছেন। এ-সংবাদটি ছিল তার প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই তার বিশ্বাস হলো না। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি বিষয়টি যাচাই করার জন্য একজন দূত প্রেরণ করলেন এবং অধীর ও অস্থিরচিত্তে তার ফিরে আসার অপেক্ষায় বসে রইলেন।

একদিন দূত ফিরে এল। এসে জানাল, খাকান সত্য-সত্যই পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেছেন এবং মুসলিম বাহিনী মারাদশাহজাহানের মুসলমানদের সাহায্যার্থে ধেয়ে আসছে। ইয়ায্দাজার্দ এই সংবাদ শুনে ঘাবড়ে গেলেন। তিনি তার উপদেষ্টামণ্ডলি ও মোসাহেবদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, এতক্ষণে জামাসপ তার উপদেষ্টাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

আলোচনা শুরু হলো। জামাসপ বলল, খাকানের কাছে প্রত্যাশা ছিল, তিনি মুসলমানদের পিষে ফেলবেন এবং পরাজিত করে তাদের তাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, উলটো তিনি নিজেই পরাজয়বরণ করে পালিয়ে গেছেন।

ইয়ায্দাজার্দ বললেন, আমি বিস্ময়ে হতবাক যে, তিনি অল্প কজন মুসলমানের মোকাবেলায় পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলেন!

এক অনুচর বলল, আমরা তুর্কিদের বীরত্বের বহু উপাখ্যান শুনেছি। কিন্তু সেগুলো উপাখ্যানই ছিল। বাস্তবতার সঙ্গে সেসবের কোনো সম্পর্ক ছিল না। অন্যথায় মুসলমানদের সম্মুখ থেকে পরাজয়বরণ করে তার পালাবার কথা ছিল না।

ইয়ায্দাজার্দ বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। তার পলায়নে আমার আশা-আকাঙ্খার প্রাসাদ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এখন ভাববার বিষয় হলো, আমাদের করণীয় কী?

জামাসপ বলল, এখন খোরাসানে আমরা কেউই আশ্রয় পাব না। আমাদেরকে দুটির যে-কোনো একটি পথ অবলম্বন করতে হবে। হয় আমরা মুসলমানদের গোলাম হয়ে যাব, নতুবা আমরা জীবন হারাব।

ইয়ায্দাজার্দ বললেন, আমি মুসলমানদের বশ্যতা মেনে নেব না।

আরেক অনুচর বলল, তুর্কিস্তানে আশ্রয়ের ব্যবস্থা হতে পারে।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ বললেন, এখান থেকে তুর্কিস্তান চলো। সেখান থেকে চীন চলে যাব।

এটিই সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। ইয়ায্‌দাজার্‌দ মারাদশাহজাহান থেকে রওনা দিলেন। একদিন জামাসপ ইয়াযদাজার্‌দ-এর কয়েকজন উপদেষ্টাকে বলল, তুর্কিস্তান কিংবা চীন গিয়ে আমাদের লাভ কী হবে? পরদেশে আমরা কী মর্যাদা পাব? নীচু থেকে উচ্চ, ছোট থেকে বড় সবাই আমাদেরকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখবে। আমরা উদ্বাস্তু বলে বিবেচিত হব। কেন আমরা ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর পেছনে-পেছনে মরতে যাব?

জামাসপ-এর এই যুক্তি ও অভিমত কয়েক ব্যক্তির মনঃপূত হলো। তারা বলল, তুমি ঠিকই বলেছ জামাসপ। জন্মভূমি ত্যাগ করতে আমাদেরও মন চাচ্ছে না। কিন্তু করব কী? আমরা তো অপারগ! অসহায়! এখানে থাকলে মুসলমানরাও তো আমাদের মেরে ফেলবে কিংবা গ্রেফতার করে দাস বানাবে!

জামাসপ বলল, ব্যবস্থা আছে। আমরা মুসলমানদের থেকে নিরাপত্তা নিয়ে নেব। সামান্য একটা ট্যাক্স দিয়ে আমরা তাদের প্রজা হয়ে যাব। তাতে আমরা ধর্মীয় স্বাধীনতাও লাভ করব এবং পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গেও জীবন যাপন করতে পারব।

এক উপদেষ্টা বলল, এমন সুযোগ থাকে যদি, তাহলে আমাদেরকে নিজ দেশেই থাকা উচিত। কেন আমরা ভবঘুরে জীবন অবলম্বন করব। কোন দুঃখে ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর সঙ্গে তুর্কিস্তান বা চীন যাব।

মোটকথা, বিষয়টি কয়েকজন উপদেষ্টার বুঝে এল। তারা অন্যদের বোঝাল। জন্মভূমি ত্যাগ করতে কেউই খুশীমনে প্রস্তুত ছিল না। সবাই জিযিয়া দিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে সমঝোতা করে নেওয়ার পক্ষে একমত হলো।

একদিন জামাসপ ইয়ায্‌দাজার্‌দকে বলল, আপনার উপদেষ্টামণ্ডলি ও অনুচরবৃন্দ চীন যেতে প্রস্তুত নয়। তারা মনে করছে, ও দেশে তারা কোনো মর্যাদা পাবে না।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ বিষয়টি নিয়ে সবার সঙ্গে কথা বললেন। সবাই বলল, আমরা জন্মভূমি ছাড়তে প্রস্তুত নই। ইয়ায্‌দাজার্‌দ জানিয়ে দিলেন, আমি মুসলমানদের প্রজা হয়ে এদেশে থাকতে চাই না। এই অপমান আমি মেনে নিতে পারি না। আমি তুর্কিস্তান কিংবা চীন গিয়েই জীবন অতিবাহিত করব। যারা আমার সঙ্গে যেতে চাও, চলো।

ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর সঙ্গে যেতে একজন লোকও প্রস্তুত ছিল না। না কোনো অনুচর, না একজন উপদেষ্টা, না সেনাবাহিনীর কোনো অফিসার। ফল এই হলো যে, কয়েকজন অফিসার আপন-আপন সেনাদলকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেল। তারা সৈনিকদের বিদায় করে দিয়ে বাহিনী ভেঙে দিল। ইয়াযদাজার্‌দ-এর সঙ্গে মাত্র দু-হাজার সৈনিক বহাল রইল। কয়েকজন অনুচর-উপদেষ্টাও তার সঙ্গ ত্যাগ করে চলে গেল। অল্প কজন অনুচর ও উপদেষ্টা তার সঙ্গে রয়ে গেল। জামাসপও তাদের একজন।

একদিন অনুচর ও উপদেষ্টাবৃন্দ বসে বলাবলি করছিল যে, ইয়ায্‌দাজার্‌দ একজন অপয়া মানুষ। তার অকল্যাণের ক্রিয়া আমাদের উপরও পতিত হয়েছে। যদি তিনি মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করে নিতেন, তা হলে এভাবে যাযাবরের মতো জীবন কাটাতে হতো না।

জামাসপ বলল, আপনারা তো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর সঙ্গ ত্যাগ করে আপন জন্মভূমিতেই থাকবেন। এখন পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে মরছেন কেন? আপনারা ফিরে যান।

সবাই বলল, ইয়াযদাজার্‌দ-এর ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার আর কোনো আশা-ভরসা অবশিষ্ট নেই। আমাদেরকে তার সঙ্গ পরিত্যাগই করা উচিত।

জামাসপ বলল, ইয়ায্‌দাজার্‌দ আমাদের দেশের বিপুল পরিমাণ সম্পদ সঙ্গে করে বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা তাকে এসব সম্পদ নিতে দেব কেন?

কয়েকজন দরবারি সমস্বরে বলে উঠল, আপনি ঠিকই ধরেছেন। তাকে কিছুই নিতে দেওয়া যাবে না। এই সম্পদ আমাদের।

এক মোসাহেব– যে কিনা ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর কাছে সুপারিশ করে জামাসপকে উপদেষ্টার পদে অধিষ্ঠিত করেছিল– বলল, সম্রাটের এত বিরোধিতা করা তোমার ঠিক হচ্ছে না। তুমি নিমকহারামি করছ।

জামাসপ বলল, লোকটি আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এখন তার অধঃপতনে আমি কোনো প্রচেষ্টাই অবশিষ্ট রাখব না।

সকল দরবারি একমত হয়ে গেল, ইয়ায্‌দাজার্‌দ থেকে সমুদয় সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হবে। সেমতে একদিন তারা সকল সম্পদ কব্জা করে নিল। ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর এ-ই ছিল সাকুল্য সম্বল। তিনি কিছুই করতে পারলেন না এবং সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব ও অসহায় হয়ে পড়লেন। যে দু-হাজার সৈনিক সম্পদের লোভে তার সঙ্গ ধরে রেখেছিল, তারাও তাকে ছেড়ে চলে গেল। দরবারিরাও তাকে ত্যাগ করে ফিরে গেল।

অসময়ে কোনো সঙ্গী থাকে না এটাই অমোঘ সত্য। এককালের প্রতাপশালী ইরান শাহেনশাহ ইয়ায্দাজার্দ-এর বেলায়ও এ-নীতিরই প্রতিফল ঘটল। একসময় হাতজোড় করে চারপার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকত যেসব উপদেষ্টা, মোসাহেব ও দরবারি; তারা তার সমুদয় সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে তাকে নিঃস্ব বানিয়ে কেটে পড়ল। এমনকি পরিবারের সদস্যরাও এক-এক করে বিদায় নিয়ে গেল।

একদিন তার কয়েকজন স্ত্রী ও আদরের দুলালী চাঁদবদন রাজকুমারীও উধাও হয়ে গেল।

ইয়াযদাজার্দ সম্পূর্ণ অসহায় ও নিঃস্ব অবস্থায় তুর্কিস্তানের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চললেন। জামাসপ তার সঙ্গে আছে। একদিন জামাসপ খঞ্জর বের করে ইয়ায্দাজার্দ-এর উপর আক্রমণ চালাল। ইয়ায্দাজার্দ জামাসপকে বড় বিশ্বস্ত আপনজন মনে করেছিলেন। ভেবেছিলেন, সবাই তো কেটে পড়ল, লোকটি এখনও আমার সঙ্গে আছে। এর চেয়ে আপন আর আমার কে হতে পারে! আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ইয়ায্দাজার্দ কুঁকিয়ে উঠে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আহ, শেষ পর্যন্ত তুমিও আমার শত্রু প্রমাণিত হলে!

জামাসপ বলল, অত্যাচারী পাষাণ রাজা! আজ আমি আমার প্রতিশোধ নিলাম।

জামাসপ খঞ্জরটা পুনরায় ইয়ায্দাজার্দ-এর বুকে সেঁধিয়ে দিল। ইয়ায্দাজার্দ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। স্বজাতির এক সদস্য তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাল।

দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ঘোর ইসলামবিরোধী অগ্নিপূজারি অনারব সম্রাট তার পরিণতি পেয়ে গেল।

আটান্ন.

খাকান ফারগানা পালিয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের মোকাবেলা করার সাহস তার হয়নি। তুর্কিরা যে-কোনো বিষয় থেকে শুভাশুভের লক্ষণ গ্রহণ করত। তাদের সাধারণ নিয়ম ছিল, তারা যুদ্ধ এভাবে শুরু করত যে, এক-এক করে তিনজন নেতা রণাঙ্গনে অবতরণ করত। যদি এই তিনজনের একজনও প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে সক্ষম হতো, তাহলে তারা ধরে নিত, যুদ্ধে তারা জয়ী হবে। আর যদি তিনজনই প্রাণ হারাত, তাহলে মনে করত তারা পরাজিত হবে।

খাকানের তিন নেতা ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তিনজনই নিহত

হয়েছে। তা থেকেই খাকান বুঝে নিয়েছেন, তিনি পরাজিত হবেন। তাই তিনি রণাঙ্গান ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন এবং এমন পলায়ন পলালেন যে, মারাদরোদ থেকে সোজা বলখ গিয়ে পৌঁছুলেন। তারপর বলখ থেকে অগ্রসর হয়ে জায়হুন নদী পার হয়ে অতিক্রম করে ফারগানা চলে গেলেন। তিনি ফারগানা পৌঁছেই তবে স্বস্তির শ্বাস গ্রহণ করলেন।

আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) বাহিনীসহ মারাদরোদ থেকে রওনা হয়ে বলখ ফিরে এলেন। বলখের মজুসি নাগরিকরা তাঁকে জমকালো স্বাগত জানাল। এমন আনন্দ প্রকাশ করল, যেন তাদের বড় একজন সুহৃদ ও সহমর্মী এসেছেন।

বাস্তবতা হলো, প্রথম যুগের মুসলমানরা এত সচ্চরিত্রবান ছিল যে, তাঁদের আচরণে অমুসলিমরা তাদের ভক্ত হয়ে যেত। তারা সদা সত্য বলত। যখন যে-ওয়াদা করত, তা পূরণ করত। তাদের লেনদেন ছিল আয়নার মতো পরিষ্কার। তারা হৃদয়বান ও ন্যায়পরায়ণ ছিল। তাদের এসব গুণ অমুসলিমদের অন্তরে বাসা বেঁধে নিত এবং অমুসলিমরা আন্তরিকভাবেই তাদের হিতকামী ও অনুরক্ত হয়ে যেত।

যাহোক, বলখের মজুসিরা মুসলমানদের আগমনে উল্লাস প্রকাশ করল। জিযিয়ার যে-অর্থ চলে যাওয়ার সময় মুসলমানরা তাদেরকে ফেরত দিয়েছিল, তারা সেগুলো বণ্টন না করে এক বিত্তশালী ব্যক্তির কাছে গচ্ছিত রেখে দিয়েছিল। মজুসিদের বিশ্বাস ছিল, মুসলমানরা আবার ফিরে আসবে। এখন হুবহু সেই অর্থগুলোই মুসলমানদের দিয়ে দিল।

মুসলমানরা বলখ এসে পৌঁছুলে জামাসপ হাস্যোজ্জ্বল মুখে এসে হাজির হলো। সাফওয়ান জানে জামাসপ প্রতিশোধ নিতে গিয়েছিল। এখন দেখামাত্র জিজ্ঞেস করল, তোমার প্রতিশোধের খবর কী?

জামাসপ বলল, কাজ সেরে এসেছি। ইয়ায্‌দাজার্‌দকে হত্যা করেছি। আমার মনের ঝাল মিটিয় এসেছি।

সাফওয়ানের মনে কৌতূহল জাগল। জামাসপ তার ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিল শাহেনশাহ ইয়ায্‌দাজার্‌দকে হত্যা করে! ব্যাপারটা কী? জামাসপের ব্যক্তিগত বিষয়-আশয় তো তার জানা ছিল না। জিজ্ঞেস করল, ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর সঙ্গে তোমার কীসের শত্রুতা ছিল?

জামাসপ বলল, আমার আসল নাম মেহেরজান। জামাসপ আমার ছদ্মনাম। আমি সায়েরজানের অধিপতি ছিলাম। শারাফের অধিপতি

জাওয়াশেরের সুন্দরী কন্যা গুলনারের সঙ্গে আমার প্রেম হয়ে গিয়েছিল। জাওয়াশের গুলনারকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু ইয়ায্‌দাজার্‌দ-এর এক মোসাহেব গুলনারের জন্য আসক্ত ছিল। সে ষড়যন্ত্র করে জাওয়াশেরকে গ্রেফতার করাল আর আমার অনুপস্থিতিতে গুলনারকে তুলে নিয়ে গেল।

মেহেরজান তার পুরো কাহিনী বিস্তারিত সাফওয়ানকে শোনাল, যা সে ফায়রোজানকে পাহাড়ের উপর সে-সময় শুনিয়েছিল, যখন সে বনমানুষের রূপ ধারণ করেছিল। দৈবক্রমে আফীরার প্রতি তার হৃদ্যতা ও ফায়রোজানের প্রতি বিরাগ তৈরি হয়ে গেল। আফীরাকে রক্ষা করার জন্য সে মুসলমানদের মাঝে এসে পড়ল এবং ফায়রোজান যখন আফীরাকে তুলে নিয়ে গেল, তখন তার উদ্ধার-অভিযানে সাফওয়ানের পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করল।

মেহেরজান বলল, আমি আমার প্রতিশোধ নিয়ে ফেলেছি। এখন ইনশাআল্লাহ অবশিষ্ট জীবন আপনাদের সঙ্গে কাটাব।

সাফওয়ান মেহেরজানকে আগে থেকেই ভালবাসত। এখন ভালবাসা আরও বেড়ে গেল। আফীরাও তাকে আপন করে নিল এবং বড় ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করতে লাগল।

সাফওয়ান সেনাপতি আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.)-এর নিকট মেহেরজানের কাহিনী বর্ণনা করল এবং তাঁকে অবহিত করল যে, মেহেরজান ইয়ায্‌দাজার্‌দকে হত্যা করে ফেলেছে।

আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) পত্রমারফত আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.)-কে বিজয়ের বৃত্তান্ত অবহিত করলেন এবং গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ দরবারে-খেলাফতে পাঠিয়ে দিলেন।

হযরত উমর (রা.) পত্রখানা পাঠ করে উপস্থিত মুসলমানদের উদ্দেশ করে বললেন

'আজ আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর ভবিষদ্বাণী পূর্ণ হলো। মজুসি সাম্রাজ্যের পতন ঘটল। এখন ইনশাআল্লাহ ইরানিরা ইসলাম ও মুসলমানদের আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু ওহে মুসলমান, তোমরাও যদি ন্যায়পরায়ণতা, সততা ও সত্যতার উপর স্থির থাকতে ব্যর্থ হও, তাহলে আল্লাহ তোমাদের থেকেও ক্ষমতা ছিনিয়ে অন্যদের হাতে তুলে দেবেন।'

যখন খোরাসানের উপর পরিপূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, তখন আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.) সাফওয়ানকে হেরাত ফিরে যেতে আদেশ করলেন। সাফওয়ান প্রস্তুতি শুরু করে দিল। জাপান ও পারভিন দুজন বলখেই রয়ে গেল। মেহেরজান, জরিনা ও আফীরা সাফওয়ানের সঙ্গে হেরাত চলে গেল। আহনাফ (রা.) পঞ্চাশজন সৈন্যের একটি ইউনিটও সাফওয়ানের সঙ্গে দিলেন। এরা আফীরার সন্ধানে যে-পথে এসেছিল, সে-পথেই রওনা হলো। কাফেলা যখন জরিনার পল্লীতে এল, তখন সাফওয়ান জরিনাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি পরিবারে ফিরে যাবে, নাকি আমাদের সঙ্গে যাবে?

জরিনা পিতা-মাতার কাছে ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানাল। শুধু এক দৌড়ে গিয়ে পিতা-মাতা ও ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে এল। এরা সবাই নিরাপদে হেরাত পৌঁছে গেল।

আমের আফীরাকে দেখে আনন্দে বাগবাগ হয়ে গেলেন। তিনি মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অপত্যস্নেহে তাঁর চোখে অশ্রু টলমল করে ওঠল। আফীরার নার্গিসাক্ষিও সিক্ত হয়ে গেল। ফ্রেগাসও এল। তাকে খুব অনুতপ্ত দেখাল।

আফীরা ও সাফওয়ান আমেরের কাছে আপন-আপন কাহিনী বর্ণনা করল। সাফওয়ানের প্রতি তাঁর যে-হৃদ্যতা ও ভালবাসা ছিল, তা আরও বেড়ে গেল। তিনি জামাসপকে ভাইয়ের মর্যাদায় স্থান দিলেন। জরিনাকেও কন্যার আসনে বসালেন।

একদিন সাফওয়ান, জরিনা ও আফীরা বাগিচায় বসে কথা বলছিল। সাফওয়ান হাসিমুখে আফীরার প্রতি তাকিয়ে জরিনাকে বলল, জরিনা, আমি আফীরাকে দাসী বানাতে চাই। তোমার মতামত কী?

আফীরা মুখে হাসির ফুল ছড়িয়ে সাফওয়ানের প্রতি তাকাল এবং বলল, এই মুখে মসুর ভাল!

জরিনা বলল, হায়-হায় ভাইজান, এ তুমি কী বলছ? আফীরা কী দাসী হওয়ার যোগ্য?

সাফওয়ান বলল, তাহলে কী হওয়ার যোগ্য?

জরিনা বলল, ওকে তুমি জীবনসঙ্গিনী বানিয়ে নাও।

আফীরা লজ্জায় অধোবদন হয়ে গেল। সাফওয়ান বলল, তোমার যদি এই অভিমত হয়, তাহলে আমি রাজি আছি।

আফীরার চোখ দুটো লজ্জার ভারে নুয়ে পড়ল।

রূপের বাহার ছড়িয়ে চোখ তুলে বলল, তুমি রাজি হলেই হয়ে যাবে নাকি! তোমাকে জিজ্ঞেস করে কে?

সাফওয়ান বলল, হেরাতের গভর্নরকে জিজ্ঞেস করে না কে?

নিজেই নিজেকে আকাশে তুলছ!

জরিনা ও সাফওয়ান হেসে ফেলল। সেদিনই জামাসপ আমেরের কাছে আফীরার জন্য সাফওয়ানের প্রস্তাব পেশ করল আমের প্রস্তাব কবুল করে নিলেন। বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক হয়ে গেল। একদিন আফীরাকে দুলহান সাজিয়ে দেওয়া হলো। তাকে যখন বধূসাজে সাজিয়ে তোলা হলো, তখন তার রূপের আলোতে গোটা কক্ষ আলোকিত হয়ে গেল। জরিনা আত্মসংবরণ করতে পারল না। সে আফীরাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল। সাফওয়ান আরব দুহিতার রূপময় অবয়ব দেখে হতভম্ব হয়ে গেল।

জরিনা নিজধর্মের উপর বহাল থাকল।

সাফওয়ান সম্ভ্রান্ত এক মজুসির সঙ্গে তাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দিল। সবাই হেরাতে সুখে-সাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করতে লাগল।

[সমাপ্ত]

design : najmul haider shai creation

ISBN. 984-70063-0013-7